পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থার উপর একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক অধ্যয়ন

তত্বাবধানেঃ

ড. জাহিদুল ইসলাম

অধ্যাপক

নৃবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সম্পাদনায়ঃ

শামীমা আক্তার জাহান

পিএইচ.ডি গবেষক

রেজি. নং.: ০২/২০১৫-১৬

নৃবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রী সম্পাদনের জন্য অভিসন্দর্ভটি পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

একটা গবেষণা করার জন্য কঠিন অধ্যাবসায়, নিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞা দরকার। প্রতিশ্রুতিশীল গবেষণা সমাজ উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ। আমি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে এই গবেষণা নিষ্ঠা ও ধর্য্যের সাথে করার সামর্থ দিয়েছেন। আমার সম্মানীত তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম এ গবেষণার আদ্যপ্রান্তে জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। তাঁর স্বদিচ্ছা ও অনুপ্রেরণা না থাকলে এ গবেষণা করা সম্ভব হতো না। আমি তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণার সাথে নৃবিজ্ঞান বিভাগের সম্মানীত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে নৃবিজ্ঞান বিভাগের এ্যালামনাই ও এম.ফিল গবেষক জনাব মু. বোরহান উদ্দিন এ গবেষণায় সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেছেন। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সম্মানিত মহাপরিচালকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ গবেষণা কাজে অনেক সহায়তা করেছেন। আমি সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অনেক লেখক, সম্পাদক, গবেষক ও প্রাবন্ধিকের বই, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় থেকে এ গবেষণায় নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। আমি তাদের কষ্টনির্ভর কর্মকে অগ্রাধিকারদান পূর্বক তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মাঠকর্মে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী সার্বিক সহযোগিতা করেছে। এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার জনাব কৌশিক বড়ুয়া, বান্দরবান জেলার জনাব অঅংগি মারমা, রাঙ্গামাটি জেলার জনাব অন্তর দেওয়ান বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের খ্যাতিমান সদস্য জনাব প্রভাংশু ত্রিপুরা গভীর তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার পরিবারের সদস্যরা সফলভাবে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে মানসিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা প্রকাশ করছি।

শামীমা আক্তার জাহান
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি. নং.: ০২/২০১৫-১৬
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি শামীমা আক্তার জাহান, পিএইচ.ডি গবেষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে **''পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থার উপর একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক অধ্যয়ন''** শীর্ষক শিরোনামের মৌলিক পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মটি আমার নিজের এবং হুবহু এই শিরোনামে ইতিপূর্বে কোন গবেষণা পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়নি। এ গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধিনে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য পরিচালনা করেছি। এ গবেষণার প্রাথমিক তথ্যসমূহ রাঙ্গামাটি জেলার চাকমা, বান্দরবান জেলার মারমা ও খাগড়াছড়ি জেলার ত্রিপুরাদের মধ্যে পরিচালিত আমার মাঠকর্মের মাধ্যমে পেয়েছি। এবং এই গবেষণা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছি তাঁদের প্রাপ্তি স্বীকার করেছি। এ গবেষণার সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন ডিগ্রি বা প্রকল্প আকারে জমা বা প্রকাশ করা হয়নি।

শামীমা আক্তার জাহান
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি. নং.: ০২/২০১৫-১৬
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে **''পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থার উপর একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক অধ্যয়ন''** শীর্ষক শিরোনামের মৌলিক পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মটি আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে শামীমা আক্তার জাহান, পিএইচ.ডি গবেষক, রেজি. নং.: ০২/২০১৫-১৬, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তৃক পরিচালিত ও সম্পাদিত। আমি এই অভিসন্দর্ভটি তত্ত্বাবধায়ন ও ভালভাবে পড়েছি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি খুবই তথ্যবহুল গবেষণা বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম
পিএইচ.ডি তত্ত্বাবধায়ক
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সারাংশ

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীসমূহ নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচার-প্রথা ও রীতিনীতি যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছে। মূলধারার বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর সাথে এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দিয়ে বাংলাদেশকে বহু সংস্কৃতির দেশে পরিণত করেছে। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজের পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে আন্তঃসাংস্কৃতিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠী থেকে আলাদা তথ্য সংগ্রহ করে 'নিঘুঢ় বর্ণনার' সাহায্যে প্রত্যেক প্রভাবকের মাধ্যমে আলাদা আলাদা তথ্য উপস্থাপন করে তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক অন্তঃসারপূর্ণ তুলনামূলক উপস্থাপনের ফলে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি, জ্ঞাতিত্ব অধ্যায়নে নৃবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রস এর পার্বত্য চট্রগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে ১৯৫২ সালে পরিচালিত গবেষণার সাথে তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার চাকমা, বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার মারমা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ত্রিপুরাদের মাঝে পরিচালিত হয়। এই নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিবিড় সাক্ষাৎকার ও প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, দলীয় আলোচনা, কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার, কেইস স্টাডি, মৌখিক ইতিহাস ইত্যাদি মাঠ গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট, ডিজিটাল ভয়েজ রেকর্ডার, ক্যামেরা, ডায়েরি ও নোটবুক ব্যবহার করা হয়। লেভি-স্ট্রস এর Alliance Theory (মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব) ব্যবহার করে সমাজসমূহের আত্মীয়তার বন্ধন দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে Descent Theory (বংশ তত্ত্ব) এর মাধ্যমে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরণ দেখা হয়েছে। এছাড়া স্নাইডারের Mutuality of Being ধারণা, ফার্বারের ৪ টি ঐতিহাসিক জ্ঞাতিত্ব মডেল ইত্যাদি ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিবেশী বৃহত্তর সমাজ, ধর্মান্তর, আধুনিক শিক্ষা, ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধকরণ, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়ন, ভূমি মালিকানা ও ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর এর প্রভাব এবং পেশার ধরনে পরিবর্তন ইত্যাদি উপাদানের প্রভাবে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জীবন প্রণালীতে নানাভাবে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক, পরিবার, জ্ঞাতিসম্পর্ক, ধর্ম, রাজনীতি, উৎপাদন প্রণালী ও বাজার ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন হয়ে একটি জটিল সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটছে। এই পরিবর্তনের গতি

Dhaka University Institutional Repository

বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং বিশ্বায়ন। বৃহৎ সমাজের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে বৃহৎ উপাদান দ্বারা নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছে। জীবনমান উন্নয়নের জন্য চাকুরি, অভিগমন ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। ফলে অনেকে নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজিকে অধিক সহায়ক ভাবছে। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের মাঝে চাকমাদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা তুলনামূলক বেশি থাকার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হার বেশি। মারমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যেও দিন দিন শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ নৃবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সারের পরীক্ষিত মতবাদের পরিপূর্ণ বা আংশিক মিল পাওয়া যায় এ সমাজসমূহে। তিনি বলেছিলেন মানব সমাজ সহজ সরল অবস্থা থেকে জটিল রূপ ধারণ করে। এ সমাজসমূহও ক্রমাগতভাবে সরলতর অবস্থা থেকে জটিল রূপ ধারণ করছে। এরফলে কিছু সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

ঐতিহ্যগতভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ জুমের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহসহ দৈনন্দিন বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করে আসছে। বর্তমান গবেষণা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মনে করে ভূমি কেন্দ্রিক জীবন যাত্রা এই নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে নতুন ধরণের ধর্ম বিশ্বাস তৈরি করছে যেন ধর্ম এখানে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলেমিশে একাকার। উন্নয়নের জন্য সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ খাগড়াছড়ি জেলার ত্রিপুরাদের জমি অধিগ্রহণ করেছে ফলে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া সরকারীভাবে জুম চাষ নিষিদ্ধ করার কারণে জুম চাষের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান গবেষণা জুম চাষের পরিবেশগত প্রভাব বা বাস্তুসংস্থান পুনঃমুল্যায়নের দাবী উপস্থাপন করে, পাশাপাশি জুমের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব টেকসই বিকল্প উৎপাদন পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যারা অভিগমন ও চাকুরিসহ অন্য উপায়ে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হচ্ছে তারা ঐতিহ্যগত গৃহ নির্মাণ কৌশল থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক উপকরণ যেমন সিমেন্ট, ইট ইতাদি সম্বলিত ঘর তৈরি করছে। তাই নৃবৈজ্ঞানিক নিঘুঢ় মাঠ গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রতি হুমকি হিসাবে দেখা দিচ্ছে। ফলে বতমান গবেষণা এই দাবী উথাপন করে যে উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে যেন সহায়ক হয়।

তিন সমাজেই এক বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। একের অধিক বিবাহ করলে সমাজ তাকে তিরস্কার করে। তবে কিছু অবস্থা বিবেচনায় একজন পুরুষ এক স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও আবার বিবাহ করতে পারেন। এগুলো হল- স্ত্রী শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ হলে, ব্যবিচারিণী হলে, সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে। আবার একই কারণসমূহের কারণে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। কিছু অন্ত ও বহি চলক যেমন শিক্ষা, আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, স্বনির্ভরতা, বিকল্প উৎপাদন কৌশল, অভিগমন ইত্যাদির কারণে পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

সাধিত হচ্ছে। নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহে জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন অতীতের মতই আবদ্ধ আছে বলে অধিকাংশ অধিবাসী মনে করে। তবে কিছু অধিবাসী মনে করে ক্রমাগতভাবে জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে।

কার্যত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, প্রথাগত উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন, যোগাযোগ ও সামাজিক আদান-প্রদান হ্রাসের কারণে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে। বাজার নির্ভর উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থার কারণে অধিবাসীদের ব্যস্ততা অনেকাংশে বৃদ্ধি হওয়ায় জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ ও পরিভ্রমণে নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। অধিকন্তু আধুনিক জৌলুশ ভোগ-দখলের কামনা ব্যক্তিকে করে তুলছে আত্ম কেন্দ্রিক যা চুড়ান্ত পরিণামে জ্ঞাতির সাথে দূরত্ব তৈরি করছে। চাকমা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাজন প্রাধান্য পায়। মারমা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে বার্মিজ ভাব বেশ লক্ষণীয়। ত্রিপুরা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পিতামাতার দিকের জ্ঞাতির বিভাজনের চেয়েও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যয়নকৃত তিন নৃগোষ্ঠীই পিতৃতান্ত্রিক প্রথা অনুসরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ ভূমিকা ও সমস্যা ২

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য...৪

১.৩ গবেষণা জিজ্ঞাসা ৪

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা...৪

১.৫ গবেষনার নৈতিকতা...৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি

২.১ গবেষণা এলাকা...৭

২.১.১ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ১২

২.১.২ লামা উপজেলা ১৬

২.১.৩ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ২০

২.২ গবেষণা পদ্ধতি ২৩

২.২.১ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ২৪

২.২.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার ও প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার...২৫

২.২.৩ কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার/ খানা শুমারী ২৫

২.২.৪ দলীয় আলোচনা ২৬

২.২.৫ কেইস স্টাডি ২৬

২.২.৬ মৌখিক ইতিহাস...২৭

২.৩ এলাকা নির্বাচন ও নমুনায়ন ২৮

২.৪ তথ্যের উৎস্য ২৯

২.৪.১ প্রাথমিক তথ্য ২৯

২.৪.২ মাধ্যমিক তথ্য ২৯
২.৫ তথ্য সংগ্রহের কৌশল..২৯
২.৫.১ প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট..২৯
২.৫.২ ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার, ক্যামেরা, ডায়েরী ও নোটবুকের ব্যবহার.................................. ৩০
২.৬ মাঠকর্মের অভিজ্ঞতা..৩০
২.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৩১

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সাহিত্য পর্যালোচনা, তাত্ত্বিক ও প্রত্যায়গত কাঠামো

৩.১ সাহিত্য পর্যালোচনা ৩৩
৩.২ প্রত্যয়গত ও তাত্ত্বিক ধারণা ৫৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৪.১ ভূমিকা..৬৩
৪.২ চাকমা ৬৩
৪.২.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৬৩
৪.২.২ জীবন-জীবিকা ৬৬
৪.২.৩ সংস্কৃতি..৬৮
৪.২.৪ ভাষা ৬৯
৪.২.৫ ধর্ম.. ৭০
৪.২.৬ ঘরবাড়ির ধরণ ও মালিকানা.. ৭০
৪.২.৭ শিক্ষা.. ৭৩
৪.২.৮ সামাজিক সহাবস্থান, সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা ৭৪
৪.৩ মারমা ৭৬

৪.৩.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৭৬
৪.৩.২ জীবন ও জীবিকা ৭৮
৪.৩.৩ সংস্কৃতি ৮১
৪.৩.৪ ভাষা ৮৫
৪.৩.৫ ধর্ম ৮৫
৪.৩.৬ ঘরবাড়ির ধরণ ও মালিকানা ৮৫
৪.৩.৭ শিক্ষা ৮৮
৪.৩.৮ সামাজিক সহাবস্থান, সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা ৮৯
৪.৪ ত্রিপুরা ৯১
৪.৪.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৯১
৪.৪.২ জীবন-জীবিকা ৯৩
৪.৪.৩ সংস্কৃতি ৯৭
৪.৪.৪ ভাষা ৯৯
৪.৪.৫ ধর্ম ১০০
৪.৪.৬ ঘরবাড়ির ধরণ ও মালিকানা ১০১
৪.৪.৭ সামাজিক সহাবস্থান, সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা ১০৩
৪.৫ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১০৪
৪.৫.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ১০৪
৪.৫.২ জীবন-জীবিকা ১০৫
৪.৫.৩ সংস্কৃতি ১০৭
৪.৫.৪ ভাষা ১০৮
৪.৫.৫ ধর্ম ১০৯
৪.৫.৬ ঘরবাড়ি ধরণ ও মালিকানা..১০৯
৪.৫.৭ শিক্ষা ১১২
৪.৫.৮ সামাজিক সহাবস্থান, সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা ১১৩

পঞ্চম অধ্যায়: নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও বিবাহ

৫.১ ভূমিকা ১১৯
৫.২ চাকমা ১২১
৫.২.১ পরিবার ব্যবস্থা ১২১
৫.২.২ পরিবারের আকার ১২২
৫.২.৩ পরিবার প্রধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১২৩
৫.২.৪ পরিবার প্রথা ১২৪
৫.২.৫ পরিবারের ধরণ ১২৫
৫.২.৬ বাসস্থান প্রথা ১২৬
৫.২.৭ বিবাহের রীতিনীতি ১২৬
৫.৩ মারমা ১৩০
৫.৩.১ পরিবার ব্যবস্থা ১৩০
৫.৩.২ পরিবারের আকার ১৩০
৫.৩.৩ পরিবার প্রধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১৩১
৫.৩.৪ পরিবার প্রথা ১৩৩
৫.৩.৫ পরিবারের ধরণ ১৩৩
৫.৩.৬ বাসস্থান প্রথা ১৩৪
৫.৩.৭ বিবাহের রীতিনীতি ১৩৫
৫.৪ ত্রিপুরা ১৩৭
৫.৪.১ পরিবার ব্যবস্থা ১৩৭
৫.৪.২ পরিবারের আকার ১৩৭
৫.৪.৩ পরিবার প্রধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১৩৯
৫.৪.৪ পরিবার প্রথা ১৪১
৫.৪.৫ পরিবারের ধরণ ১৪১
৫.৪.৬ বাসস্থান প্রথা ১৪২
৫.৪.৭ বিবাহের রীতিনীতি ১৪২

৫.৫ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১৪৬
৫.৫.১ পরিবারের বর্তমান অবস্থা ও পরিবর্তনের কারণসমূহ...১৪৬
৫.৫.১.১ উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন..১৪৬
৫.৫.১.২ ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তন ১৪৭
৫.৫.১.৩ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের উদ্ভব ১৪৭
৫.৫.১.৪ যৌথ পরিবারের অসুবিধা...১৪৮
৫.৫.১.৫ স্বনির্ভরতা ১৪৯
৫.৫.১.৬ প্রজন্মগত দূরত্ব ১৫০
৫.৫.২ বিবাহ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও পরিবর্তনের কারণসমূহ...১৫১
৫.৫.২.১ ক্রস কাজিন ও প্যারালাল কাজিন বিবাহ ১৫১
৫.৫.২.২ পরিবারকর্তৃক আয়োজিত বিবাহ ও প্রণয়ঘটিত বিবাহ ১৫২
৫.৫.২.৩ বিবাহ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কারণ ১৫৪
৫.৫.২.৪ বিবাহপূর্ব প্রণয়ের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৬
৫.৫.২.৫ বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ পক্ষকে প্রাধান্যদান...১৫৭
৫.৫.৩ পরিবারে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও উত্তরাধিকার...১৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্ক

৬.১ ভূমিকা...১৬৩
৬.২ বর্তমান গবেষণায় জ্ঞাতিসম্পর্ক...১৬৩
৬.২.১ জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী..১৬৪
৬.২.২ জ্ঞাতিসম্পর্কের মাত্রা বা নৈকট্য ১৬৭
৬.২.২.১ প্রাথমিক জ্ঞাতি..১৬৭
৬.২.২.২ গৌণ জ্ঞাতি ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.২.৩ তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত জ্ঞাতি ১৬৮

৬.২.৩ বাংলাদেশের সমাজসমূহে জ্ঞাতিসম্পর্কের বৈশিষ্ট্য ১৬৯

৬.২.৪ জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরণ ১৬৯

৬.৩ বাংলাদেশের সমাজসমূহে জ্ঞাতিসম্পর্ক ১৭৩

৬.৪ চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্ক ১৭৮

৬.৪.১ চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্ক ১৭৮

৬.৪.২ চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ১৮৯

৬.৫ মারমা জ্ঞাতিসম্পর্ক ১৯৩

৬.৫.১ মারমা জ্ঞাতিসম্পর্ক ১৯৩

৬.৫.২ মারমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ২০৪

৬.৬ ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্ক ২০৮

৬.৬.১ ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্ক ২০৮

৬.৬.২ ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ২২১

৬.৭ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ ২২৪

৬.৮ পদাবলী পরিবর্তনের কারণ ২২৭

৬.৯ জ্ঞাতির ভূমিকা ও দায়িত্বে পরিবর্তন ২২৮

সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার

৭.১ উপসংহার ২৩৪

গ্রন্থপঞ্জী ২৪১

পরিশিষ্ট ২৫২

১. প্রশ্নমালা ২৫২

২. চেকলিষ্ট ২৬৮

৩. গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের সচিত্র উপস্থাপন ২৭০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

সারণী ২.১ঃ গবেষণা এলাকার প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড.. ৮

সারণী ২.২ঃ এক নজরে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ১৩

সারণী ২.৩ঃ এন নজরে লামা উপজেলা...১৬

সারণী ২.৪ঃ এক নজরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ২০

সারণী ৪.১ঃ চাকমা খানার বার্ষিক আয় ৬৫

সারণী ৪.২ঃ চাকমা খানার বার্ষিক ব্যয়..৬৫

সারণী ৪.৩ঃ পেশাভিত্তিক পরিচয়..৬৭

সারণী ৪.৪ঃ ঘরের ধরণ... ৭১

সারণী ৪.৫ঃ বাড়ির মালিকানা...৭২

সারণী ৪.৬ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা..৭৪

সারণী ৪.৭ঃ মারমা সম্প্রদায়ের বাৎসরিক আয় ৭৭

সারণী ৪.৮ঃ মারমা সম্প্রদায়ের বাৎসরিক ব্যয় ৭৭

সারণী ৪.৯ঃ মারমা নৃগোষ্ঠীর পেশা.. ৮০

সারণী ৪.১০ঃ মারমা সম্প্রদায়ের ঘরের ধরণ ৮৬

সারণী ৪.১১ঃ মারমা বাড়ির মালিকানা ৮৭

সারণী ৪.১২ঃ মারমা নৃগোষ্ঠীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮৯

সারণী ৪.১৩ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক আয়...৯২

সারণী ৪.১৪ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক ব্যয় ৯২

সারণী ৪.১৫ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পেশা ৯৩

সারণী ৪.১৬ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ঘরের ধরণ...১০২

সারণী ৪.১৭ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বাড়ির মালিকানা ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.১৮ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের বাৎসরিক আয়-ব্যয় ১০৫

সারণী ৪.১৯ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের জীবিকা নির্বাহের উপায় ১০৬

সারণী ৪.২০ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের ধর্ম ১০৯

সারণী ৪.২১ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও লেনদেন ১১৪

সারণী ৪.২২ঃ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১১৫

সারণী ৫.১ঃ পরিবারের বর্তমান আকার ১২২

সারণী ৫.২ঃ চাকমা পরিবার প্রধান ১২৩

সারণী ৫.৩ঃ পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১২৪

সারণী ৫.৪ঃ চাকমা পরিবারে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ১২৫

সারণী ৫.৫ঃ চাকমা পরিবারের ধরণ ১২৫

সারণী ৫.৬ঃ মারমা পরিবারের আকার ১৩১

সারণী ৫.৭ঃ মারমা পরিবার প্রধান ১৩২

সারণী ৫.৮ঃ মারমা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহন ১৩২

সারণী ৫.৯ঃ মারমা পরিবারে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১৩৩

সারণী ৫.১০ঃ মারমা পরিবারের ধরণ ১৩৪

সারণী ৫.১১ঃ ত্রিপুরা পরিবারের আকার ১৩৮

সারণী ৫.১২ঃ ত্রিপুরা পরিবার প্রধান ১৩৯

সারণী ৫.১৩ঃ ত্রিপুরা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহন ১৪০

সারণী ৫.১৪ঃ ত্রিপুরা পরিবারে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন ১৪০

সারণী ৫.১৫ঃ ত্রিপুরা অতীত ও বর্তমান পরিবারের ধরণ ১৪২

সারণী ৫.১৬ঃ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১৫৯

সারণী ৬.১ঃ শ্রেণীমূলক ও বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ১৭১

সারণী ৬.২ঃ চাকমা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্বারোপ ১৭৮
সারণী ৬.৩ঃ চাকমা সম্প্রদায়কে বিপদাপদে সহায়তা প্রদানকারী..১৭৯
সারণী ৬.৪ঃ সামাজিক সুসম্পর্ক..১৭৯
সারণী ৬.৫ঃ চাকমা সমাজে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা......................১৮০
সারণী ৬.৬ঃ বিবাহিত বোন ও মেয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা..১৮১
সারণী ৬.৭ঃ চাকমা সমাজে বর্তমান ও অতীতে আত্মীয়দের সাথে দেখাসাক্ষাৎ নাকি যোগাযোগ বেশি ছিল ...১৮২
সারণী ৬.৮ঃ চাকমা সমাজে যোগাযোগ মাধ্যম ১৮৩
সারণী ৬.৯ঃ চাকমা সমাজে পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ...১৮৩
সারণী ৬.১০ঃ চাকমা সমাজে মোবাইল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ১৮৪
সারণী ৬.১১ঃ চাকমাদেরকে বিপদাপদে সহায়তাকারী ১৮৪
সারণী ৬.১২ঃ চাকমা সমাজে পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা...........................১৮৫
সারণী ৬.১৩ঃ চাকমা সামাজিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা......................................১৮৬
সারণী ৬.১৪ঃ চাকমা সমাজে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা ১৮৬
সারণী ৬.১৫ঃ চাকমা সমাজ জীবনে যাদের সাথে লেনদেন বেশি হয় ১৮৭
সারণী ৬.১৬ঃ চাকমা সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ ও প্রদান...১৮৮
সারণী ৬.১৭ঃ চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ১৯১
সারণী ৬.১৮ঃ মারমা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্বারোপ..১৯৩
সারণী ৬.১৯ঃ মারমা সম্প্রদায়কে বিপদাপদে সহায়তা প্রদানকারী ১৯৪
সারণী ৬.২০ঃ মারমা সামাজিক সুসম্পর্ক ১৯৪
সারণী ৬.২১ঃ মারমা সমাজে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা.....................১৯৫
সারণী ৬.২২ঃ মারমা সমাজে বিবাহিত বোনের সাথে যোগাযোগের মাত্রা...১৯৬
সারণী ৬.২৩ঃ মারমা সমাজে বর্তমান ও অতীতে আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নাকি যোগাযোগ বেশি ছিল ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২৪ঃ মারমা সমাজে যোগাযোগ মাধ্যম ১৯৭

সারণী ৬.২৫ঃ মারমা সমাজে পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ ১৯৮

সারণী ৬.২৬ঃ মারমা সমাজে মোবাইল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ১৯৯

সারণী ৬.২৭ঃ মারমাদেরকে বিপদাপদে সহায়তাকারী ১৯৯

সারণী ৬.২৮ঃ মারমা সমাজে পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা............................২০০

সারণী ৬.২৯ঃ মারমা সামাজিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা.......................................২০০

সারণী ৬.৩০ঃ মারমা সমাজে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা ২০১

সারণী ৬.৩১: মারমা সমাজে কোন ধরণের আত্মীয়-স্বজনের সাথে বেশি যোগাযোগ হয় ২০২

সারণী ৬.৩২ঃ মারমা সমাজ জীবনে যাদের সাথে লেনদেন বেশি হয় ২০২

সারণী ৬.৩৩ঃ মারমা সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ ও প্রদান...২০৩

সারণী ৬.৩৪ঃ মারমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ২০৬

সারণী ৬.৩৫ঃ ত্রিপুরা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্বারোপ...২০৯

সারণী ৬.৩৬ঃ ত্রিপুরা সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ২০৯

সারণী ৬.৩৭ঃ ত্রিপুরা সম্প্রদায়কে বিপদাপদে সহায়তা প্রদানকারী..২১০

সারণী ৬.৩৮ঃ ত্রিপুরা সামাজিক সুসম্পর্ক...২১০

সারণী ৬.৩৯ঃ ত্রিপুরা সমাজে পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা.....................................২১১

সারণী ৬.৪০ঃ ত্রিপুরা সমাজে বিবাহিত বোন ও মেয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা ২১২

সারণী ৬.৪১ঃ ত্রিপুরা সমাজে বর্তমান ও অতীতে আত্মীয়দের সাথে দেখাসাক্ষাৎ নাকি যোগাযোগ বেশি ছিল..২১৩

সারণী ৬.৪২ঃ ত্রিপুরা সমাজে যোগাযোগ মাধ্যম ২১৩

সারণী ৬.৪৩ঃ ত্রিপুরা সমাজে পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ...২১৪

সারণী ৬.৪৪ঃ ত্রিপুরা সমাজে মোবাইল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ..২১৪

সারণী ৬.৪৫ঃ জ্ঞাতিত্বের বন্ধন ২১৫

সারণী ৬.৪৬ঃ জ্ঞাতিত্বের বন্ধন দুর্বল হওয়ার কারণ..২১৬

সারণী ৬.৪৭ঃ জ্ঞাতিজন কর্তৃক ত্রিপুরাদেরকে বিপদাপদে সহায়তাকারী..২১৬

সারণী ৬.৪৮: ত্রিপুরা সমাজে পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা ২১৭

সারণী ৬.৪৯ঃ ত্রিপুরা সামাজিক বিবাদ নিষ্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা ২১৭

সারণী ৬.৫০ঃ ত্রিপুরা সমাজে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা..............................২১৮

সারণী ৬.৫১ঃ ত্রিপুরা সমাজে কোন ধরণের আত্মীয়-স্বজনের সাথে বেশি যোগাযোগ হয়........................২১৯

সারণী ৬.৫২ঃ ত্রিপুরা সমাজ জীবনে যাদের সাথে লেনদেন বেশি হয়...২১৯

সারণী ৬.৫৩ঃ ত্রিপুরা সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ ও প্রদান ২২০

সারণী ৬.৫৪ঃ ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী..২২৩

সারণী ৬.৫৫ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী..২২৫

সারণী ৬.৫৬: জ্ঞাতিসম্পর্কের আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ..২২৯

মানচিত্র তালিকা

মানচিত্র ২.১ঃ রাঙ্গামাটি জেলা...১৪

মানচিত্র ২.২ঃ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ও গবেষণা এলাকা...১৫

মানচিত্র ২.৩ঃ বান্দরবান জেলা...১৮

মানচিত্র ২.৪ঃ লামা উপজেলা ও গবেষণা এলাকা...১৯

মানচিত্র ২.৫ঃ খাগড়াছড়ি জেলা...২১

মানচিত্র ২.৬ঃ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও গবেষণা এলাকা..২২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তালিকা

চিত্র ৪.১ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের ঘরবাড়ির ধরণ ১১০

চিত্র ৪.২ঃ বাড়ির মালিকানা ১১১

চিত্র ৪.৩ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের শিক্ষাগত যোগ্যতা....................১১২

চিত্র ৬.১: চাকমা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা ১৯০

চিত্র ৬.২: মারমা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা....................২০৫

চিত্র ৬.৩: ত্রিপুরা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা ২২২

চার্ট তালিকা

চার্ট ৫.১ঃ পরিবারের ধরণে পরিবর্তনের কারণ ১৫১

চার্ট ৫.২ঃ ক্রস কাজিন বিবাহ ১৫২

চার্ট ৫.৩ঃ বর্তমানে বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নিজেরা পছন্দ করার প্রথা....................১৫৩

চার্ট ৫.৪ঃ পছন্দের বিবাহ বর্তমানে বেশি হওয়ার কারণ....................১৫৫

চার্ট ৫.৫ঃ পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিয়ের পরিমান হ্রাস পাওয়ার কারণ....................১৫৬

চার্ট ৫.৬: বিবাহ-পূর্ব প্রেম-ভালবাসার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি....................১৫৭

চার্ট ৫.৭ঃ বিবাহের ক্ষেত্রে কোন পক্ষকে প্রাধান্য দান....................১৫৮

ছবির তালিকা

ছবি ৪.১: চাকমা ঘরের ধরণ....................৭১

ছবি ৪.২ঃ মারমা ঘরের ধরণ.................... ৮৮

ছবি ৪.৩ঃ ত্রিপুরা ঘরের ধরণ ১০১

পরিশিষ্ট ছবির তালিকা

ছবি ১: কাপ্তাই লেক (রাঙ্গামাটি)........২৭১

ছবি ২: চাকমা ছেলে ও মেয়ে বাড়ির আঙিনায় পড়ছে। পিছনে চাকমা নারী কাপড় বোনার কাজে ব্যস্ত........২৭২

ছবি ৩: চাকমা ঘর-বাড়ি........২৭৩

ছবি ৪: চাকমা ঘর-বাড়ি........২৭৪

ছবি ৫: মারমা (ছাগলখাইয়া) গ্রামের প্রবেশ পথ........২৭৫

ছবি ৬: লামা উপজেলার মারমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল তামাক........২৭৬

ছবি ৭: বটবৃক্ষ (যেখানে ছাগলখাইয়া গ্রামের মারমারা উপাসনা করে)........২৭৭

ছবি ৮: মারমা বিয়েতে ভোজের আয়োজন........২৭৮

ছবি ৯: মারমা বিয়েতে ভোজের আয়োজন........২৭৯

ছবি ১০: মারমাদের নিজস্ব খাবারের আয়োজন........২৮০

ছবি ১১: মারমা বিয়েতে বাঙ্গালী খাবারের আয়োজন........২৮১

ছবি ১২: মারমা কনের বিয়েতে বরপক্ষের আগমন........২৮২

ছবি ১৩: মারমা ঐতিহ্য অনুসারে কণেপক্ষ কর্তৃক বরপক্ষকে গ্রহণের নিমিত্তে যাত্রা........২৮৩

ছবি ১৪: মারমা প্রথানুযায়ী বিবাহের পূর্বে কণের বাড়ির পাশের বাড়িতে বরপক্ষের অবস্থান........২৮৪

ছবি ১৫: মারমা কণের বাড়িতে নৃত্য........২৮৫

ছবি ১৬: পাহাড় থেকে খাগড়াছড়ি........২৮৬

ছবি ১৭: খাগড়াছড়ার ত্রিপুরা গ্রাম........২৮৭

ছবি ১৮: ত্রিপুরাদের জমিতে ফল চাষ........২৮৮

ছবি ১৯: ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তির বাড়ির প্রবেশ পথ........২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ ভূমিকা ও সমস্যা

বাংলাদেশের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাসকারী বহুবিধ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে, নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও রীতিনীতি এবং ভাষা নিয়ে আবহমান কাল থেকে বসবাস করে আসছে ৪৫টি নৃগোষ্ঠী, যার একটি তালিকা প্রকাশ করছে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম (২০১৩)। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীব বৈচিত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে যে সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস তাদের প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা ভাষা, ঐতিহ্য, পরিবার ব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাধারণ চিন্তা-চেতনা, সমাজ পরিচালনার নীতি, তথা শিল্প-সাহিত্য। সংস্কৃতির এসব নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রময়ের জন্যই এক জাতি গোষ্ঠী থেকে অন্য জাতি গোষ্ঠী আলাদা যা তাদেরকে বৃহত্তর বাঙ্গালি সংস্কৃতি থেকে পৃথক করেছে। প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর এই যে স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা এবং বৈচিত্র যা সত্যিকার অর্থেই অনন্য সমাবেশ। আর এই অনন্য সমাবেশ নিয়ে আজকের বাংলাদেশ (নাহার ২০১৪)। ফলে পৃথিবীতে বাংলাদেশ একটি বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক ও নানাবিধ নৃগোষ্ঠীর সন্নিবেশে একটি অনন্য জনপদ। তাই বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো গঠিত হয়েছে নানাবিধ উপাদানের মাধ্যমে। এই উপাদানসমূহের কোন কোনটি পরিবর্তিত হচ্ছে দ্রুত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা দৃশ্যমান হিসেবে আবার কোনটি ধীর গতিতে। যার ফলে সমাজ কাঠামোর মধ্যে অসমতার ধরণ ও পরিবর্তনশীলতা লক্ষণীয়। এই অসমতার পরিবর্তনশীলতা সৃষ্টি করেছে মানব সমাজের পশ্চাৎপদতা। দৃশ্যমান গতিশীলতা ও ধীরগতি এই দুইয়ের দ্বান্দিকতার কারনে সমাজকাঠামোর উপাদানগুলো পরিবর্তন হচ্ছে, যা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সমাজ বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট প্রতিয়মান।

অসংখ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাবেশের বাংলাদেশে বসবাসকারী সঠিক পরিসংখ্যান অদ্যাবধি যেমনি পাওয়া দুরহ ঠিক সরকারি দলিলপত্রের নৃতাত্ত্বিক সাহিত্যের বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সর্বশেষ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ অনুযায়ী এদেশে বসবাসকারী ২৭টি নৃগোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। এদেশে বসবাসকারী অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক হলেও ব্যতিক্রম হিসাবে গারো ও খাসিয়া নৃগোষ্ঠী মাতৃসুত্রীয় সমাজব্যবস্থার অনুসারী। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১.২ শতাংশ লোক হলো বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ আদমশুমারী অনুযায়ী ৮,৯৭,৮২৮জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছিল, যা বর্তমানে প্রায় দুই মিলিয়নের মত। এদের মধ্যে শতকরা ৯০ শতাংশ হল চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা, তারা সাধারণভাবে জুম্মা (সেন্দেল ১৯৯৮) নামে পরিচিত। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীসমূহ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাস করে। ১৯৮৪ সালে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকাটিকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হয় যেমন-বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি। এ তিনটি জেলার মধ্যে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি

যথাক্রমে মারমা, চাকমা ও ত্রিপুরা জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাধিক (বীর কুমার ২০০৬)। তাদের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বৃহত্তর বাঙ্গালি নৃগোষ্ঠীরও বসবাস। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক, পরিবার, জ্ঞাতিসম্পর্ক, ধর্ম, রাজনৈতিক, উৎপাদন প্রণালী ও বাজার ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্কসহ একটি জটিল সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। বাংলার সুদীর্ঘ ইতিহাসের যে পথ পরিক্রমা তার ধারাবাহিকতায় আজকের বাংলাদেশ। ইতিহাসের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থান থেকে বহু জাতির মানুষ এদেশে এসেছেন এবং বসতি স্থাপন করেছেন। নৃবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশ বহুধারার দেশ। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো জাতিতাত্ত্বিকভাবে সমতলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙ্গালিদের থেকে পৃথক ও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের একাংশ তিব্বত থেকে থাইল্যান্ড ও বিশাল অঞ্চলের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিশেষ শারিরীক সাদৃশ্যতা রয়েছে (রাজপুত ১৯৬৫)। ভাষাগত দিক থেকে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা বিভিন্ন ভাষার অন্তর্গত যথাক্রমে ভারতীয় বগট্য, তিব্বতে বর্মন এবং বাডো ভাষা।

যা হোক, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ঘটনাবলী দ্বারা সময়ের পরিক্রমায় নানা উপায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা সামাঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যদের কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় নতুন কিছু গ্রহণের পাশাপাশি নিজেদের ঐতিহ্যের অনেক বৈশিষ্ট্যও হারিয়েছে। প্রতিবেশী বৃহত্তর সমাজ, খ্রিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ, আধুনিক শিক্ষা, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়ন, ভূমি মালিকানা ও ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন, পেশার ধরনে পরিবর্তন এসব উপাদানের প্রভাবে তাদের জীবন প্রণালীতে নানাভাবে পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে (চৌধুরী কামাল ২০০৬)। এছাড়া আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর জীবন প্রণালী ঘাত ও অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে সনাতন ও আধুনিক এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা এর ব্যতিক্রম নহে। এই পরিবর্তন তাদের পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরনের মধ্যেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটুকু না বয়ান করেছেন তা থেকে তাদের ইতিহাস লেখনির মাধ্যমে কোন জাতি কেন্দ্রিকতা ও ক্ষমতার পরিসর চর্চার ধারাটি তেমন পরিলক্ষিত হয়। তাই বর্তমান অধ্যয়নটিতে উল্লেখিত নৃগোষ্ঠীদের সমাজ কাঠামোর প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান পরিবার যা নৃবিজ্ঞানীদের কেন্দ্রিয় প্রত্যয় হিসেবে পরিচিত তেমনি পরিবার গঠন ও সর্বকালের আত্মীয়তার বন্ধন বা জ্ঞাতি সম্পর্কটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নানাবিধ অভিঘাত, পরিবর্তন, সংমিশ্রনে তাদের সমাজব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনে

জটিলতর হচ্ছে। এ অবস্থায় নৃবৈজ্ঞানিক ও গভীরভাবে পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়নের মাধ্যমে পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের তুলনামূলকভাবে আন্তঃসাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও উদঘাটন সময়ের দাবীদার।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

ব্যাপক অর্থে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজকাঠামো ও তার উপাদানগুলো পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে কিভাবে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করে তাদের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের কী পরিবর্তন হচ্ছে এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্ক কেমন, তাকে প্রধান আলোচ্য হিসাবে উক্ত অধ্যয়নটির উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ-

ক) চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।

গ) চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীদের পরিবার ও তার বিকাশ সম্পর্কে জানা

ঘ) চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ও পরিবর্তন সম্পর্কে জানা।

১.৩ গবেষণা জিজ্ঞাসা

এই আন্তঃসাংস্কৃতিক অধ্যয়নটিতে উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত জিজ্ঞাসাগুলোর মাধ্যমে উক্ত সমাজের পরিবর্তনের ধারা ও সংকটগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১। গবেষণাধীন এলাকার চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জনমিত্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কি?

২। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রধান নিয়ামকগুলো কি?

৩। আন্তঃ ও বহিঃ বিবাহ সম্পর্ক কি ধরনের?

৪। উক্ত নৃগোষ্ঠীর পরিবারের ধরন ও কাঠামো কি ধরনের?

৫। তাদের সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ও তার পরিবর্তন কি?

৬। তাদের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের পরিবর্তনের প্রভাবগুলো কি?

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলের উপর যারা গবেষণা করেছেন, তারা বিচ্ছিন্নভাবে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষিব্যবস্থা, তাদের জনসংখ্যা, ভাষা, সাংস্কৃতিক প্রভৃতির প্রচুর বর্ণনামূলক তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা তুলে ধরেন (Maloney: 1984, Lucia Bernot: 1957, Pieree Bassaignet: 1958, Sattar: 1971, Jahangir: 1975, Bertocei: 1984 and Zaman: 1974)। শুধু তাই নয়

গত শতাব্দীর ৫০ দশকের সময় ফ্রান্স নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভিস স্ট্রস পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ করে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন (আলম সম্পাদিত ২০০০)। তবে পাবর্ত্য অঞ্চলের বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সামগ্রিকভাবে জীবন ব্যবস্থা ও কার্যক্রমে পরিবর্তনের ফলে তাদের সমাজকাঠামোর অবস্থা জটিলতর হচ্ছে এ সম্পর্কিত গবেষণা অপ্রতুল। নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য কেন্দ্রিয় মৌলিক প্রত্যয় সমূহের মধ্যে পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজকাঠামো বিশ্লেষণে প্রধান প্রভাবক (Indicator)। এ দুটো প্রত্যয় নগরায়ন, শিল্পায়ন, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ, আধুনিকায়ন এবং বিশ্বায়নের ফলে কেনো এবং কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তার একটি তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আজকের সময়ে অত্যন্ত গুরুত্ব এবং তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয় আন্তঃসাংস্কৃতিক অধ্যয়ন একেবারে হয়নি বলা চলে। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ যে বস্তুত নৃগোষ্ঠীসমূহের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসহ আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে নৃবৈজ্ঞানিক গভীরতার আলোকে অধ্যয়নকৃত নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজ কাঠামোর উপর নানাবিধ প্রভাবকের প্রভাবে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার জাতিতাত্ত্বিক বিবরণ ও ব্যাখ্যা বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা হবে। বাংলাদেশে এই ধরনের অধ্যয়ন একেবারেই অনুপস্থিত।

১.৫ গবেষনার নৈতিকতা

গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টা ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ করে নৃবিজ্ঞানের সকল পেশাগত ও বিদ্যা জাগতিক কাজের জন্য Code of ethics এর কিছু মৌলিক বিষয় মেনে চলা হয়। ১৯৮০ সালের দিকে প্রায় সকল জ্ঞানের শাখায় গবেষণাগুলোতে এই নীতিসমূহ নিজেদের মত করে জায়গা করে নেয় (Denzin and Lincoln: 1994)। তাতে বলা হয় তথ্যদাতা যদি তথ্য দিতে অস্বীকার করেন তবে তার কাছ থেকে জোর করে তথ্য আদায় করা যাবে না। তথ্যদাতাদের পরিচয় তার অনুমতি ব্যতিত প্রকাশ করা যাবে না। আবার গবেষিতদের অধিকার আছে গবেষণার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানার। কারণ তারা ঐ গবেষণার সাথে যুক্ত (Mill and weber: 1991)। আবার গবেষণার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন গবেষণায় বহুকণ্ঠস্বর (Multivocality) উপস্থিতি থাকে (Clifford and Firth: 1986)। গবেষককে খেয়াল রাখতে হবে যে গবেষণা কর্ম যেন ঐ গবেষিত সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে কাজ করে। তাই উক্ত গবেষণায় একজন গবেষক হিসেবে নৃবিজ্ঞানে Code of ethics গুলো বজায় রেখে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

২.১ গবেষণা এলাকা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের এক দশমাংশ আয়তন জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এর তিনটি জেলা হল রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি। এই তিন জেলার তিনটি উপজেলায় বর্তমান গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়। এর মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ভেড়ভেড়ি ও মনোঘর এলাকায়, বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার ছাগলখাইয়া গ্রামে, এবং খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার খাগড়াপুর ও খাগড়াছড়া গ্রামে মাঠকর্ম পরিচালিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম (Chittagong Hill Tracts) দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাপক পাহাড়ি অঞ্চল যার অবস্থান ২১°২৫´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২°৫০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এর দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মায়ানমার, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে মিজোরাম এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকা প্রায় ২৩,১৮৪ বর্গ কিমি যা বাংলাদেশের মোট এলাকার প্রায় এক দশমাংশ।রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এ তিনটি জেলার মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ১৫,৮৭,০০০ জন।এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তা তাদের নিজ নিজ ভাষা, সাংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ১৮৬০ সালে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলকে তিনটি জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় মোট ৭টি পৌরসভা এবং ২৬ টি উপজেলা আছে।পাহাড়, বন, নদী, ঝর্ণা-এ অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এ অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৫)।

বঙ্গের প্রথম প্রকাশিত মানচিত্রে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য এর অনেক আগে ৯৫৩ সালে আরাকানের এক রাজা পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জেলাসমূহ ও চট্টগ্রাম দখল করেন। পরবর্তীতে ১২৪০ সালে ত্রিপুরার রাজা এই অঞ্চল দখল করেন। আরাকানের রাজা ১৫৭৫ সালে জেলাগুলো পুনরায় দখল করে নেন এবং ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত দখল বজায় রাখেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পার্বত্য ত্রিপুরা ও আরাকানের শাসকদের মধ্যেই এই অঞ্চলের মালিকানার দ্রুত হাতবদল হতে থাকে। মুগলরা ১৬৬৬ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করে। ১৭৬০ সালে এলাকাটির কর্তৃত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। ব্রিটিশরা ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে একে ব্রিটিশ ভারতের অংশে পরিণত করে। তারা এর নামকরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রামের সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে নথিভুক্ত করে। দক্ষিণের পাহাড় পার্বত্য আরাকান ও উত্তরের পাহাড় পার্বত্য ত্রিপুরা রূপে পরিচিত হয়। প্রশাসনিকভাবে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বঙ্গ প্রদেশের অধীনে নিয়ে আসে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধিতে হেডম্যান ও প্রধানদের নেতৃত্বে কর আদায়ের একটি স্থানীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের এখতিয়ারে আসে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এটি বাংলাদেশের অধিভুক্ত হয় এবং এখানে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ও উন্নয়ন কার্যক্রম সূচীত হয়। আশির দশকের প্রথম দিকে দেশব্যাপী প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাএই তিন জেলার অধিভূক্ত তিনটি উপজেলায় বর্তমান গবেষণার মাঠকর্ম পরিচালিত হয়। তা হল- রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলা, খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলা, এবং বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা।

এখানকার আবহাওয়া ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তর ও পূর্বে ২৫৪০ মিমি এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে ২৫৪০ মিমি থেকে ৩৮১০ মিমি। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীত ঋতু। এপ্রিল থেকে মে সময়টা প্রাক-বর্ষা মৌসুম। এটি খুবই গরম ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল। বর্ষা মৌসুম জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এ সময়টা গরম, মেঘলা ও আর্দ্র।

খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র গ্যাসক্ষেত্র। ১৯৬৯ সালে ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি এটি আবিষ্কার করে। অন্যান্য প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে বেলেপাথর, গণ্ডশিলা, ক্যালকেরিয়াস কনক্রিশন, কংগেণ্ডামারেট ও লিগনাইট কয়লা। চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলি নদীর তীরে একটি কাগজের কল স্থাপিত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাইয়ে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পাহাড়ি জনগণ ঐতিহ্যবাহী সুতার কাপড়, বাঁশের জাল ও ঝুড়ি তৈরি করে। এছাড়া এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সারণী ২.১ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হল-

সারণী ২.১ঃ গবেষণা এলাকার প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

কর্মক্ষেত্র	নারী-পুরুষের যৌথ কর্মকাণ্ড	শুধুমাত্র পুরুষের কর্ম	শুধুমাত্র নারীর কর্ম	শিশুদের কর্ম
জুমচাষ	জঙ্গল পরিষ্কারকরণ, ছাই ছিটানো, শস্য বপন ও নিড়ানো,	জঙ্গল ও গাছের ডালপালা কাটা, অগ্নিসংযোগ,	মৎস্য শুকানো, মজুত রাখা, ঢেঁকিতে ধান ছাঁটা।	পশুপাখি তাড়ানো।

Dhaka University Institutional Repository

	শস্য কর্তন ও মাড়াই।	শিকার, শস্য বিক্রয়।		
সমতল ভূমির কৃষি	বীজ বপন ও চারা রোপণ, শস্য নিড়ানো ও পরিচর্যা, শস্য উত্তোলন।	লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া, শস্য বিক্রয়, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার।	শস্য শুকানো ও সঞ্চয় রাখা, ঢেঁকিতে ধান ছাঁটা।	পশুপখি তাড়ানো ও শস্য পাহারা দেওয়া।
গৃহসংলগ্ন বাগান ও সবজি	জমি তৈরি, বীজ বপন ও ফসল উত্তোলন।	ফল সংগ্রহ ও বড় গাছের চারা রোপণ করা।	আহরিত ফল ও সবজি সংরণ করা।	বাগান পাহারা দেওয়া ও আগাছা নিড়ানো।
গৃহস্থালি কর্ম	---	---	রান্না, পশুপাখির পরিচর্যা, পরিচ্ছন্নতা, পানি আনা, শিশু পালন করা।	গৃহস্থালি কর্মে সহযোগিতা, পশুচারণ।
বনজ সম্পদ সংগ্রহ	ছন ও ঘাস কাটা এবং ফলমূল সংগ্রহ করা।	বাঁশ, বেত ও কাঠ আহরণ।	জ্বালানি কাঠ ও শামুক সংগ্রহ।	বনজ ফলমূল ও সবজি সংগ্রহ এবং শামুক জাতীয় প্রাণী সংগ্রহ।
শিকার	মৎস্য শিকার।	বন্য হরিণ শিকার, শূকর, খরগোশ ও পাখি শিকার।	---	মৎস্য শিকার।
হস্তশিল্প ও অন্যান্য	বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি; বাঁশ ও বেতের ছাল দ্বারা রশি তৈরি এবং লোকজ ঔষধ তৈরি।	বেতের রশি তৈরি করা, চোলাই মদ তৈরি, গৃহ নির্মাণ।	তাঁত বোনা, সুতা কাটা, বিড়ি সিগারেট তৈরি।	বিভিন্ন হস্তশিল্পে সহকারী হিসেবে কাজ করা।
পশু পালন		---	হাঁস-মুরগি পালন। গরু/ছাগল পালন, শূকর পালন, ঘি,মাখন ও দধি তৈরি।	পশু চরানো।
ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য	---	হাটে-বাজারে পণ্য বিক্রয়।	বিক্রয়কর্মে সহযোগিতা করা।	---

(উৎসঃ বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-প্রাকৃতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল উত্তর ও পূর্বের উঁচু পাহাড় বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এই পর্বতশ্রেণী সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণের হবিগঞ্জের কিছু অংশ এবং মৌলভীবাজারের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমানা বেষ্টন করে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল পর্বতশ্রেণীই প্রায় তরু আচ্ছাদিত শৈলশিরা। এগুলো খুব খাড়াভাবে উপরে উঠে যাওয়ায় উচ্চতার তুলনায় অনেক বেশি দৃষ্টি নন্দন। অধিকাংশ পাহাড় শ্রেণীতে চূড়া ও ঝর্ণাসহ পশ্চিম দিকে খাড়া ঢাল (scarp) আছে। বঙ্গোপসাগরে নিপতিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নদী নিয়ে গঠিত জালিকা সদৃশ (Trellis) ও বৃক্ষসদৃশ (Dendritic) জলনিকাশ প্যাটার্নের এক অতি ব্যাপক নেটওয়ার্ক অঞ্চলটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহ হচ্ছে কর্ণফুলি, সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও ফেনী। পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপনদীর মধ্যেচেঙ্গী, কাসালং, রেংখিয়ং অন্যতম।সাধারণত পাহাড়শ্রেণী ও নদী উপত্যকাসমূহ অনুদৈর্ঘ্যভাবে সারিবদ্ধ। পার্বত্যজেলাটির উত্তরাঞ্চলে গড়ে তিন শতাধিক মিটার উচ্চতা সম্পন্ন চারটি পাহাড় শ্রেণী উত্তর-দক্ষিণ বরাবর উঠে গেছে। এগুলো হচ্ছে ফোরামেইন রেঞ্জ (ফোরামেইন, ৪৬৩ মি), দোলাজারি রেঞ্জ (ল্যাংট্রাই, ৪২৯ মি), ভুয়াছড়ি (চাংপাই, ৬১১ মি) ও বরকল রেঞ্জ (থাংনাং, ৭৩৫ মি)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তভাগে কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণে বাংলাদেশের অংশে ৭টি প্রধান পাহাড় শ্রেণী রয়েছে। এগুলো হচ্ছে মুরাঞ্জা রেঞ্জ (বাসিটং, ৬৬৪ মি), ওয়েইলা রেঞ্জ (এর অধিকাংশ শ্রেণী মায়ানমারে), চিম্বুক রেঞ্জ (টিন্ডু, ৮৯৮ মি), বাটিমেইন রেঞ্জ (বাটিটং, ৫২৬ মি), পোলিটাই রেঞ্জ (কেওক্রাডাঙ, ৮৮৪ মি), রামিওটং (৯২১ মি), সাইচল-মৌডক রেঞ্জ (বিলাইসড়ি, ৬৬৯ মি) এবং সাইচল রেঞ্জ। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলো সাইচাল রেঞ্জে অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে ওয়েবুং (৮০৮ মি), র‌্যাংলাং (৯৫৮ মি), মৌডক লাং (৯০৫ মি) ও মায়ানমারের সীমান্তবর্তী মৌডক মুয়াল (১,০০৩ মি)। এই সব পাহাড়শ্রেণীর কয়েকটিতে গ্যাস সঞ্চিত থাকার উপযুক্ত উত্তম আবদ্ধিক কাঠামো গঠনের মতো ভূতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঊর্ধ্বভঙ্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কাঠামোসমূহের মধ্যে রয়েছে সেমুতাং উত্তলভঙ্গ (গড় উচ্চতা ৮০ মি কোন কোন স্থানে ১৬০ মি থেকে বেশি), সীতাপাহাড় উত্তলভঙ্গ (২৪৫ থেকে ৩৩০ মি কাঠামোর দক্ষিণ ও মধ্যভাগে এবং উত্তরাঞ্চলে ৩৩০ থেকে ৪১০ মি), মাতামুহুরী উত্তলভঙ্গ (উত্তর অংশে গড় উচ্চতা ২৪৫ থেকে ৩৩০ মি কিন্তু দক্ষিণ অংশে এই উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে ৪১০ থেকে ৫৭০ মি উঠে সর্বোচ্চ ৭১০ মি পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে) এবং বান্দরবান উত্তলভঙ্গ (সর্বোচ্চ উচ্চতা ৬৫০ থেকে ৮০০ মি। এর মধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে তিনটি শৃঙ্গ অবস্থিত যাদের উচ্চতা ৯৩৫ মি, ৯৬০ মি ও ৯৬৫ মি)। হ্রদ ও জলাশয় অঞ্চলটিতে দুটি প্রাকৃতিক হ্রদ (রাইনখিয়ং হ্রদ ও বগাকাইন হ্রদ) ও একটি কৃত্রিম হ্রদ (কাপ্তাই লেক) রয়েছে। কাপ্তাই লেক শুকনা মৌসুমে প্রায় ৭৬৭ বর্গ কিমি ও বর্ষা মৌসুমে প্রায় ১,০৩৬ বর্গ কিমি

Dhaka University Institutional Repository

এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে। ভারতীয় ও এশিয়ান প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ম। ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষাংশে গন্ডোয়ানাল্যান্ডভেঙ্গে যাওয়ার পর ভারত-অস্ট্রেলীয় প্লেট বছরে ৬ সেমি হারে দক্ষিণপূর্ব দিকে প্রায় ১৭৫০ কিমি এগিয়ে যায়। পরবর্তীতে ভারতীয় প্লেট অস্ট্রেলীয় প্লেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে। এ সময়টিতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস শুরু হয়। ধীরে ধীরে বছরে ৫ সেমি সঞ্চরণ হারে ভারত ইয়োসিন উপযুগে ইয়োরেশিয় প্লেটের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষের আগে উত্তর দিকে আরও প্রায় ২৫০০ কিমি সরে যায়। সেই থেকে টেথিস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বছরে ৩ সেমি সঞ্চরণ হারে ভারতীয় প্লেট উত্তরপশ্চিম দিকে আরও ১০০০ কিমি সরে যায়। প্রাক ওলিগোসিন যুগে প্লেট সঞ্চরন সামান্য ভিন্ন দিকে পুনরায় শুরু হয় অথবা দ্রুতগতি সম্পন্ন হয় এবং ভারত আরও উত্তরপুর্ব মুখে এশিয়ার কেন্দ্রাভিমুখী হয়।

সামুদ্রিক ভূত্বক বর্মী উপ-প্লেটের নিচে অধোগমন করতে শুরু করে যার ফলে পূর্ব দিকে একটি পৃষ্ঠ চাপ অববাহিকা ও পশ্চিম দিকে একটি সম্মুখ চাপ অববাহিকার সৃষ্টি হয় যা প্রাথমিক ভাবে উত্থিত ইয়োমা সন্ধি-অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। মধ্য বার্মা বা ইরাবতী অববাহিকা পৃষ্ঠ-চাপ অববাহিকার প্রতিনিধিত্ব করে; আর চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা পাহাড় সমেত আরাকান-ইয়োমা বলিত বলয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম যার একটি অংশ, বিশেষ সম্মুখ চাপ অববাহিকার প্রতিনিধিত্ব করে। মায়োসিন ও নিম্ন প্লাইসটোসিন যুগে ইরাবতী অববাহিকায় অবক্ষেপিত পলির তলানি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা পাহাড়ে প্রকটিত। ফলে, সম্মুখ চাপ অববাহিকায় অবক্ষেপিত ভারতীয় প্লেট ও টারশিয়ারি পলির তলানির সমকেন্দ্রাভিমুখ যাত্রাকালে অঞ্চলটি মায়োসিন গিরিজনীর সময়কালে উত্থিত হয় এবং এই উত্থান প্লাইসটোসিন গিরিজনী পর্যন্ত চলতে থাকে যার ফলে বর্তমান আরাকান ইয়োমা সুবৃহৎ-উর্ধ্বভঙ্গ ধারা এবং এর পশ্চিমমুখী সম্প্রসারিত চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা পর্বত বলয়ের সৃষ্টি হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকটিত সবচেয়ে প্রাচীন শিলা ইউনিট হচ্ছে মায়োসিন যুগের সুরমা গ্রুপেরভুবন স্তরসমষ্টি। মায়োসিন ভুবন স্তরসমষ্টির চেয়ে প্রাচীন কোন প্রকটিত শিলার সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। প্যালিওজিন অবক্ষেপসমূহ অনেক গভীরে প্রোথিত এবং কোন কূপে এটি এখনও পাওয়া যায়নি। সুরমা গ্রুপেরঅবক্ষেপ প্লায়ো-প্লাইসটোসিন যুগের টিপাম বেলেপাথর গ্রুপেরদ্বারা অধিশায়িত। প্লাইসটোসিন যুগের ডিহিং স্তরসমষ্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কদাচিৎ চোখে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উর্ধ্ব-টারশিয়ারি বেলেময় এঁটেল তলানিসমূহ ধারাবাহিক সাবমেরিডিওনাল (উত্তর উত্তর পশ্চিম-দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব) উত্তলভঙ্গ ও অবতল ভঙ্গে ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে আছে যার প্রমাণ এখানকার সুদীর্ঘ পর্বতমালা ও মধ্যবর্তী উপত্যকাসমূহের পৃষ্ঠদেশের ভূসংস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। বলিত গঠনসমূহ পূর্বদিকে বর্ধিতহারে পরিমাত্রা ও মিশ্রণসহ এন এশিলং (en echelon) দিক স্থিতি দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অনুরূপভাবে, বলিত প্রান্ত তিনটি সমান্তরাল পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় উত্তর-দক্ষিণ প্রবণ বলয়ে বিভক্ত যেমনঃ (ক) পশ্চিমাঞ্চলীয় বলয়ে সাধারণ বাক্সসদৃশ্য বা অনুরূপ আকারের উত্তলভঙ্গ রয়েছে যার খাড়া প্রান্ত ও আলতো চূড়াগুলো মৃদু অবতল ভঙ্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন, মাতামুহুরী উত্তলভঙ্গ, সেমুতাং উত্তল ভঙ্গ ইত্যাদি যার উদাহরণ; (খ) মধ্য বলয় সাধারণ বাক্স সদৃশ্য ভাঁজের বিপরীতে আরও চাপা কাঠামোর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যাতে রয়েছে গিরিশিরা সদৃশ ও অপ্রতিসম উত্তলভঙ্গ যেখানে প্রায়শই বিচ্যুতিসমূহ লক্ষ্য করা যায় এবং যা সংকীর্ণ অবতলভঙ্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন, যেমন সীতাপাহাড় উত্তলভঙ্গ, বান্দরবান উত্তলভঙ্গ, গিলাশরি উত্তলভঙ্গ, পটিয়া উত্তলভঙ্গ, চ্যাঙ্গোটুং উত্তলভঙ্গ, তুলামুরা উত্তলভঙ্গ, কাপ্তাই অবতলভঙ্গ, আলীকদম অবতলভঙ্গ ইত্যাদি; (গ) পূর্বাঞ্চলীয় বলয় অতিমাত্রায় চাপা সংকীর্ণ উত্তলভঙ্গ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যাতে রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠেলাচ্যুতি (thrust fault) সহযোগে খাড়া টুকরা টুকরা পার্শ্বদেশ, যেমন, বেলাসরি উত্তলভঙ্গ, শুভলং অবতলভঙ্গ। উঠানছত্র উত্তলভঙ্গ, বরকল উত্তলভঙ্গ, মৌডাক উত্তলভঙ্গ, রাটলং উত্তলভঙ্গ, কাসালং অবতলভঙ্গ, সাজুভ্যালে অবতলভঙ্গ এবং অন্যান্য (চৌধুরী ২০১৫)।

২.১.১ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা

বর্তমান গবেষণার জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমাদের বসবাস হল রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায়। রাঙ্গামাটি সদর থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার আয়তন ৫৪৬.৪৯ বর্গ কিমি। এর অবস্থান ২২°৩০' থেকে ২২°৪৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২°০৪' থেকে ৯২°২২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এর উত্তরে নানিয়ারচর ও লংগদু উপজেলা, দক্ষিণে কাপ্তাই ও বিলাইছড়ি উপজেলা, পূর্বে বরকল ও জুরাছড়ি উপজেলা, পশ্চিমে কাউখালী উপজেলা। এর জনসংখ্যা ৯৯২৬১ জন; এর মধ্যে পুরুষ ৫৪৪৯০ জন, মহিলা ৪৪৭৭১ জন। ধর্মীয় দিক থেকে মুসলিম ৩৯৭৫৯ জন, হিন্দু ১২১৫৬ জন, বৌদ্ধ ৯২২ জন, খ্রিস্টান ৪৬২০৮ জন এবং অন্যান্য ২১৬ জন। এ উপজেলায় চাকমা ছাড়াও মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, খুমি, চাক, লুসাই, পাংখো প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এই উপজলেলার প্রধান জলাশয় কর্ণফুলি নদী ও কাপ্তাই হ্রদ। এ উপজেলার মোট আয়তনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে কাপ্তাই হ্রদ। নিচে এক নজরে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দেয়া হল-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ২.২: এক নজরে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা

উপজেলা								
পৌরসভা (%)	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রাম	জনসংখ্যা	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)		শিক্ষার হার (%)	
					শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম
	৬	২১	১৬২	৬৬৮৩৬	৩২৪২৫	১৮২	৭০.১	৩৮.৬

(বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

এই উপজেলায় শিক্ষার হার ৬০.২%; পুরুষ ৬৬.৪%, মহিলা ৫২.৫%। এই উপজেলায় ২টি কলেজ, ৩টি পালি কলেজ, ১ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪৮ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬টি কমিউনিটি বিদ্যালয়, ৬টি কিন্ডার গার্টেন রয়েছে। জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ২৮.২৭%, অকৃষি শ্রমিক ৭.৫১%, ব্যবসা ১৯.২৫%, চাকরি ২৫.১২%, নির্মাণ ২%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ১.৩৩% এবং অন্যান্য ১৬.৫২%। এই উপজেলায় ভূমিমালিক ৪৮.০১%ও ভূমিহীন ৫১.৯৯%। শহরে ৩৯.৩৯% এবং গ্রামে ৬৫.৪৮% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে।প্রধান কৃষি ফসল ধান, আখ, ভুট্টা, ডাল, তুলা, ও তামাক।

এই উপজেলার পাকারাস্তা ২২৮ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ২০ কিমি, কাঁচারাস্তা ২৬৭ কিমি; নৌপথ ৫৯.৪ নটিক্যাল মাইল। কুটিরশিল্পর মধ্যে স্বর্ণশিল্প, লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, কাঠের কাজ ও বাঁশের কাজ রয়েছে। হাটবাজারের মধ্যে মানিকছড়ি হাট, রাঙ্গাপানি হাট, জীবতলী হাট, আওলাদ হাট, বন্দুকভাঙ্গা বাজার, বড় মাইনীমুখ বাজার ও রাঙ্গামাটি নতুন বাজার উল্লেখযোগ্য। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য কাঠ, কাঁঠাল, লেবু, আনারস। এ উপজেলার সব কটি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৫৫.৭১% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৪২.১৪%, পুকুর ৬.১১%, ট্যাপ ৩০% এবং অন্যান্য ২১.৭৫%। এ উপজেলার ৩৯.৩৫% (গ্রামে ৯% এবং শহরে ৫৪.২৮%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৫৪.০৮% (গ্রামে ৭৭.৭১% এবং শহরে ৪২.৪২%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ৬.৫৯% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই (সোহরাওয়ার্দী ২০১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

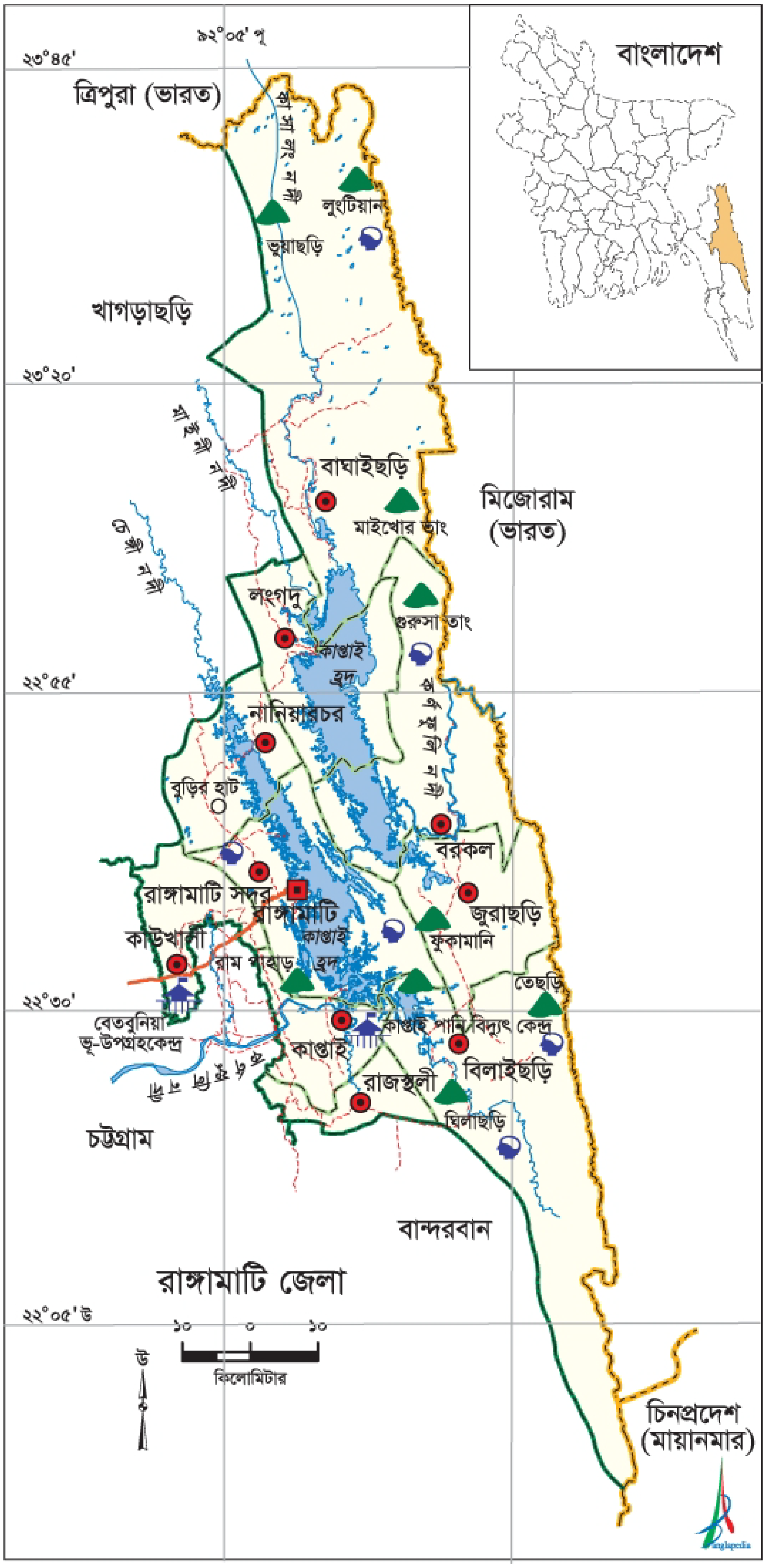

মানচিত্র ২.১ঃ রাঙ্গামাটি জেলা (উৎসঃ বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

Dhaka University Institutional Repository

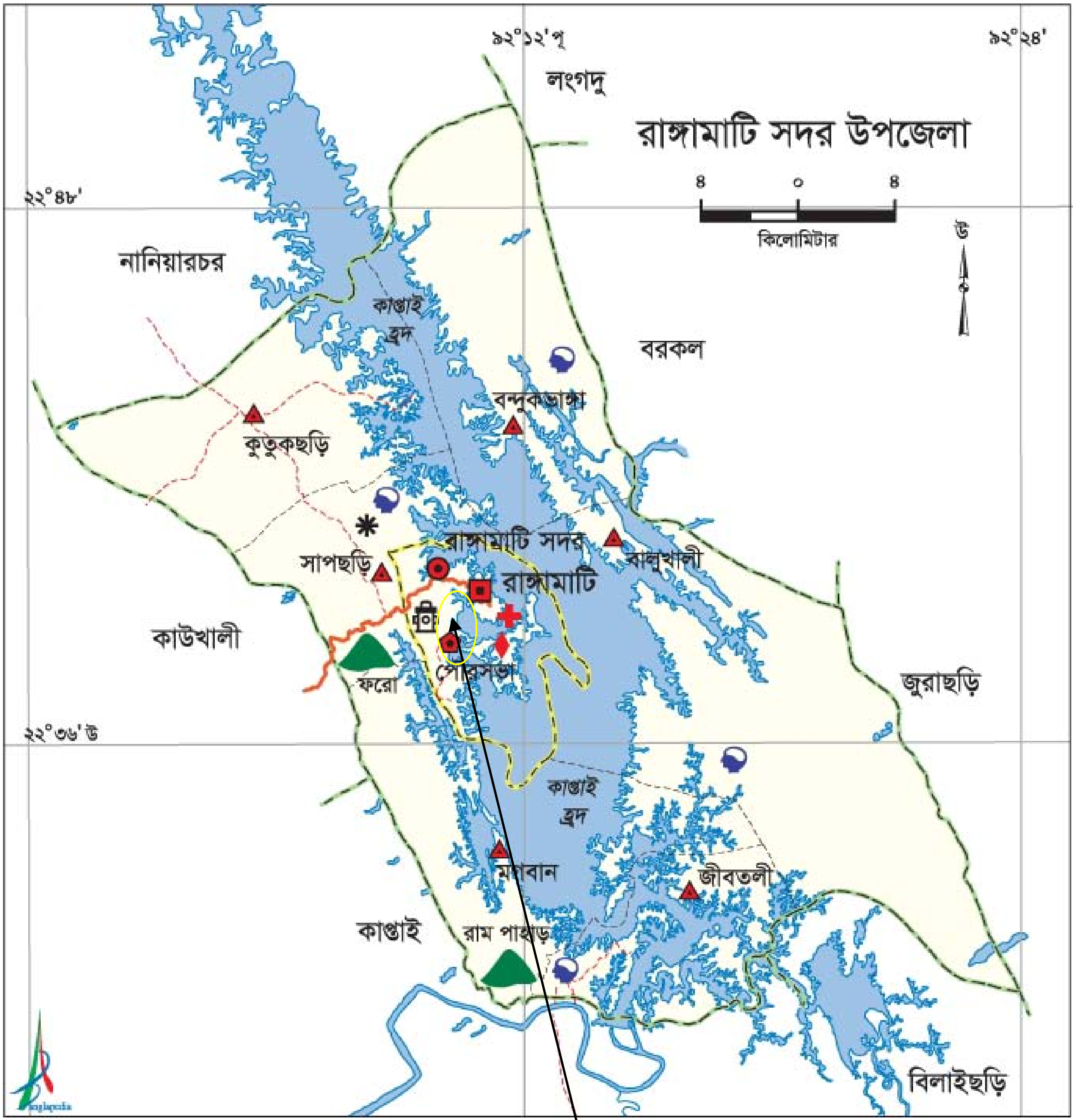

মানচিত্র ২.২ঃ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ও গবেষণা এলাকা (উৎসঃ বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

Dhaka University Institutional Repository

২.১.২ লামা উপজেলা

এই উপজেলার মারমা সম্প্রদায়ের উপর বর্তমান গবেষণা কর্মের মাঠকর্ম পরিচালিত হয়। লামা থানা গঠিত হয় ১৯২৩ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৫ সালে।লামা উপজেলার আয়তন ৬৭১.৮৪ বর্গ কিমি। এর অবস্থান ২১°৩৬' থেকে ২১°৫৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২ক্ক০৪' থেকে ৯২ক্ক২৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এর উত্তরে বান্দরবান সদর এবং লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) উপজেলা, দক্ষিণে নাইক্ষ্যংছড়ি ও আলিকদম উপজেলা, পূর্বে রুমা, থানচি এবং আলিকদম উপজেলা, পশ্চিমে চকোরিয়া উপজেলা। এ উপজেলার লাকপাং ডং পাহাড় ও মুরাংজা তাং পাহাড় উল্লেখযোগ্য। জনসংখ্যা ৭৮৪৮৮ জন; পুরুষ ৪১৬৯৩ জন, মহিলা ৩৬৭৯৫ জন। মুসলিম ৫৫৩৪৯ জন, হিন্দু ২৪৩৪ জন, বৌদ্ধ ৪৯৬৬ জন, খ্রিস্টান ১৫৪২৯ জন এবং অন্যান্য ৩১০। প্রধান জলাশয় মাতামুহুরী নদী।

সারণী ২.৩ঃ এক নজরে লামা উপজেলা

উপজেলা								
পৌরসভা (%)	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রাম	জনসংখ্যা	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)		শিক্ষার হার (%)	
					শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম
-	৬	১৮	৩৫৫	১৩৯৫৫	৬৪৫৩৩	১১৭	৪৫	২৭.২

(বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

শিক্ষার গড় হার ৩০.৪%; পুরুষ ৩৬.৪%, মহিলা ২৩.৫%। এই উপজেলায় ১টি কলেজ, ৬টিমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি কমিউনিটি বিদ্যালয়, ৪ টি মাদ্রাসা রয়েছে জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ৬২.১৮% অকৃষি শ্রমিক ৭.৪%, শিল্প ০.৪৬%, ব্যবসা ১০.৮২%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ০.৬১%, চাকরি ৭.৫২%, নির্মাণ ০.৬%, ধর্মীয় সেবা ০.২৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.৩১% এবং অন্যান্য ৯.৮৩%।

এউ উপজেলায় ভূমিমালিক ৫০.০৯%, ভূমিহীন ৪৯.৯১%। শহরে ৩৭.১২% এবং গ্রামে ৫২.৭৪% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে।প্রধান কৃষি ফসল ধান, তামাক, আলু, আদা, বাদাম, হলুদ, তিল, তুলা, শাকসবজি।শিল্প ও

Dhaka University Institutional Repository

কলকারখানা চালকল, ম্যাচ ফ্যাক্টরি। কুটিরশিল্প তাঁতশিল্প, দারুশিল্প, করাত কল, বাঁশ ও বেতের কাজ। হাট বাজারের মধ্যে লামা বাজার, গজালিয়া বাজার, কিয়াজু পাড়া বাজার, রূপসী বাজার ও আজিজনগর বাজার উল্লেখযোগ্য। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য কলা, কাঁঠাল, বাঁশ, তুলা, তিল, আদা, সুতা, হলুদ। এ উপজেলার সবকটি ইউনিয়নপল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ১১.২৩% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৫৩.৮৭%, ট্যাপ ০.৪১%, পুকুর ৭.৯% এবং অন্যান্য ৩৭.৮২% ।স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ উপজেলার ১০.৫৭% (গ্রামে ৬.৭৮% এবং শহরে ২৯.১৯%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৫৫.৩৩% (গ্রামে ৫৬.১১% এবং শহরে ৫১.৫২%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ৩৪.১% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই (রহমান ২০১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

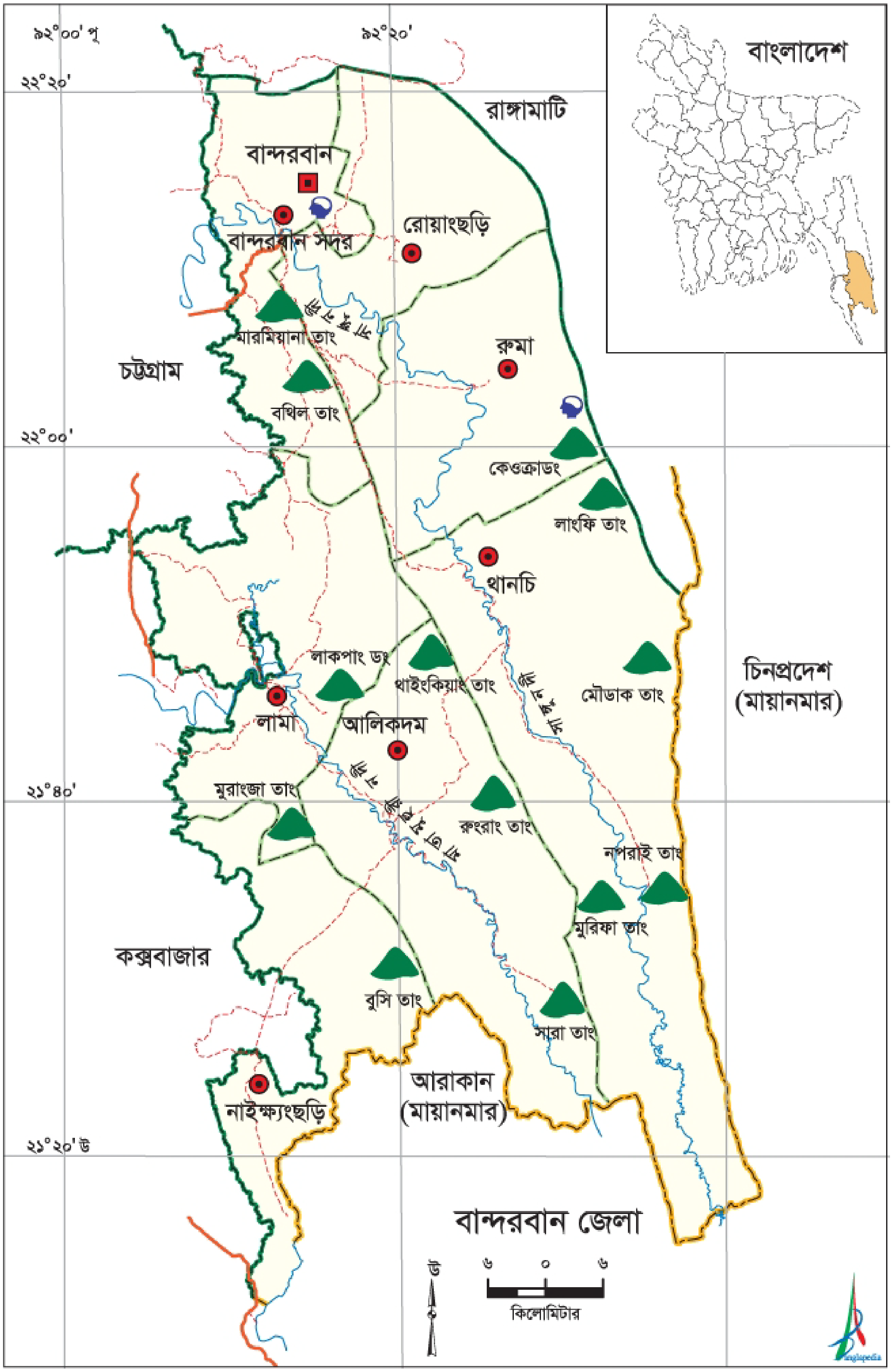

মানচিত্র ২.৩ঃ বান্দরবান জেলা (উৎসঃ বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

Dhaka University Institutional Repository

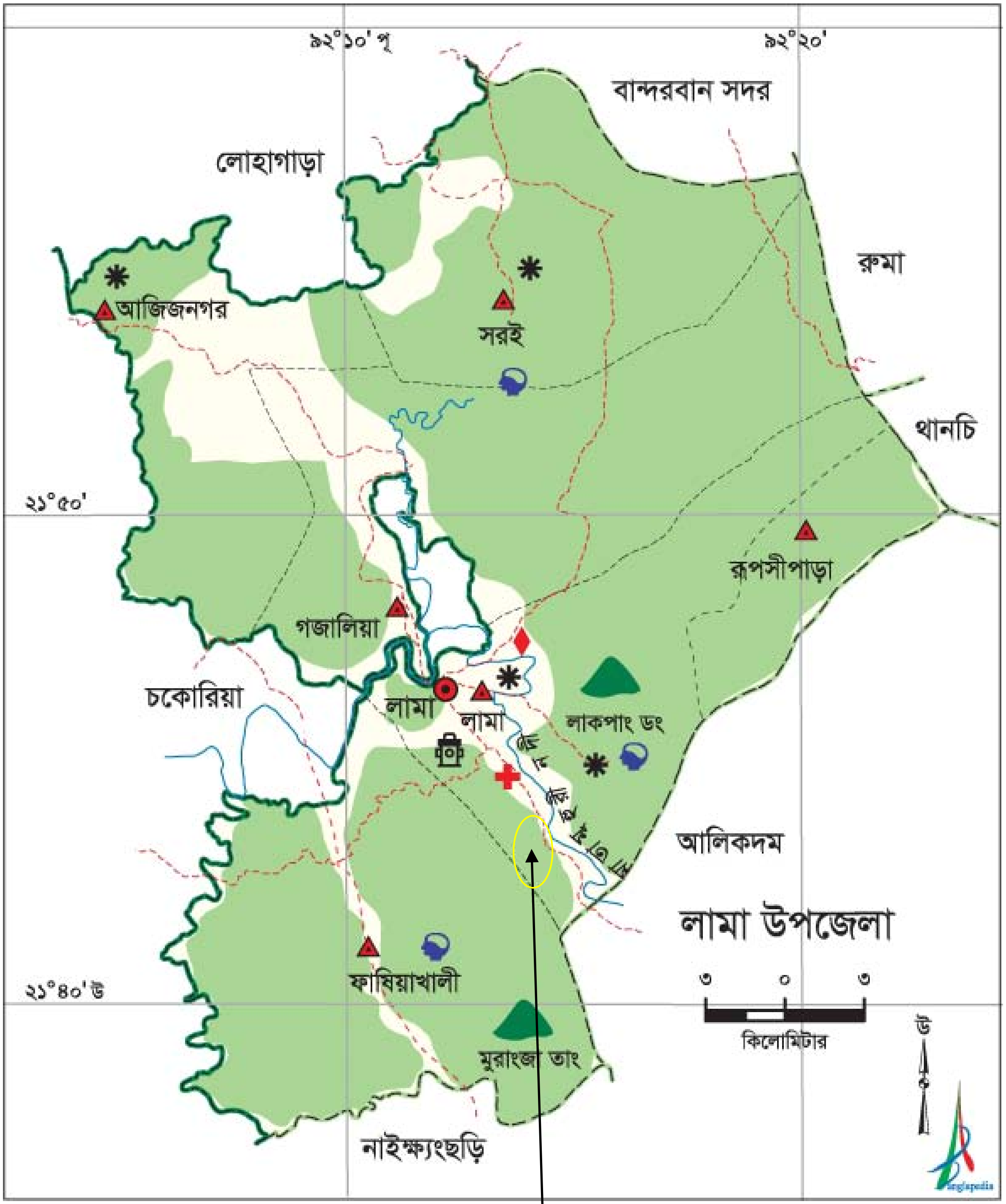

মানচিত্র ২.৪ঃ লামা উপজেলা ও গবেষণা এলাকা (উৎসঃ বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৩ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা

গবেষণাকৃত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বসবাস খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায়। রেম্রচাই চৌধুরী ১৮৬০ সালে খাগড়াছড়ি উপজেলা শহরের গোড়াপত্তন করেন। খাগড়াছড়ি থানা গঠিত হয় ১৯৬৮ সালে এবং থানা উপজেলায় রূপান্তরিত হয় ১৯৮৪ সালে।খাগড়াছড়ি সদর উপজেলারআয়তন ২৯৭.৯২ বর্গ কিমি। ২৩°০০' থেকে ২৩°২১' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৫' এবং ৯২°০০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে পানছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে মহালছড়ি উপজেলা, পূর্বে দীঘিনালা ও লংগদু উপজেলা এবং পশ্চিমে মাটিরাঙ্গা উপজেলা। জনসংখ্যা ৯২৩৮০ জন; পুরুষ ৫০৩৮০ জন, মহিলা ৪২০০০ জন। মুসলিম ৩১০০০ জন, হিন্দু ২২৭৪৭ জন, বৌদ্ধ ১৫৩০ জন, খ্রিস্টান ৩৭০৬২ জন এবং অন্যান্য ৪১ জন। এ উপজেলায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

সারণী ২.৪ঃ এক নজরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা

উপজেলা								
পৌরসভা (%)	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রাম	জনসংখ্যা		ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	শিক্ষার হার (%)	
				শহর	গ্রাম		শহর	গ্রাম
১	৫	১৩	২২৮	৫৭০৮৭	৩৫২৯৩	৩১০	৫৬.৩	৩১.৭

(উৎসঃ বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

শিক্ষার হার ৪৭.২%; পুরুষ ৫৫.০%, মহিলা ৩৭.৮%। যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ৮০.৩৩ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ৩০ কিমি, কাঁচারাস্তা ১২৫ কিমি। শিল্প ও কলকারখানা সমিল, আইস ফ্যাক্টরি। কুটিরশিল্প তাঁতশিল্প, স্বর্ণশিল্প, লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ, বাঁশের কাজ। বাজারের মধ্যে খাগড়াছড়ি বাজার এবং শিব মেলা ও বৌদ্ধ মেলা উল্লেখযোগ্য। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য কলা, আনারস, কাঁঠাল, পেঁপে। এ উপজেলার সবকটি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ২৯.৭৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৬০.৮৭%, ট্যাপ ৩.৮৩%, পুকুর ১.৪৬% এবং অন্যান্য ৩৩.৮৪%।স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ উপজেলার ২১.৭২% (গ্রামে ৩.০৯% এবং শহরে ৩৪.০০%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৬৪.৬১% (গ্রামে ৭৯.৭১% এবং শহরে ৫৪.৬৫%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১৩.৬৭% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই (চাকমা ২০১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

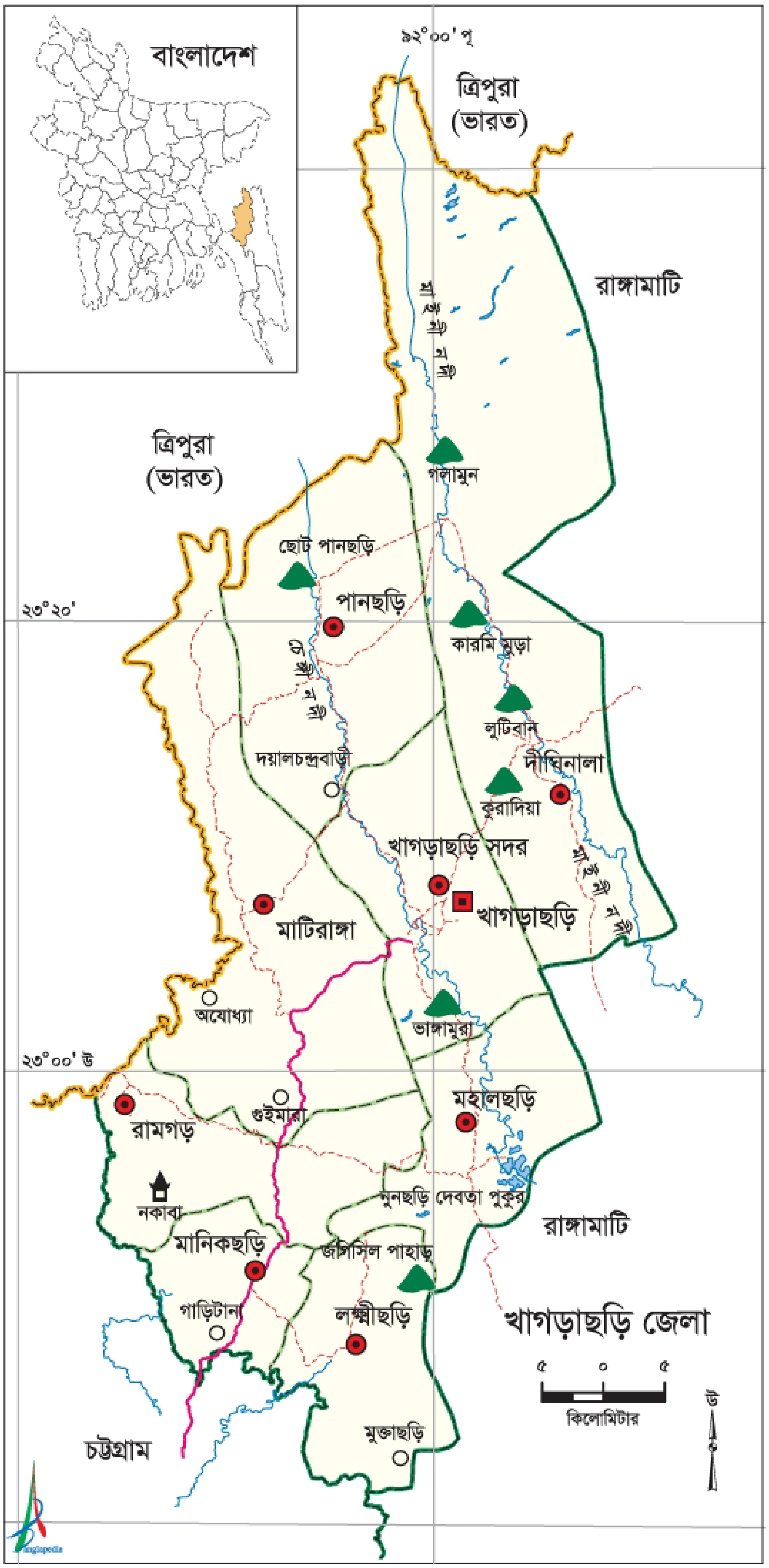

মানচিত্র ২.৫ঃ খাগড়াছড়ি জেলা (উৎসঃ বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

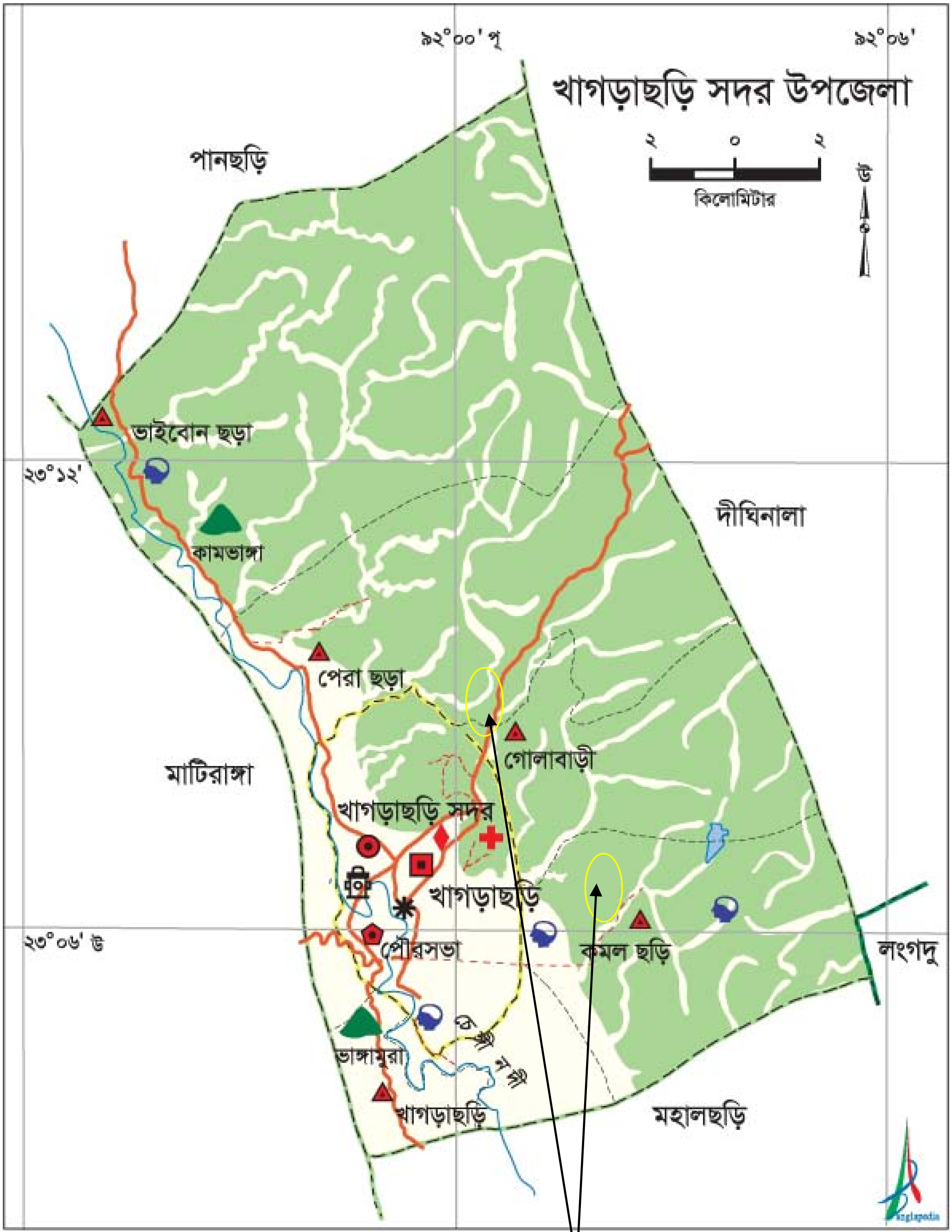

মানচিত্র ২.৬ঃ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও গবেষণা এলাকা (উৎসঃ বাংলাপিডিয়া ২০১৫)

Dhaka University Institutional Repository

২.২ গবেষণা পদ্ধতি

যে কোন গবেষণা কর্মে গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গবেষণায় গবেষণা পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণা কর্মটিকে বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যবহুল এবং সমৃদ্ধশালী করার জন্য নিবিড় মাঠকর্মের মাধ্যমে নৃবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন কলা-কৌশল প্রয়োগ করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি হল এমন একটা বিষয় যার মাধ্যমে গবেষণার নির্দিষ্ট তথ্য সমূহকে তুলে আনা হয়। যে কোন গবেষণা কর্মে তাত্ত্বিক উপলব্ধির সাথে পদ্ধতিমালা শুধু নিবিড়ভাবে সম্পর্কিতই নয় অভিযোজ্যও বটে। গবেষণা পদ্ধতি বলতে সুবিন্যস্ত ধারায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া বুঝায়। পর্যায়ক্রমিতা যেমন গবেষণা কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনয়ন করে তেমনি এটি শেষ পর্যন্ত একটি প্রতিবেদন তৈরির দিকে এগোয়। এই গবেষণা পরিচালনাকালে কোন একক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। গবেষণা করতে গিয়ে একক কোন পদ্ধতির সাহায্যে সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই গবেষণার প্রয়োজনে নৃবিজ্ঞানের প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতির একাধিক ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যয়নটিতে সংখ্যাবাচক (Quantitative) এবং গুণবাচক (Qualitative) গবেষনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সংখ্যাত্বক পদ্ধতি সীমিত অর্থে ও গুণবাচক ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ বিষয়বস্তুর নিরিখে এবং সমস্যার গভীরে পৌঁছানোর জন্য বর্তমান গবেষণায় গুণাত্বক পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে পূর্ণাঙ্গ (Holistic) ভাবে সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর কার্যক্রম সম্পর্ক এবং তুলনামূলক বিবরণ প্রদান করা হয়। যা নৃবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় গভীর মাঠকর্ম এবং অনুসন্ধান করে ফলপ্রসু হয়েছেন।

নৃবৈজ্ঞানিক এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা কলাকৌশল একটিকে বেছে নেয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন পদ্ধতির ‘সমন্বিত প্রয়োগ’-ঘটিয়ে গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় প্রকৃতি ও পরিধি বিবেচনা করে এই গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে শুমারী জরিপ ও নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি উভয়কে ব্যবহার করে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুত বর্তমান এই গবেষণার ফলাফল নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির সঙ্গে এথনোগ্রাফিক ফিল্ডওয়ার্ক এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং উদঘাটন করা হয়েছে। তাছাড়াও এ ক্ষেত্রে বহুমুখী পদ্ধতি যেমন কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Structured Interview) পদ্ধতির আওতাধিন খানা শুমারী (Household census) পদ্ধতি, নিবিড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview), প্রধান তথ্যদাতা (Key Informant), দলগত আলোচনা (Focus group discussions) এবং পর্যবেক্ষণ (Observation)

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদির সংমিশ্রণেই গবেষণার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতিগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

২.২.১ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এ গবেষণা পদ্ধতিটি নৃবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে অনন্যতা দান করেছে। গবেষণা পদ্ধতির ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডটিকে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা থেকে পৃথক করে তুলেছে। নৃবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ম্যালিনোস্কির সময়কালে প্রথম অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের প্রচলন দেখা যায়। যেখানে ব্যক্তিগতভাবে মাঠে উপস্থিত থেকে বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। গবেষিত বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এবং বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত ধারনা লাভের জন্য অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ পরিচালন করা হয় ও গবেষিত এলাকায় গিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন পর্যবেক্ষণ করা হয়।

নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে যদিও এ গবেষণায় দীর্ঘ মেয়াদী অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ নিয়মানুযায়ী করা সম্ভব হয়নি কিন্তু এখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সীমিত সময়ে গবেষিত সমাজে অংশগ্রহণ করে গবেষণার লক্ষ্যকে মাথায় রেখে গবেষিত এলাকার মানুষজনের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথা-বার্তা, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পেশা, সমাজ-সংস্কৃতি, পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক, প্রত্যাহিক ক্রিয়া কলাপের ধরন, নতুন পরিচয় সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, তাদের মতাদর্শ একই সাথে বাংলাদেশীদের সাথে সম্পর্কের ধরন প্রভৃতি দেখার চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও গবেষিত এলাকার সমাজ, অর্থনৈতিক কাঠামো, অবকাঠামো, এলাকার মানুষজনের প্রতিদিনকার সংগ্রাম, প্রতিনিয়ত দলাদলির সাথে টিকে থাকা, জীবন নির্বাহ কৌশল প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এভাবে গবেষণাটিতে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণকে একটি অন্যতম গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা পদ্ধতিটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ হল গবেষণার বিষয়, কেননা যে বিষয়ের উপর গবেষণা করা হয়েছে তাতে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার না করলে কখনোই স্থানীয় চর্চাগুলোকে ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিলনা। এছাড়া গবেষণকাজে মাঠকর্মের ক্ষেত্রে গবেষকের নিবিড় তথ্যের ভান্ডার কে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী এবং তথ্যবহুল করে তুলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার ও প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

সমাজ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি তথ্য সংগ্রহের এক মৌখিক কৌশল হিসেবে অবহিত। এ পদ্ধতিতে একটি সাক্ষাৎকারমালা বা প্রশ্নমালা ব্যবহার করে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে যে উদ্দেশ্যমূলক কথোপকথন হয় তাই সাক্ষাৎকার নামে পরিচিত। কোন গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য অনুসন্ধানকারী এবং তথ্য প্রদানকারীর মধ্যকার কথোপকথনই সাক্ষাৎকার। এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রাহক এবং উত্তরদাতার মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। Jazy and Jazy এর মতে, 'A method of collecting social data at the individual level'.(1991:327).

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকারী উত্তরদাতার আচার-আচারণ, কথাবার্তার ধরন, মতাদর্শ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। যার মধ্য দিয়ে অনেক অপ্রকাশিত তথ্যও বের হয়ে আসে। যা গবেষণাকে আরো সমৃদ্ধশালী করে। সাক্ষাৎকার সাধারণত তিন প্রকার হয়। যেমন- (ক) কাঠামোগত সাক্ষাৎকার, (খ) আধাকাঠামোগত সাক্ষাৎকার, (গ) অকাঠামোগত/ কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার।

বর্তমান গবেষণাকাজে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অকাঠামোগত/ কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।যেমন নিবিড় সাক্ষাৎকার ও প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে কোন কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা ছিলনা। একটা নির্দেশনা তথা গাইড লাইন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি চেক লিস্ট তৈরি করা ছিল যার ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয়েছে। এখানে উত্তরদাতা সম্পূর্ন স্বাধীন এবং মুক্তভাবে মতামত তুলে ধরার সুয়োগ পেয়েছে। বিভিন্ন কথা এবং গল্পের মধ্যে দিয়ে গবেষণা কাজের বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য সাধনের জন্য যাদের সাথে কথা বলা প্রয়োজন তাদের অনেকের সাথে স্বাভাবিক কথা বার্তার মধ্যে দিয়ে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টা ছিল। এজন্য হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে স্থানীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরী করে তাদের ব্যক্তিগত কথা শুনে আরো গভীরভাবে তদের অভিজ্ঞতা ও মতাদর্শ জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.২.৩ কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার/ খানা শুমারী

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার কৌশলের আওতাধীন খানা শুমারী পরিচালনা করা হয়েছে। খানা শুমারী পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এক একটি প্রশ্নকে চলক হিসাবে ধরে নিয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা কৌশলের

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এ জন্য চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা প্রতি সমাজ থেকে ৩০ জন করে মোট ৯০ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

২.২.৪ দলীয় আলোচনা

বর্তমান গবেষণা সম্পর্কে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি দলীয় আলোচনা পরিচালনা করা হয়- একটি চাকমা সমাজের নারী-পুরুষ উত্তয়কে নিয়ে। আরেকটি মারমা সমাজের নারী-পুরুষ উত্তয়কে নিয়ে এবং অন্যটি ত্রিপুরা সমাজের নারী-পুরুষ উত্তয়কে নিয়ে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে উত্তরদাতাদের সাথে কথা বলে তাদের কাছ হতে বর্তমান ও অতীত অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য দলীয় আলোচনা করা হয়। এ দলীয় আলোচনা করার সময় একটি নির্দেশিকা (গাইডলাইন) ও চেকলিস্ট অনুসরন করা হয়েছিল। উত্তরদাতাদের সাথে স্বাভাবিক কথা বার্তার মধ্যে দিয়ে প্রশ্নগুলো করা হয় ও উত্তর জানার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় উত্তরদাতা কোন প্রশ্নের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলে ভিন্নভাবে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হয়। দলীয় আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সময় ভিন্ন প্রসঙ্গ চলে আসলে আবার আলোচনা প্রসঙ্গে নিয়ে আসা হয়। এটি করতে দলীয় আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়।

সংগৃহীত তথ্যগুলো নোট করা হয় ডায়রিতে। কিন্তু এখানে কয়েকজন একই সাথে কথা বলার কারণে এবং ক্রমান্বয় আলাপচরিতা চলতে থাকার কারণে সব তথ্য লিখতে অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়েছিল। তাই দলীয় আলোচনার যাবতীয় কথোপকথন রেকর্ড করে নিতে হয়েছে। এছাড়া দলীয় আলোচনার পুরো অবস্থাটি গবেষককে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় হয়েছিল। পাশাপাশি দলিয় আলোচনা করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি সমস্যা ছিল যে, একটি দলের সাথে দলীয় আলোচনা সম্পাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য লোকজন এসে নিজ ইচ্ছায় যোগ দিতো। এক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হবে ভেবে বাঁধা দেওয়া হয়নি।

২.২.৫ কেইস স্টাডি

নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় কেইস স্টাডি হলো বর্ণনামূলক একটি কৌশল। এটি বর্তমান গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি। কেইস স্টাডি হল কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ ও সুগভীর তথ্য সংগ্রহ করা। কেইস স্টাডির একক হিসেবে একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার বা প্রতিষ্ঠান, সংঘ ইত্যাদিকে ব্যবহার করা যায়। এখানে গবেষণার সাথে প্রাসঙ্গিকতার সাপেক্ষে কেইস স্টাডিতে কতগুলো ধাপ রয়েছে- যেমন একক নির্বাচন, লক্ষ্য নির্বাচন তথ্য সংগ্রহের কৌশল, অন্যান্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ।

Dhaka University Institutional Repository

F.V. Youngএর মতে, কেইস স্টাডি হল একটি সামাজিক ইউনিটের জীবন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা। এ সামাজিক ইউনিট ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক দল এমনকি সমগ্র সম্প্রদায়ও হতে পারে (১৯৮৪:২৪৭)। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য কেইস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কারণ কেইস স্টাডিতে গবেষক ও তথ্যদাতা উভয়ের বিশ্লেষণ থাকতে পারে। কেইস স্টাডির মাধ্যমে তথ্যের অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ, পূন:মূল্যায়ণ করে গবেষণার বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষগুলোর ব্যক্তি পর্যায় হতে বিষয়গুলো বুঝতে সহায়তা করেছে। এ কারণেই কেইস স্টাডিগুলো গবেষণায় ভিন্নমাত্রা বহন করে। নিবিড় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই গবেষণাতে কেইস স্টাডি পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার বৈচিত্র্যময় তথ্যদাতাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি জানতে কেইস স্টাডি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

২.২.৬ মৌখিক ইতিহাস

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মতোই গবেষণায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি মৌখিক ইতিহাস। গবেষণার বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রাখতে গিয়েই মৌখিক ইতিহাসেকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হয়েছে। তাছাড়া অনেক তথ্যের ক্ষেত্রেই লিখিত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মৌখিক ইতিহাস অনেক কাজে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে সহায়তা করেছে। পুরো গবেষণায় মৌখিক ইতিহাসের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। মৌখিক ইতিহাস হল দলিল বা লিখিত উপাদানকে বিশেষ কাজে না লাগিয়ে কোন বিশেষ ঘটনায় একজন ব্যক্তির সম্পৃক্ততা বা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যে ইতিহাস নির্মিত হয় তা জানার চেষ্টা করা। এই মৌখিক ইতিহাসের মধ্য দিয়েই আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের পরিবর্তিত ধারা সম্পর্কে স্থানীয়দের মূল্যবোধ সম্পর্কে যেমন জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক কালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে। অনেক তথ্যদাতার মৌখিক ইতিহাস স্থানীয়দের অনুধাবনের জায়গা থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে সাহায্য করেছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষিত জনগোষ্ঠীর ভাবনা, তাদের বিভিন্ন চর্চা, তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য টিকে রাখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মত এই পদ্ধতি গবেষণার তথ্য সংগ্রহে মৌখিকভাবে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ এলাকা নির্বাচন ও নমুনায়ন

বর্তমান গবেষণার জন্য পাবর্ত্য তিন জেলা যথা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়িকে নির্বাচন করা হয়। উক্ত জেলার প্রধান নগরের পাশ্ববর্তী বা সন্নিকটে উল্লেখিত নৃগোষ্ঠীদের জনসংখ্যার প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করে গ্রাম নির্বাচন করা হয়। এতে পার্বত্য তিন জেলা থেকে মোট তিনটি গ্রাম নিয়ে আন্তঃসংস্কৃতি গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়। কারণ যে তিনটি নৃগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করা হয়, তারা জনসংখ্যার দিক থেকে মারমা-বান্দরবান, চাকমা-রাঙ্গামাটি এবং ত্রিপুরা খাগড়াছড়িতে প্রাধান্য রয়েছে। তিন জেলা থেকে তিনটি নৃগোষ্ঠীর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি তুলনামূলক আন্তঃসাংস্কৃতিক (Corss-cultural)গবেষণা পত্র তৈরি করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

তিন জেলা থেকে সমপরিমাণ সংখ্যক অর্থাৎ ৩০ জন করে মোট ৯০ জনকে নিয়ে গবেষণা নমুনা আয়তন। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠী থেকে ৩০ জনকে নিঃসম্ভাবনা নমুনার ধরণ হিসেবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দৈবচয়ন নমুনার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। যেমন আয়তন, প্রধান তথ্যদাতা, জীবন ইতিহাস এবং মৌখিক ইতিহাস সংখ্যাগুলো গবেষণা এলাকার আকার ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচিত নমুনা থেকে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক ইতিহাস সম্বলিত প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। নমুনা নির্বাচন যেন যথার্থ হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে “Standard Cross-Cultural Sample” এর মাধ্যমে নমুনা নির্ধারণ করা হয়েছে (Murdock and white: 1969)। Standard cross cultural sample হল এমন এক নমুনায়ন (sampling) পদ্ধতি যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু উপাদানের/চলকের ভিত্তিতে নমুনায়ন কাঠামো (sampling frame) তৈরি করা হয়। এই নমুনায়ন (sampling criteria) অনেকাংশে purposive sampling এর মতো। পার্থক্য হল cross cultural sampling এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ধরণ (criteria) ধরে নমুনায়ন (sampling) ঠিক করা হয়। বর্তমানে গবেষণার ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক ও পরিবার ব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ দিক বিবেচনায় নমুনায়ন কাঠামো (sampling frame) তৈরি করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ তথ্যের উৎস

বর্তমান গবেষণা কর্মে দুই ধরণের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে- ক) প্রাথমিক তথ্য, খ) মাধ্যমিক তথ্য।

২.৪.১ প্রাথমিক তথ্য

প্রাথমিক তথ্য উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উপরে আলোচ্য গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে নিচে উল্লেখিত গবেষণা কৌশলের সাহায্যে নৃবৈজ্ঞানিক উপায়ে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সরাসরি প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.২ মাধ্যমিক তথ্য

প্রাসঙ্গিকভাবে অতীতের ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources)থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন গবেষনাপত্র, জার্নাল, সাহিত্য ও পত্র পত্রিকা সাময়িকী ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫ তথ্য সংগ্রহের কৌশল

২.৫.১ প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট

সমাজ গবেষণার জন্য প্রশ্নমালার ব্যবহার একটি তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল। গবেষণা কাজের সুবিধার্থে প্রশ্নমালাটি মাঠে যাবার পূর্বেই তৈরী করা হয়েছিল। মাঠে যাবার পরে দু'একজনের সাথে কথা বলার পরে আরো কিছু গুরুপূর্ণ প্রশ্ন এতে যোগ করে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়। গবেষণা কাজে প্রধান তথ্যদাতা থেকে খানাজরিপ তথ্যদাতা সম্পর্কে আগে থেকে প্রয়োজনীয় মৌলিক কিছু তথ্য জেনে নেয়া হয়। যেমন- নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি। গবেষণা কাজে একটা প্রশ্নমালা কাঠামো তৈরি করা হয়। একটা প্রশ্নমালা কাঠামোতে তিন ধরণের প্রশ্ন থাকতে পারে। যথা- (ক) খোলা প্রশ্ন, (খ) আবদ্ধ প্রশ্ন, (গ) আনুসাঙ্গিক প্রশ্ন।

খানাজরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য আবদ্ধ বা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা কৌশল গ্রহন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এক একটি প্রশ্নকে একটি চলক ধরে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্ভাব্য উত্তরসমূহকে কোড বা সংকেত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে এসপিএসএস (SPSS) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রশ্নের উত্তরে লিপিবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করা উত্তর চিহ্নিত করা হয়েছে। লিপিবদ্ধ উত্তরের সাথে তথ্যদাতার উত্তর এক না হলে তা ‘অন্যন্য’ কোডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গবেষণা কাজে নিবিড় মাঠকর্ম সম্পাদনে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উত্তর উম্মুক্ত রাখা হয় হয়েছে। উত্তরদাতা তার নিজের মত করে উত্তর দিয়েছে। এখানে তথ্যদাতা স্বত:স্ফূর্ত ভাবে তার যোগ্যতানুযায়ী উত্তর প্রদান করেছে। উত্তরদাতাকে আবদ্ধ কোন প্রশ্নের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে তথ্যদাতারা ছিল স্বাধীন।

২.৫.২ ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার, ক্যামেরা, ডায়েরী ও নোটবুকের ব্যবহার

গবেষণায় রেকর্ডার, ক্যামেরা, ডায়েরী ও নোটবুক গবেষণা কৌশলের অন্যতম অংশ যা গবেষণায় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোন গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নোটবুক, ডায়েরী, ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার থাকা খুব জরুরী। তথ্য সংগ্রহের সময় গবেষক তার প্রয়োজনীয় তথ্য নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ম্যালিনোস্কির কাজে আমরা নোটবুকের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করি। মাঠকর্মে নোটবুক, টেপ-রেকর্ডার গবেষককে তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। মাঠ পর্যায়ের অনেক সময় সময়ে ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন জনের সাথে কথোপকথনের প্রায় সবটা ছোট্ট ডিজিটাল রেকর্ডারে রেকর্ড করতাম। এভাবে রেকর্ডারের ব্যবহার গবেষণা কাজকে সহজতর করেছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা পরবর্তীতে দেখতে হবে এ রকম কিছু সামনে আসলেই তা নোটবুকে টুকে রাখা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ডায়েরী ও নোটবুক কম ব্যবহার করা হয়েছে মূলত স্থানীয়দের স্বতঃস্ফূর্ততাকে ধরে রাখার জন্য ও গবেষিতদের সাবলীলতাকে রক্ষার জন্য। ডায়েরীতে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণগুলোকে যথাসম্ভব তুলে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষিত চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ঘর-বাড়ি, আচার, রীতিনীতি, সমাজ, পরিবার ও অর্থব্যবস্থা তুলে আনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৬ মাঠকর্মের অভিজ্ঞতা

গবেষণা এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথেই এলাকা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। উত্তরদাতাদের অনেকের সাথে কথা হয়। অনেকে আবার প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে এসেছেন? আর তাদেরকে সেখানে যাওয়ার কারণ এবং আগ্রহের কথা জানানো হয়। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা গ্রাম সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা সেখান থেকেই পাওয়া যায়। পরবর্তী দিন মাঠকর্মে একজন স্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাকেও

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক সম্পর্কে প্রশ্ন করতে দেখা যায়। স্থানীয় ব্যক্তিটি তাদেরকে গবেষণার গবেষণা সম্পর্কে অবহিত করে স্থানীয় ভাষায়। এখানে দেখা যায় যখন গবেষক তথ্যদাতাদের সাথে কথা বলেন তারাও তাকে নানা প্রশ্ন করেছে। যেমন-আপনার সাথে কথা বলে বা তথ্য দিয়ে আমার কি লাভ? আবার অনেকে এরকমও বলে যদি আপনার উপকার হয় তাহলে তো ভালোই হয়। আবার অনেকে গবেষককে কোন এনজিওর সদস্য ভাবে। তারা মনে করে গবেষক তাদের কোন সহায়তা দেয়ার জন্য বা উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য এসেছেন। যাই হোক মোটামুটি সকলেই খুবই আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে। অনেকেই তাদের এলাকায় মেহমান হিসেবে গবেষককে আতিথেয়তা করে চা, নাস্তা খাওয়ায়। তাদের আতিথেয়তা ছিল অভাবনীয় কেননা, অল্প সময়ে তারা খুবই আপন করে নিয়েছিল। গবেষক যেহেতু বাঙ্গালী তাই তাকে জিজ্ঞেস করে তাদের খাবার খেতে কোন সমস্যা আছে কিনা? যখন গবেষক না সূচক জবাব দেই তখন তারা পাহাড়ি কলা, পেঁপে, নারিকেল ইত্যাদি শুকনা খাবার খেতে দেয়।

২.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি গবেষণারই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। বর্তমান গবেষণাটিও সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে নয়। এই অংশে গবেষণাটির প্রধান প্রধান কিছু সীমাবদ্ধতা তুলে ধরছি। প্রথমত, এ গবেষণা করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল ভাষা। আমি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষা না জানার কারণে অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়েছে। এমন অনেক বয়স্ক লোক ও মহিলা আছেন যারা ভালো বাংলা বোঝেন না। আবার আমিও তাদের ভাষা বুঝিনা। ফলে দেখা গেছে যোগাযোগ সংক্রান্ত জটিলতা দেখা গিয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে স্থানীয় লোকদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি এই বিষয়ে বিশদ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার অভাব রয়েছে। সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে অনেক সময়ে বর্তমান গবেষণা কর্মটি দীর্ঘায়িত হয়েছে। তবে তত্ত্বাবধায়কের একান্ত আন্তরিকতায় এ সমস্যা মোকাবেলা করা সহজতর হয়েছে। ফলে আমি বিশ্বাস করি বর্তমান গবেষণাটি আলোচ্য বিষয়ে নৃবৈজ্ঞানিক তথ্যের ঘাটতি মেটাতে ভূমিকা রাখবে। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড় ধ্বস প্রদান সমস্যাগুলোর একটি। অধিক বৃষ্টিপাত থেকে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য পাহাড় ধ্বস মাঠকর্মে ব্যঘাত ঘটিয়েছে। অন্যদিকে পাহাড়ি অঞ্চলের তীব্র তাপদাহ মাঠকর্মকে কষ্টধায়ক করে তুলেছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে । এসপিএসএস (SPSS) সফ্টওয়্যারে বাংলা তথ্য প্রদান ও ফলাফল পাওয়া সম্ভব ছিলনা। ফলে বাংলা তথ্যসমূহকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে সফ্টওয়ারে প্রবেশ করা হয়েছে এবং ফলাফল (Output) নেয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া একদিকে যেমন ছিল কষ্টসাধ্য অন্যদিকে ছিল সময় সাপেক্ষ বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
সাহিত্য পর্যালোচনা, তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়গত কাঠামো

৩.১ সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা গবেষককে চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে অবস্থান করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয় গবেষণার তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়গত ধারণা এবং গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত নানাদিককে স্পষ্ট করতে সাহিত্য পর্যালোচনা বিশেষ ভূমিকা রাখে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক লেখালেখির সংখ্যা একেবারে কম নয়। এতএব, এ অধ্যায়ে গবেষনা বিষয়বস্তুর পরিধি এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নানাবিধ গৌণ উপাত্তসমুহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Kinship in Bangladesh (1979)
K.M. Ashraful Aziz

আশরাফুল আজিজ চাঁদপুর জেলার কয়েকটি গ্রামে ১৯৬৪-৭৪ সময়কালে তাঁর এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেন। তিনি এই গবেষণায় মূলত বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতি সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রকৃতি, ধরন, জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী, হিন্দু-মুসলমানভেদে এর পার্থক্য, পরিবার কাঠামো (একক বা যৌথ), গৃহস্থালীর আকার ও ধরন, গ্রামীণ সমাজ কাঠামো, গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন ও ক্ষমতা কাঠামোর উপর জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রভাব এই গবেষণায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জ্ঞাতি সম্পর্কের বিভিন্ন (রক্তীয়, বৈবাহিক, পাতানো কিংবা দূর সম্পর্কের আত্মীয়) মাত্রার ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়। পরিবার কাঠামো ও জ্ঞাতি সম্পর্কের উপর বিস্তারিত আলোচনা থাকায় এই গবেষণাকর্মটি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পরিবার কাঠামো ও জ্ঞাতি সম্পর্কের অধ্যয়নে গুরত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে।

Ideas and Trends in Rural Society of Bangladesh (1983)
Profulla Chandra Sarkar

প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার ১৯৭৫-৭৭ সালে রাজশাহী জেলার কয়েকটি গ্রামে তার এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের জটিল সামাজিক প্রথা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট নানা বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ এই গবেষণাকর্মে ফুটে উঠেছে। এ সকল বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব, হিন্দু ও মুসলমান ভেদে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আবার বিয়ে ও জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরন, গোষ্ঠী সম্পর্ক, কৃষি কাঠামো ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট নানাশ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক, যৌথ খামার ব্যবস্থা, বর্গাদার ও ভূমি মালিকানার সম্পর্কনিয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। এর পাশাপাশি নানা

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পার্থক্য, জ্ঞাতি সম্পর্কের মাত্রা, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা, কাল্পনিক জ্ঞাতি সম্পর্কের রীতি ও নীতিমালার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা এই গবেষণার প্রতিপাদ্য ছিল।

আদিম সমাজ (১৮৭৭)
এল এইচ মরগান

প্রকৃতপক্ষে, মানব প্রজাতির বিকাশের প্রকৃতি ও বিকাশের ইতিহাস যথার্থরূপে যে মানুষটির হাতে রচিত হয়েছে তিনি হচ্ছেন লুইস হেনরি মর্গান। বাখোফেনের রহস্যবাদী, ম্যাকলেনানের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক ব্যাখ্যা ও মানব প্রজাতির বিকাশের ক্ষেত্রে বিকাশের ইতিহাস, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার প্রচলন, বংশ নির্ধারনের ক্ষেত্রে পুরুষের ধারা, জাতি, গোত্র, ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠী, আদিম মানুষের উৎপাদন ও উৎপাদন পরিপূরক তার সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলোকে মর্গানই প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান।

মর্গানপূর্ব সময়ে মানবজাতির সুদূর অতীত সম্পর্কে যে সকল ধারণা চালু ছিল তা দারুনভাবে পাল্টে দিয়েছেন এই মানুষটি। আজ মানুষের মেনে নিতে কোন বাধা থাকে না- সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বর্বর যুগের আগে এসেছে বন্যযুগ এবং সভ্যযুগের আগে এসেছে বর্বর যুগ। সমগ্র জাতির ইতিহাসের উৎস এক, অভিজ্ঞতা ও প্রগতির পথও এক। মানব প্রগতির পথে পর্যায়ক্রমে ঘটে একের পর এক উদ্ভাবন ও আবিস্কার। ফলমূল আহরণ থেকে মানুষের আগুন আবিস্কার, মৎস শিকার থেকে মৃৎশিল্পের ব্যবহার এইসব উদ্ভাবন-আবিস্কারই সূচিত করেছে ধারাবাহিক স্তরগুলোকে। অন্যদিকে প্রয়োজনকে সামনে রেখে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোর ক্রমে বৃদ্ধি ঘটেছে কয়েকটি প্রাথমিক চিন্তার ভ্রূণ থেকে। এই গুলোর সাহায্যে প্রগতির স্তরকে সহজে চিনে নেয়া যায়। অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্তবাহী প্রধান প্রধান সামাজিক বিষয়গুলোকে এইসব প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবন, আবিস্কারগুলোই সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত করেছে, টিকিয়ে রেখেছে। এগুলোকে একত্রিত করে তুলনা করা হলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমগ্র মানব প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে একই প্রক্রিয়ায়; অগ্রগতির একই স্তরে মানুষের চাহিদা সর্বত্রই এক।

মর্গানের সময় ইউরোপের দর্শন কাঠামোতে তত্ত্বগতভাবে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম তত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ভাববাদী ধারাপুষ্ট লৌকিক যুক্তিবাদী মননশীলতা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল তখনকার ইউরোপের সার্বিক দর্শন চেতনা। কিন্তু জৈব বিবর্তন তত্ত্ব আবিস্কারের ফলে সে সময়টিতে সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণার সাথে জৈব বিবর্তনের তাত্ত্বিক বিরোধ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিস্কার মানুষকে তার চিন্তার জগতে পূর্বের ভাববাদী ধারা ছুঁড়ে ফেলে অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞান জগতের পক্ষে ক্রিয়াশীল করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে হাজার বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা যে মানুষ সভ্যতা সৃষ্টি করেছে সেই মানুষ ক্রমেই বুঝতে পারে ভাব নয় বস্তুই জ্ঞানের তথা চিন্তার উৎস। কল্প নয়, অভিজ্ঞতাই জ্ঞান। ফলে ভাববাদী ধারার পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠলো মানুষের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা বস্তুবাদ। আর এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েই সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে মর্গান আবিস্কার করলেন মানব সমাজের প্রাথমিক এককগুলোকে, তাঁর পর্যবেক্ষণে প্রয়োগ করলেন বস্তুবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক তত্ত্ববিধি। দেখালেন আদিম সমাজ ছিল বস্তুতান্ত্রিক। এই বস্তুতান্ত্রিক উপাদানের সমাহারই হচ্ছে মানুষের প্রগতির স্তর, উদ্ভাবন, আবিস্কার, উৎপাদন, পুনরুৎপাদন। জীববিদ্যায় ডারউইনের জৈব বিবর্তনবাদ তত্ত্ব, আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কসের উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্ব ও মানবসমাজের ইতিহাসে মর্গানের আবিস্কারগুলো মানুষের চিন্তার জগতকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়। ফলে গোটা পৃথিবীতে মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ঘটে যায় অভূতপূর্ব বিপ্লব। পুরো ইউরোপ তথা পুরো বিশ্বের চিন্তার জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে প্রগতিশীল ধারা। প্রতিক্রিয়াশীলরা জীবনের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বেছে নেয় সৃষ্টিতত্ত্বকে, উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্বের ক্ষেত্রে দাঁড়ায় শ্রমের বিপরীতে, পাশাপাশি মানবসমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আশ্রয় নেয় কল্পবাদী যুক্তিবাদে। আর এভাবেই প্রগতিশীল অভিজ্ঞতামূলক বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের ধারাকে সম্পূর্ণরূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তারা প্রগতিশীল ভাবধারার বিপক্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল আচরণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। যার ফলস্বরূপ চার্লস ডারউইনের "দ্য অরিজিন অব স্পিসিস" প্রকাশিত হওয়ার সাত মাস পরে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশন সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীলরা জৈব বিবর্তনের বিপক্ষে বিতর্কের ঝড় তোলে, যা অক্সফোর্ড বিতর্ক নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে মার্কসের পুঁজি প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান অর্থনীতিবিদরা পুঁজি গ্রন্থ থেকে আগ্রহে বিভিন্ন বিষয়াদি চুরি করে তা বেমালুম চেপে যায় এবং বৃটিশ প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানের প্রবর্তকেরা মর্গানের বিভিন্ন রচনা থেকে তাঁর আবিস্কারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে মর্গানকে অস্বীকার করে বসে। মর্গানের পূর্ববর্তী রচনাগুলোকে অত্যন্ত বৌদ্ধিকভাবে, মুরুব্বিয়ানা চালে প্রশংসা করলেও মর্গানের পুস্তক সম্পর্কে সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। অথচ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কার, আবিস্কারে নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, ভূগোলবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের অবিনব শাখার উন্নতি ও উদ্ভবের মধ্য দিয়ে মানব প্রজাতির ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিরূপে বিশ্লেষণ করে চলেছে। কিন্তুকোথাও কোনও নতুন সংগৃহীত তথ্য তাঁর গবেষণার মূলতত্ত্ব ও স্বীকার্যকে হটিয়ে দেয়নি, দিতে পারেনি। আদিম সমাজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে ধরনের বিকাশমান ধারার প্রবর্তন করেন, তার মূলকথার আজও কোথাও কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৭ সালে প্রকাশিত তার আদিম সমাজগ্রন্থে মর্গান বিশ্লেষণ করে দেখান যে, মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এক একটি স্তর অতিক্রম করেই সংঘবদ্ধতার মধ্যদিয়েই বিকশিত হয়েছে। এই স্তরের একেবারে প্রাথমিক স্তর যেটি সেই বন্যাবস্থায় (বন্যযুগে) তার উৎপাদন, উৎপাদন পরিপূরক তার পুনরুৎপাদন ছিল নির্বিচার যৌনাচার, এই নির্বিচার যৌনাচারের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধভাবে বিকশিত হয়ে পরিবারের আদিরূপ-একরক্ত সম্পর্কের পরিবার হয়ে উঠে। আর এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠে বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক ধারা। বন্যযুগের শেষ পর্যায়ে এবং পুরো বর্বর যুগে পরিবারের বিকশিত ধারায় মনুষ্যজাতি সার্বিকভাবে সংগঠিত ছিল গোত্র, ভ্রাতৃ্বত ও গোষ্ঠীতে,প্রাগৈতিহাসিক যুগে সবগুলো অঞ্চলে (মহাদেশে) বিকাশের স্তর এক হওয়ায় এদের মধ্যকার সামাজিক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল প্রায় একই রকম। আর এগুলোই প্রাচীন সমাজকে সংগঠিত ও একত্রিত করে রেখেছিল। এই সকল সাংগঠনিক কাঠামো, এদের মধ্যকার সম্পর্ক, গোত্র, ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, দায়-দায়িত্ব এই সব থেকেই মানুষের চিন্তায় শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভব ঘটে। অন্যদিকে রক্ত সম্পর্কের পরিবারের স্তর থেকে শুরু করে নানা মধ্যবর্তী রূপের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয় একপতিপত্নী পরিবার, এরই মধ্যে আমরা খুঁজে পাই মানুষের অভিজ্ঞতা, হাল হাতিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনের উপকরণ, তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবন আবিস্কার ইত্যাদি, স্থায়ীভাবে (কৃষি বা পশুপালন) উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়। ফলে পূর্ব যুগে যা ছিল না পরবর্তী যুগে তাই হলো উৎপাদনের উদ্দেশ্য। সাথে যোগ হয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদত্ত সম্পদের ধারণা। মর্গান এই বিষয়গুলো আবিস্কার করলেন বিভিন্ন উপজাতিগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ইয়াকোয়াস, সেনেকা কায়ুগা উপজাতিগুলোর মধ্যে দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণের ফলে। অপরদিকে গ্রীক, রোমান, অ্যাজটেক সভ্যতার উপর বিশ্লেষণ করে দেখেন এই সভ্যতাগুলোতে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার মূলে যে বিষয়গুলো ছিল তা হলো-

ক) গোত্র, ভ্রাতৃত্ব, গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও তাদের পারিবারিক দায়-দায়িত্ব।

খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার হতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উত্থান।

গ) সম্পদজাত ধারণা থেকে একপতিপত্নী পরিবার।

ঘ) সম্পদের উপর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির ধারণা।

ঙ) স্থায়ীভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা।

চ) বিভিন্ন উৎপাদন ও হাতিয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

এগুলোই মানুষের প্রাথমিক সামাজিক সংগঠনগুলো ভেঙ্গে তার স্থলে রাষ্ট্র সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ সমাজের। ব্যাক্তিজীবনে মর্গান আইনজ্ঞ হলেও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার রচনায় তিনি কাঠামোগত যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি। বরং তিনি বিকাশের স্তরে যে উপজাতিগুলো এখনো প্রাগৈতিহাসিক (সুদূর অতীতের) চিহ্ন বহন করে চলেছে সেগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তাঁর এই *আদিম সমাজ* গ্রন্থে তাই লিপিবদ্ধ করেছেন। মানব সমাজের অগ্রগতির ধারা সম্বন্ধীয় মর্গানের আবিস্কার মানুষের অতীত ইতিহাসগুলোকে জানার ক্ষেত্রে, এক নির্দিষ্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতি গড়ে তোলার কাজে তার অবদানগুলো সঙ্গত কারণে আজকের পৃথিবীতে বহুবার আলোচিত হয়েছে। তবে তার রচনার সবচেয়ে গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ এবং মূল্যবান যে বিষয়টি, সেটি হচ্ছে মানব সমাজের ভিত্তির স্তরগুলোকে চিহ্নিত করে দেয়া। এমনকি অগ্রগতির পথে প্রতিটি সমাজব্যবস্থায় (আদিম সমাজ, দাস ব্যবস্থা, ভূমিদাস ব্যবস্থা, আধুনিক ধনতান্ত্রিক-গনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা) তার গবেষণা এই সকল সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের স্তরকে চিহ্নিত করে দেয়। বর্তমানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যে রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে তা আদিম ব্যবস্থায় প্রাথমিক রূপ থেকে ঐতিহাসিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত। ফলে সুদূর অতীতের সাথে বর্তমানের যে যোগসূত্র তা থেকেই গড়ে ওঠে মানুষের ভবিষ্যতের পথচলার বুনিয়াদ, এক কথায়, মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সার্বিক ঐতিহাসিক বন্ধন।

পরিশেষে মর্গানের জীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অত্যন্ত সঙ্গত বলে মনে হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পরপর যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে ৪টি ইরাকোয়াস গোত্র, যারা যুদ্ধের সময় বৃটিশদের পক্ষাবলম্বন করেছিল তাদেরকে জোর করে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করে কানাডায় পাড়ি জমাতে বাধ্য করে। অপরদিকে কিছু নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে নিউইয়র্কের কিছু এলাকা সংরক্ষিত করা হয় মিত্রপক্ষের আদিবাসী গোষ্ঠী অনানডাগা (Onandaga) এবং সেনেকার জন্য। কিন্তু যুদ্ধের বহু বছর পর ১৮৪০ সালের দিকে অগডেনল্যান্ড কোম্পানী (OLC) নামের একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানী, যারা পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে জালিয়াতির মাধ্যমে আদিবাসীদের ভূমি দখল করে আসছিল, তারা সেনেকাদের টোনাওয়ান্ডা রিজার্ভেশনের ভূমি আত্মসাৎ এর পাঁয়তারা করে। ফলশ্রুতিতে কংগ্রেসের নির্দেশে একর প্রতি মাত্র ১.৬৭ ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদান বাবদ সেনেকারা তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়। তারা এ নির্দেশের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে গেলে বিষয়টি মর্গানের দৃষ্টিগোচর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সময়ে তিনি এলবেনির রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালাতে সংরক্ষিত পুরোনো কায়ুগা চুক্তিসমূহের উপর গবেষণা করছিলেন। তিনি সেনেকাদের পক্ষাবলম্বন করে বিষয়টি জনসম্মুখে নিয়ে আসেন। তিনি এই অন্যায়ের বিপক্ষে বিভিন্ন জনসমাবেশের মাধ্যমে জনমত তৈরী করেন এবং ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের সদস্যদের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। ১৮৪৬ সালে একটি সাধারণ সভা আহবানের মাধ্যমে এ সম্পর্কে কংগ্রেসে আলোচনা করতে মর্গানকে পাঠানো হয়। অবশেষে সেই OLC কে প্রাধাণ্য দিয়ে করা পূর্বোক্ত চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায় এবং সেনেকারা পুনরায় তাদের হৃত জমি একর প্রতি ২০ ডলার মূল্যে ক্রয়ের অনুমোদন পায় এবং নতুন করে আবার টোনাওয়ান্ডা রিজার্ভেশনের জন্ম হয়। মর্গান কংগ্রেস থেকে ফিরে এলে ১৮৪৭ সালের ৩১শে অক্টোবর সেনেকা গোত্রের কচ্ছপ গোষ্ঠীয় বাজপাখি বংশের জিমি জনসনের পুত্ররুপে তাকে সেনেকা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তার নতুন নামকরণ হয় টায়াডাউয়ুকুহ যার অর্থ সেতু বন্ধনকারী। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই একজন সেতু বন্ধরকারী ছিলেন।

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি বই-এর লেখক, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, মার্ক্স অনুসারী এবং এই বইতে তিনি মরগান, মমসেন, ম্যাক-লেলান, স্কট ইত্যাদি লেখকের করে যাওয়া কাজ ও মার্ক্স এর কিছু লেখার থেকে সাহায্য নিয়েছেন, তবে যেখানে প্রথমোক্ত লেখকদের সাথে মার্ক্সের বক্তব্য মেলেনি, সেখানে তিনি মার্ক্সকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বইটি মোট ১১টি অধ্যায়ে লেখা। এতে মূল বক্তব্য ছিল, আদিম যুগ থেকে সভ্যতায় পদার্পণের ফলে মানব সমাজ ও জীবন যাপন ধারায় কাঠামোগত পরিবর্তনের উপর জ্ঞান ও শিল্পের প্রসার, পুঁজির আবিষ্কার, পুঁজির বিকাশের প্রভাব নিরূপণ। এখানে আদিম মানব সমাজের নমুনা হিসাবে মার্কিন লাল চামড়ার ইরকোয়াসদের উল্লেখ করা হয়েছে। বর্বর যুগের উদাহরণ হিসাবে গ্রীক, কেলটিক ও জার্মানদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সভ্য হিসাবে এথেনীয় ও রোমানদের দেখানো হয়েছে। এছাড়াও ইউরোপ ও এশিয়াতে বসবাসকারী আর্য্য ও সেমেটিক জাতির সম্পর্কে সামান্য বর্ণনা দিয়েছেন। মরগানের মতে মানব সমাজের তিনটি স্তর আছেঃ বন্য, বর্বর ও সভ্য। লেখক তা মেনে নিয়ে উপরোল্লেখিত জাতিদের মধ্য এই তিন স্তরের সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন যাপনের তরিকা এবং এর পারস্পরিক তুলনা করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে, বন্য পর্যায়ে মানুষের পরিবার কেন্দ্রিক সরল জীবনে ছিল নারী- পুরুষের মধ্য সমতা, সম্পদ বণ্টনের মধ্যে ছিল মানবিকতা ও একরকমের গণতান্ত্রিক চর্চা। কিন্তু বর্বর যুগে এসে পুরনো পরিবার প্রথার পরিবর্তন; বহু নারী ও বহু পুরুষের মাঝে বিবাহ বা

Dhaka University Institutional Repository

জোড়বাঁধা পরিবার; এবং নতুন পরিবার প্রথার প্রচলন; এক পতি-পত্নীকেন্দ্রিক পরিবার; হালকা কাঠ ও পাথরের অস্ত্রের পরিবর্তে ধাতুর ধারলো অস্ত্রের আবিষ্কার, কৃষি কাজ ও পশু পালন, প্রাচীন জীবন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে। যার প্রথম শিকার হয় সমাজের নারীরা। নারীরা সম্পদের উপর থেকে অধিকার হারায় ও ক্রমেই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে স্বামীর পূর্ণ অধিকার ও আওতাধীন হয়ে পড়ে। সভ্য সমাজে এসে মানবজাতি অর্থ আবিষ্কার করে, ধাতব মুদ্রা, বানিজ্যের প্রসার, শিল্পের বিকাশ শ্রমবিভাজনের সৃষ্টি করে, দাস প্রথার ব্যাপক প্রসার এক অমানবিক জীবনের চিত্রই অংকন করে এখানে। সভ্য সমাজে শ্রেনীর উদ্ভব ঘটে; অভিজাত শ্রেনীর শোষণ ও শাসনের শিকার হয় কৃষক ও দাস।

লেখক এখানে সভ্যতার দুটি বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছেনঃ

ক) সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, যা মুলত শোষকের রাষ্ট্র, উৎপাদনের মূল দাস-শ্রম, মধ্যস্ততাকারী বা বণিকের আবির্ভাব, অর্থনৈতিক একক হিসাবে এক পতি-পত্নী পরিবার, নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং যাবতীয় দাবীর বিপরীতে অভিজাতদের রক্ষা ও নিপীড়িতদের দমনে রাষ্ট্রকে ব্যবহার;

খ) শহর ও গ্রামের পার্থক্য, শ্রম বিভাজন ও উইলের মাধ্যমে কাউকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা বা কাউকে সম্পদের অধিকার দেয়ার ক্ষমতা। লেখক এ থেকে দুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেনঃ

- সভ্যতায় পদার্পণ এবং অগ্রসর হবার মূল চালিকা শক্তি মানব জাতির নগ্ন লালসা, সম্পদের লোভ, ক্ষমতার লোভ ও বিলাসের লোভ; এবং
- যেহেতু উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পারিবারিক সম্পর্কের মুলে রয়েছে শোষণ তাই এই সভ্যতা দ্বান্দিক ও প্রতি নতুন পদক্ষেপে দ্বন্দে জড়িত পক্ষসমূহের থেকে প্রতিরোধ আসে।

তিনি সমাপ্তি টানতে মরগানের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলেছেন; মানব সমাজ, সরকার ব্যবস্থা, রাষ্ট্র জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে, সাম্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে, প্রাচীন সমাজের মাঝে বিদ্যমান স্বাধীনতা, ভাতৃত্ব, মনুষ্যত্ব আবার আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান সম্পর্কগুলোকে পবিত্র করে তুলবে। এবং তা হবে ন্যায় সংগত, প্রাচীন জীবনধারার উচ্চতর পর্যায়ে প্রকাশিত প্রতিরূপ।

A Bangladesh Village: Conflict and Cohesion (1974)

A.K.M. Aminul Islam

এ.কে.এম. আমিনুল ইসলাম ১৯৫৪-৬৬ সালের মধ্যে ঢাকা জেলার বদরপুর গ্রামে তাঁর এই গবেষনাকর্মটি সম্পাদন করেন। তিনি মূলত গবেষণায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করেন। ইসলাম তার এই গবেষণায় স্বাধীনতা পরবর্তী একটি গ্রামের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যার মাধ্যমে আমরা তৎকালীন জাতীয় বা বৃহৎ রাজনীতির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। বিশেষ করে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সাথে জ্ঞাতি সম্পর্ক, পরিবার ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। গ্রামের জোতদার, জমিদার ও ধার্মিক বা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এই তিন শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান ফুটে উঠেছে এই গবেষণাকর্মে। আমিনুল ইসলাম গ্রামের কোন্দল ও দলাদলি আলোচনা করতে গিয়ে নতুন ও পুরাতন নেতৃত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। বদরপুরের গ্রাম সংগঠনগুলো অসম ও জটিল, যা বৃহত্তর সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। গ্রামের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের সাধারণত জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা দেখা যায়। প্রথাগত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তেমন কোন ভূমিকা পালন করে না। কেননা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে মূলত এই ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ পরিবর্তিত হয়েছে।

Social Change among the Garo: A Study of a Plain Village in Bangladesh (1979)

Kibriaul Khaleque

খালেক ময়মনসিংহ জেলার গারো অধ্যুষিত একটি গ্রামে তাঁর এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেন। তিনি মূলত গারোদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তার চিত্র এ গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ সকল নিয়ামকের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় এর প্রভাব, যেমনঃ নতুন ধারার চাষাবাদ পদ্ধতি, খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব, আধুনিক শিক্ষা, জনসংখ্যা ও প্রতিবেশীর প্রভাব এবং গারোদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ওপর জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ও পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এর পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজ ধীরে ধীরে যে পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কেও খালেক আলোকপাত করেছেন এই গবেষণায়।

What Kinship Is-And Is Not (2013)

Marshall Sahlins

জ্ঞাতিত্ব পাঠের গুরত্ব উপলব্ধি করত মার্শাল শাহলিন উপরোক্ত প্রবন্ধ রচনা করেন যা দুই ভাগে বিভক্ত। বলা যায় জ্ঞাতিত্ব অধ্যয়নের নৃবৈজ্ঞানিক বিতর্কে তিনি নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেন। জ্ঞাতিসম্পর্ক কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠে-এর নতুন আলোচনা-পর্যালোচনা দেখা যায় এই প্রবন্ধে। প্রথম অংশে এরিস্টটল থেকে শুরু করে এমিল ডুর্খেইম ও স্নাইডার পর্যন্ত তাত্ত্বিকদের চিন্তা-ভাবনা পর্যালোচনা করার পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডের মাউরি থেকে আরম্ভ করে নিউ গিনির করোয়ায় উপজাতির উদাহরণ দিয়ে তিনি এমন এক সর্বজন গৃহীত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন যাতে জ্ঞাতি সম্পর্ক বলতে বুঝিয়েছেন- ‘‘mutuality of being”. জ্ঞাতিজন হল এমন সব ব্যক্তি যারা একে অপরের অংশ এবং তারা এমন এক সম্পর্কের জালে বসবাস করে যেটা একটি দেহের মত কাজ করে যেখানে একজনের কিছু হলে অন্যরা অনুভব করে। দ্বিতীয় অংশে শাহলিন বলেন যে ‘‘mutuality of being” হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতিক যা রক্তের দ্বারা তৈরি হওয়া শুধুমাত্র কোন জৈবিক সম্পর্ক নয়। একই নামের ভিত্তিতে অথবা একই খাদ্য ভাগাভাগি করে খাওয়ার মাধ্যমে জন্মগত সম্পর্ক ছাড়াও মানুষ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তিনি যুক্তি প্রদান করেন- কোন সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্ক জন্মের (জৈবিক) ধারায় নির্ধারিত হওয়ার পিছনে কারণ হল পূর্বপুরুষরা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রজনন কার্যে যুক্ত ছিল। এর ফলে জ্ঞাতি সম্পর্ক জন্মের (জৈবিক) উপর নির্ভর করেনা বরং জন্মের (জৈবিক) ধারণাটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে জ্ঞাতি সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে শাহলিন এর অন্যতম দাবী হল- জ্ঞাতি সম্পর্ক প্রাকৃতিক নয় বরং সাংস্কৃতিক বিষয়।

Descriptive Ethnology of Bengal (1872)

Edward Tuite Dalton

প্রখ্যাত নৃবৈজ্ঞানী ডাল্টনের গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে জানার জন্য একটি ধ্রুপদী গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর পরিচিতিমূলক বিবরণ তুলে ধরেছেন। উল্লেখিত হয়েছে এদের ভৌগলিক অবস্থান, গৃহের ধরণ, জীবন-যাপনের রীতি পদ্ধতি, এদের উপকথা, শারিরীক গঠন, উৎসব, নাচ-গান, দেব-দেবী, খাদ্য ও তাদের ক্রান্তিকালের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এতে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর বর্ণনা রয়েছে। রউফ (২০০৪) তাঁর বাংলাদেশে আদিবাসী বইতে বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষগুলোকে উপজাতি না বলে আদিবাসী বলতে আগ্রহী। যারা নিজেদের সামাজিক সাংস্কৃতিক যে বর্ণনা তৈরি করেন তা আদিবাসীদেরকে সম্পূর্ণ উপস্থাপন করে না। কারণ আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সংকট যেখানে অনুপস্থিত। তার বদলে আদিবাসীরা তার গবেষণায় হয়ে উঠেছে সরলপ্রাণ, প্রথাবাদী, পশ্চাৎপদ জনগণ হিসেবে। যা আদিবাসী গোষ্ঠীর স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে।

সাংস্কৃতিক সংঘাত ও পাহাড়ী বাঙালি সম্পর্ক (১৯৯৯)

আমেনা মোহসীন

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের সমস্যা ও তার প্রেক্ষিতে পার্বত্য অঞ্চলের দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেন আমেনা মোহসীন । বাঙালি ও পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সংঘাত তা হলো জাতীয়তাবাদের রাজনীতি। যে কোন জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক ধরনের আধিপত্যবাদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি বাঙালি বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেও সত্য। ফলে বাংলাদেশে সংবিধানে স্বীকার করে নেয়া হয়নি যে বাংলাদেশে অন্য জনগোষ্ঠী আছে। তবে সংবিধানে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। মোহসীন উল্লেখ করেন যে, যদি সমান সুযোগ সুবিধা থাকে তা হলে অন্যদেরকে বাঙালি হতে হবে কেন? চাকমার চাকমা, মারমার মারমা বা ত্রিপুরারা ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তাদের পরিচিত থাকবে। তবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক ধরনের সুপ্ত আধিপত্য আছে।

ভেলাম ভান সেন্দেল (১৯৯৮) তার জম্মুদের আবিস্করণ; দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশের, রাষ্ট্র সংগঠন ও জাতি গোষ্ঠীর রূপায়নের আলেখ্য লেখাটিতে দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশের পাবর্ত্য অঞ্চলের সামাজিক সাংস্কৃতিক গতিধারার সম্যক বিচার তুলে ধরেন। তিনি ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে দুশো বছরের ভ্রমণকারীদের বিবরণ, উপনিবেশিক শাসকদের বিবরণ, নৃবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক, রাজনৈতিক দলের পুস্তক মানবাধিকারের পক্ষে দলগুলির বক্তব্য এবং পত্র পত্রিকার বিবরণ সংগ্রহ থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। ট্রাইব শব্দটিকে ঘিরে নৃবিজ্ঞানীদের যেমন বিতর্ক রয়েছে তেমনি অন্যান্য জ্ঞানের শাখায়ও আছে। এছাড়া ধরে নেওয়া হয় যে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের মানুষজন একই ধরনের অর্থাৎ এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন পার্থক্য নেই। তবে ১৮৬০ সালের পর থেকে বাঙালি সাংস্কৃতিক কাঠামো বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে অন্যদের কাঠামো যুক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতি বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটি প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798): His Journey to Chittagong, the Chittagong Hill tracts, Noakhali and Comilla

Willem van Schendel

এই নিবন্ধে লেখক বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসকে অস্থিতিশীল হিসাবে আখ্যায়িত করেন। বাংলাদেশের জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে অনুধাবনের জন্য তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের গভীরে অনুসন্ধানের উপর জোর প্রদান করেন। ১৮ শতকের বাংলা, আরাকান, ত্রিপুরা, মনিপুর, মিজোরাম এবং বার্মা সম্পর্কিত ফ্রান্সিস বুচানন এর তথ্যসমূহ অতীব গুরুত্বের দাবীদার। তার গবেষণা বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উৎস্য হিসাবে বিবেচিত। এই ঐতিহাসিক তথ্যভান্ডার বর্তমান গবেষণায় চাকমা, মারমা, এবং ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবার, সমাজ কাঠামো, জ্ঞাতিসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ জ্ঞান সরবরাহ করে। ভ্যান স্যান্ডেল তার পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন যে- ফ্রান্সিস বুচানন এর তথ্যসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বিষয়ে মৌলিকত্বের দাবীদার এবং মূলত তার (বুচানন) বিশেষ কৃতিত্ব হল এই অঞ্চল সম্পর্কে ইউরোপিয়দের মনোভাব তুলে ধরা। তার আলোচনায় তৎকালীন গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা, সামাজিক জীবন এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের নিবিড় চিত্র ফুটে উঠে। ভ্রমনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থাকে তিনি খুব নিভিড়ভাবে কাছ থেকে দেখেছেন। তার পর্যবেক্ষণে এটা প্রতিয়মান হয় যে দক্ষিণ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থব্যবস্থায় জ্ঞাতি সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। যদিও বুচানন এর পর্যালোচনা ভ্রমন গ্রন্থ হওয়ার ফলে সমালোচিত তবে এটা অনস্বীকার্য যে এটি এক নিবিষ্ট ভ্রমনকারীর দিনপঞ্জী যেটা ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর বিশেষ করে গ্রামীণ বাংলাদেশ বিষয়ে।

Family & Kinship in Modern Society (1974)

By Bernard Farber

বর্তমান সময়ের পরিবার এবং জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নে এই গ্রন্থটি অপরিহার্য। পরিবার, পরিবার কাঠামো, জ্ঞাতি সম্পর্ক এবং এর সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় আইন-কানুন অনুধাবনে গ্রন্থটি আদর্শ বলা চলে। সামাজিক বিজ্ঞানের নিরিখে অনেক বিষয়ের আলোকপাত করলেও লেখক আমেরিকার পরিবার এবং জ্ঞাতি ব্যবস্থার বিশেষ কিছু দিক যেমন- গোষ্ঠী সম্পদ, গর্ভপাত, শিশু নির্যাতন, পারিবারিক কলহ, এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তবে আমেরিকার পরিবার ব্যবস্থা এবং পারিবারিক আইন বিষয়ে বিশদ ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উপরন্তু, পারিবারিক মূল্যবোধ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমসাময়িক পরিবর্তনকে তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারে দেখেছেন। পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্কের মৌলিক ভূমিকাকে

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকা এবং ইউরোপের পারিবারিক আইনের সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস গ্রন্থটিকে বিশেষত্ব দান করেছে।

Sex, Gender, and Kinship: A Cross-cultural Perspective (1997)

Burton Pasternak, Carol R. Ember, and Melvin Ember

লিঙ্গ, যৌনতা এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের আলোকে সমাজে পরিবারের অবস্থান তুলে ধরার প্রয়াস হল গ্রন্থটি। আন্তঃসাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোন থেকে বড় জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার প্রভাব পর্যালোচনায় লেখকবৃন্দ দেখান যে কিভাবে লিঙ্গ এবং যৌনতা সামাজিক সম্পর্কে ভূমিকা রাখে। সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহ ব্যবস্থায় জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রভাব নিরুপনের প্রচেষ্টা গ্রন্থটিতে লক্ষনীয়। বিশ্বের বিভিন্ন সমাজের পরিবার, বিবাহ এবং যৌনতার রুপকাঠি বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরণ আলোচিত হয়েছে। তবে গ্রন্থটিতে পশ্চিমা ধাচের বিচার বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান যৌনতা, লিঙ্গ, ও জ্ঞাতি সম্পর্ক বিষয়ক ধারণা অধিক গুরত্ব পেয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

A Comparative Analysis of Systems of Kinship and Marriage in South Asia (1973)

A. T. Carter

দক্ষিণ এশিয়ার জ্ঞাতি সম্পর্কের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন ছিল লেখকের মূল উদ্দেশ্য। ভারত এবং সিলং এর জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার তুলনামূলক বৈচিত্র সনাক্ত করার ক্ষেত্রে দেখানো হয় যে- দক্ষিণ এশিয়ার কিছু সম্প্রধায়ের বংশ ধারা হল unilineal যেখানে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় রীতি অনুসরন করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলা হয়। উত্তর ভারতের অনেক জাতিগোষ্ঠী এবং কেরালার নায়ারস সম্প্রধায়ের মধ্যে Hypergamous marriage তথা সমশ্রেনী বা জাতি বর্ণের মধ্যে বিবাহ বেশ লক্ষনীয়। ক্রস কাজিন বিবাহ দক্ষিণ এশিয়ায় বহুল প্রচলিত হলেও এক্ষেত্রে উত্তর ভারত ব্যতিক্রম। দক্ষিণ ভারত এবং সিলং এ ব্যবহৃত কিনশিপ টার্মিনলজিতে প্যারালাল কাজিন থেকে ক্রস কাজিনকে পার্থক্য করা হয় এবং ক্রস কাজিনকে আইন-সূত্রে ভাই-বোন (siblings-in-law) হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে উত্তর ভারতে সমস্ত কাজিনকে আইন-সূত্রে ভাই-বোন হিসাবে গণ্য করা হয়। যদিও বংশধারা রীতি, বিবাহ পদ্ধতি ও জ্ঞাতি ব্যবস্থার ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ায় লক্ষনীয় বৈচিত্র বিদ্যমান, তবে এক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রীতিগত পার্থক্যও চোখে পড়ার মত। জ্ঞাতি সম্পর্ক ভারত এবং শ্রীলংকার সমাজ কাঠামোয় গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

The Paharias: A glimpse of Tribal Life in Northwestern Bangladesh(1988)

Stephen G. Gomes

গোমেজ ১৯৮২ সালে রাজশাহী শহরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি খ্রিস্টান গ্রামে (আন্দর কোটা) তাঁর এই গবেষনাকর্মটি সম্পাদন করেন। তিনি মূলত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে পাহাড়িয়াদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ পাহাড়িয়াদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উদ্ভব ও বিকাশের সাথে সম্পর্কিত নানা অতিকথন, পরিবার কাঠামো, উত্তরাধিকার, গোষ্ঠী, জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিভিন্ন সংগঠন, জন্ম-মৃত্যু এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ঠ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, বিয়ে, বিয়ের আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি বর্ণনা করেছেন। এর পাশাপাশি পাহাড়িয়াদের পেশা, অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা ক্ষমতা কাঠামো ও বিচার ব্যবস্থা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সম্পর্কে গোমেজ তুলে ধরেছেন। এছাড়া তাদের প্রথাগত সংস্কৃতিতে বৃহত্তর বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব ও পরিবর্তন নিয়েও আলোচনা করেছেন এ গবেষণায়।

Social Formation in Dhaka City (1990)

Kamal Siddiqui

বাংলাদেশে নগর নৃবিজ্ঞানের একটি অন্যতম সহায়ক গবেষণা হিসাবে একে চিহ্নিত করা হয়। কামাল সিদ্দিকি ১৯৮৪-১৯৮৮ সালে ঢাকা নগরীর সব কটি ওয়ার্ডে তাঁর এই গবেষনাকর্ম পরিচালনা করেন। তিনি মূলত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ঢাকা শহরের উৎপত্তি, বিকাশ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সম্পর্ক ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক, শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শহর জীবনের সুবিধা ও অসুবিধা, যেমনঃ আবাসন সমস্যা, পানি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্দিকী আলোচনা করেছেন। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক যেমনঃ পরিবার, বিয়ে, জ্ঞাতি সম্পর্ক, গোষ্ঠী সংহতি, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তাঁর এই গবেষণায়। এছাড়া সিদ্দিকী ঢাকা শহরের রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, পতিতা, বুদ্ধিজীবি, অপরাধচক্রের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কেও বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

A Garo Village in Bangladesh: A Sociological Study (1986)

Zahidul Islam

জাহিদুল ইসলাম ১৯৮৪-৮৬ সালে শেরপুর জেলাধীন নালিতাবাড়ি উপজেলার একটি গ্রামে (আন্দারোপাড়া) তাঁর গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করেন। তিনি মূলত গারো সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে গারো সমাজের মাঝে আধুনিক শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে সামাজিক কাঠামো, পরিবার ব্যবস্থা, গোষ্ঠী ব্যবস্থা, ধর্মীয় সংগঠন, স্থানীয় নেতৃত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার (মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে রূপান্তর) ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ নানা উপাদানের ফলে পরিবর্তনের প্রবণতা ও প্রকৃতির বিশ্লেষণই হচ্ছে আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

The Marmas of Bangladesh (1993)

Selina Ahsan

সেলিনা আহসান বান্দরবান জেলার মারমা উপজাতির মধ্যে তাঁর এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেন। তিনি তাঁর গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এটি মূলত মারমা সম্প্রদায়ের উপর রচিত একটি এথনোগ্রাফী। তিনি মারমা উপজাতির জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ মারমা সম্প্রদায়ের পরিবার, বিয়ে, পেশা, ধর্ম, উত্তরাধিকার প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান ও সমাজকাঠামো সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়।

Kinship and Gender: An Introduction (2011)

Linda Stone

এই গবেষণাকর্মে লিন্ডা স্টোন বিবাহ ব্যবস্থাকে দশটি এথনোগ্রাফিক স্টাডির মাধ্যমে নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন। এই এথনোগ্রাফিক স্টাডির মধ্যে রয়েছে প্রাচীন রোমের বিবাহ পদ্ধতি, হিমালয় অঞ্চলের বহুপতি বিবাহ ব্যবস্থা এবং ইউরোপ ও ইউরোপীয়-আমেরিকান জ্ঞাতিসম্পর্ক ও জেন্ডার ইস্যু। এছাড়াও তিনি প্রজনন সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত নতুন প্রযুক্তি জ্ঞাতি সম্পর্ক ও জেন্ডার ইস্যু বিনির্মাণে কি ভূমিকা রাখছে, সে বিষয়টি পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। লিন্ডা স্টোন বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জেন্ডার এর ভূমিকা অনুধাবনের জন্য নৃবিজ্ঞানের জ্ঞাতি সম্পর্কের ধারণাকে ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। জ্ঞাতিসম্পর্ককে জেন্ডার এর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

মূলত মানুষের সন্তান পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ সন্তান পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ কি ধরণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভূমিকা রেখে থাকে। এছাড়াও তিনি প্রাইমেটদের জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়েও এই বইতে পর্যালোচনা করেছেন।

The Nuer: A description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people (1940)

E. E. Evans-Pritchard

ইভান্স প্রিচার্ড নুয়ের জাতির যাপিত জীবন নিয়ে এই বইটিতে আলোচনা করেছেন। নুয়ের জাতি নীল নদ ও উপনদী সমূহের তীরবর্তী দক্ষিণ সুদান এর বাসিন্দা। তাদের জীবন মূলত গবাদিপশুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গবাদিপশু তাদের জীবিকার মূল উৎস এবং সামাজিক আচারসমূহ গবাদিপশুকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। গবাদিপশু পালন ছাড়াও তারা মাছ ধরে এবং বজরা চাষ করেও তারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাছাড়া তিনি নুয়েরদের জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিবাদ মিটানোর পদ্ধতি, সামাজিক সম্পর্ক নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Kinship in Bengali Culture (1977)

Ronald B. Inden and Ralph W. Nicholas

ভারতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Ronald B. Inden এবং বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে অগাধ পান্ডীত্বের অধিকারী নৃবিজ্ঞানী Ralph W. Nicholas যৌথভাবে বাঙ্গালী জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়ন করেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ভূখন্ড নিয়ে গড়ে উঠা বাঙ্গালী সংস্কৃতির জ্ঞাতি ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা রয়েছে গ্রন্থটিতে। বাংলা সংস্কৃতির আওতাভুক্ত অঞ্চলকে একই বৈশিষ্টের ধরা হলেও এ বিশাল ভূখন্ডের মধ্যে উপভাষা, ধর্ম, বাসস্থান ও সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। উপরন্তু বাংলার জ্ঞাতি সম্পর্কের পদাবলির ক্ষেত্রে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম এবং বাংলা, আরবি, ও সংস্কৃত ভাষা প্রভাবক ভূমিকা রাখে। এ গ্রন্থটিতে জ্ঞাতি সম্পর্কের ধারণাগত আলোচনা বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রসর হয়েছে। লেখকদ্বয় জ্ঞাতি সম্পর্কের একটি মৌলিক একক সনাক্ত করেন যা বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অংশের সংস্কৃতির মূলে রয়েছে। সংস্কার আচার এবং বিবাহ পদ্ধতি বিশ্লেষনের মাধ্যমে দেখানো হয় কিভাবে জ্ঞাতি সম্পর্কের পদাবলী নির্ধারিত হয় এবং বিবাহের মাধ্যমে এগুলো রুপান্তরিত হয়। বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান। তাই বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে। একইভাবে বাঙ্গালী জ্ঞাতি

সম্পর্কের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জাতিগোষ্ঠীর জ্ঞাতি সম্পর্কের সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতের অন্যান্য অংশের জ্ঞাতি সম্পর্কের নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সাথে বাঙ্গালী জ্ঞাতি সম্পর্কের তুলনামূলক বিচার বিশেলষণে এটা দাবী করা হয় যে উত্তর ভারতের জ্ঞাতি সম্পর্কের পদাবলির সাথে বাঙ্গালী জ্ঞাতি সম্পর্ক কাঠামোর যোগাযোগ রয়েছে। অধিকন্তু বাঙ্গালী সমাজে জাতিবর্ণ, পেশা, ধর্ম, এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরণে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি পদাবলি ও বন্ধনের তারতম্য অগ্রগণ্য বলে উল্লেখ করা হয়।

Relative Values: Reconfiguring Kinship Studies (2002)

Sarah Franklin and Susan McKinnon (Ed)

Relative Values প্রবন্ধটি নৃবিজ্ঞানের প্রথাগত জ্ঞাতি সম্পর্ক তত্ত্বের সংস্কার সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। লিঙ্গ অধ্যয়ন, জাতিগত অধ্যয়ন এবং উত্তর আধুনিকতাবাদের মূল আলোচনাকে চ্যালেঞ্জ করে জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নের প্রথাগত ধারায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এদিক দিয়ে প্রবন্ধটি জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নের নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্র তৈরির অসামান্য কাজ করে। কেস স্টাডি ও জ্ঞাতি সম্পর্ক তত্ত্বসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে লেখকবৃন্দ জ্ঞাতি সম্পর্ক তত্ত্বের ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ বিচার বিশেলষণ করেন এবং এমন কিছু প্রশ্নের জন্ম দেন যা নৃবিজ্ঞানের জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নের মূল ভিত্তিকে নাড়া দেয়। যেমন- সমসাময়িক জৈব-রাজনীতি, বাণিজ্যকরণ, এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জ্ঞাতি সম্পর্ক কিভাবে প্রভাবক ভূমিকা রাখে? জ্ঞাতি সম্পর্ক কিভাবে গঠিত হয়, যখন ক্ষমতার সম্পর্ক সমতা, পদক্রম, অন্তর্ভুক্তি, সহিংসতা ও বঞ্চিতকরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে? রক্তদান ও ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে রক্ত গ্রহণ (blood transfusion),অন্য দেশ থেকে সন্তান দত্তক নেয়া, জেনেটিক সমর্থনকারী দল, নতুন প্রজনন প্রযুক্তি ইত্যাদি জটিল প্রপঞ্চের মাধ্যমে জ্ঞাতি সম্পর্কের (জৈবিক) প্রয়োগ নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। যাতে লেখকবৃন্দ প্রথাগত জ্ঞাতি সম্পর্ক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উপস্থাপন করার পাশাপাশি নতুন ধারণা তৈরিতে অবদান রাখেন।

Kinnship Studies in Late Twentieth-Century Anthropology (1955)

Michael G. Peletz

ঊনিশ শতকের শেষের দিকের জ্ঞাতি সম্পর্ক বিষয়ক নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতির পর্যালোচনা করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রতি মার্ক্সীয় তত্ত্ব, নারীবাদী তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচার বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে। পাশাপাশি জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নের নতুন ধারা ও মাত্রা যেমন লেসবিয়ান/গে সম্পর্ক, নতুন প্রজনন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি পর্যালোচিত হয়েছে। সমসাময়িক জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়ন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর

করে; দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর মনোনিবেশ করে, এবং লিঙ্গ, ক্ষমতা, এবং বৈচিত্রতার উপর জোর দেয়। মুলত ১৯৭০ দশক থেকে প্রজনন প্রক্রিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে এবং এর সাথে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে জ্ঞাতি সম্পর্ক পদাবলি। জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নের শুচনালগ্নের সময়ের চেয়ে বর্তমান সময়ের জ্ঞাতি সম্পর্ক আরো জটিল যাকে কোন সরল কাঠামো দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়না। এছাড়া জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সার্বজনীন সাধারন তত্ত্ব তৈরি করা কষ্টসাধ্য কারণ বিচিত্রতা লালন করায় নৃবিজ্ঞানের ধর্ম।

The Current Controversy in Kinship

Martin Ottenheimer

জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে বিতর্কের ফলে দুইটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। একদল মনে করে জ্ঞাতি সম্পর্ককে শুধুমাত্র প্রজননের জৈবিক প্রয়োজনীয়তা ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। অন্যদল মনে করে প্রথম দলের মতামত পক্ষপাতদুষ্ট এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে উদ্ভুত। অধিকন্তু দ্বিতীয় দলের মতামত হল একটি বড় সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণভাবে জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নে সক্ষম। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচ্য বক্তব্য হল পৃথিবীর প্রত্যেকটা সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্ককে ঐ সমাজের সংস্কৃতির আলোকে বিশেলষণ করতে হবে। কিন্তু Martin Ottenheimer এ দুই দলের মতামতের অপর্যাপ্ততা উপস্থাপন করেন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সুপারিশ করেন। জ্ঞাতি সম্পর্কের চিরাচরিত জৈবিক-সাংস্কৃতিক বিতর্কের ঊর্ধে গিয়ে উপরন্তু এই প্রবন্ধ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাতি সম্পর্ক অধ্যয়নের উপর জোর দেয় যেটা মানুষের সামাজিক আচার-আচরনের উপর নির্ভরশীল।

Anthorpological Perspectives on Kinship

Hoy Ladislav

এই বইটিতে প্রজনন সংক্রান্ত নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিত্ব ও জেন্ডার সম্পর্কে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তা কিভাবে জ্ঞাতিসম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা পালটে দিচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক অতীতে পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ড কিভাবে জ্ঞাতিসম্পর্ক ধারণাটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ব্যক্তিত্ব গঠন ও জেন্ডার সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত ধারণা কিভাবে জ্ঞাতিসম্পর্ক ধারণাটিকে প্রভাবিত করেছে এবং নৃবিজ্ঞানীর অনুধাবন যে সাংস্কতিক পক্ষপাতিত্বের উর্ধে নয় সেটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Three Styles in the Study of Kinship (1971)

John Arundel Barnes

তিন জন প্রথিতযথা নৃবিজ্ঞানী জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে কি ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন বইটিতে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কাঠামোবাদী ও ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী মেয়ার ফোরটেস, কাঠামোবাদী ক্লদ লেভি-স্ট্রস এবং মানব সম্পর্কে বিষয়ে তথ্যপুঞ্জ প্রস্তুতকারী জর্জ মারডক এই প্রথিতযথা নৃবিজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত যারা জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নের তিনটি স্বতন্ত্র ধরন বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

Kinship (1930)

Bronislaw Malinowski

ম্যালিনোস্কি প্রচলিত ও কাঠামোবদ্ধ উপায়ে জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার সমালোচনা তুলে ধরেছেন এই বইটিতে। ম্যালিনোস্কি জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে অতীত জনগোষ্ঠীর চর্চা ও অনুধাবনের উপর বেশি গুরত্ব আরোপ করেছেন, এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে বিবর্তনবাদী চিন্তাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর অধিক জোর দিয়েছেন। জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞাতিসম্পর্কের উৎপত্তির চেয়ে এর কার্যকারণ প্রক্রিয়ার উপর বেশি গুরত্ব আরোপ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অণু পরিবারের সন্তানের সাথে পিতামাতার সম্পর্ক অধ্যয়নের উপর বেশি গুরত্ব দিয়েছে।

New Direction in Anthropological Kinship Studies (2001)

Linda Stone

লিন্ডা স্টোন জৈবিক, মনোস্তাত্ত্বিক, এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে জ্ঞাতিসম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও জ্ঞাতিসম্পর্কের সাথে প্রজনন প্রযুক্তি সমকামী সম্পর্ক বিবাহ বিচ্ছেদ, এবং পুনঃবিবাহের কারণে অভিভাকত্ব ও রাষ্টের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯৮০ দশকের পর থেকে সমকামী সম্পর্ক, টেষ্ট টিউব প্রযুক্তি, এবং স্পার্ম দানের ফলে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর সীমাবদ্ধতা উপস্থাপন করেছেন।

Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective

Robin Fox

রবিন ফক্সের জ্ঞাতিসম্পর্কের কাঠামো ও গোষ্ঠীবদ্ধতা বিষয়ক এই লেখনীটি নৃবিজ্ঞানের অন্যতম একটি পাঠ্য বই। বইটি তার বাস্তবভিত্তিক ভঙ্গীমা ও সহজবোধ্যতার জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণাগত, তাত্ত্বিক এবং এথনোগ্রাফিক মৌলিক বিষয়াবলির বিশদ আলোচনা রয়েছে গ্রন্থটিতে। বইটিতে ফক্স উত্তরাধিকার ও ঐক্যবদ্ধতার ভিত্তিতে জ্ঞাতিসম্পর্কের মূল বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। ফক্স দেখান যে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং ক্ষমতার লড়ায় পৌরাণিক কাহিনীতে জীবন্ত। গল্পে ও কাল্পনিক উপখ্যানে আত্মীয়তার সম্পর্ক আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই করে, গীর্জা অথবা রাষ্ট- এ দুটির মধ্যে কোনটি। যখন রাষ্ট প্রতিরক্ষায় ব্যর্থ হয় তখন লোকেরা আত্মীয়তার সম্পর্কের নির্দিষ্টতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এর ভাষা সর্বদা ভাবাবেগের জন্য ব্যবহৃত হয়, ভাই ও বোনেরা এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য। ফক্স আরো মনে করেন যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে চিরকাল থাকবে এবং হয়ত স্বাভাবিকভাবে একটি পুনরুত্থান ঘটবে।

Family, Kinship and Marriage (2016)

Joy Hendry

সামাজিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বিবাহ হল সর্বপ্রাচীন ও সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। জ্ঞাতিসম্পর্ক হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে পরিবারের মধ্যে আমরা লালিত-পালিত হয় এবং এর মাধ্যমেই আমরা সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারি। বইটির ১ম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে জ্ঞাতিসম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ আত্মীয়ের বাইরে অন্যদের আলাদা করতে পারে এবং আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে জানে। আত্মীয়-অনাত্মীয় এর পার্থক্য মানুষ সহজাতভাবে শিখে এবং নতুন ধরনের আত্মীয় সম্পর্কে জড়িত হয়। আত্মীয় সম্পর্কের গুরত্ব নির্দেশ করে লেখক বলেন- আমরা আমাদের নিকটাত্মীয়দের অনেকদিন দেখতে নাই পারি অথবা যোগাযোগ নাই করতে পারি কিন্তু আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আত্মীয়রা বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিপদাপদে আত্মীয়তার সম্পর্ক অশেষ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন সম্পর্ককে শ্রেণীভুক্ত করবে এবং কিভাবে তাদের ঘনিষ্টতার মাত্রা নির্ধারণ করবে। অনেকাংশে মানুষ স্বতন্ত্র ধারনা পোষণ করে আত্মীয় সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে। বংশধারার বৈচিত্রতার কারনে এবং নতুন ধরণের প্রজনন প্রযুক্তির আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্কে বৈপ্লবীক পরিবর্তন এসেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে

রক্তের বন্ধন বিষয়ে মানুষের পূর্ব-ধারণা নতুন মোড় নিচ্ছে, সন্তানেরা পিতামাতার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছে যত্ন-ভালবাসা প্রেক্ষিতে। দম্পতির পূর্বের বিবাহজাত/সম্পর্কজাত সন্তান নতুন বাবা/মাকে পিতামাতা হিসাবে গ্রহণ করছে তাদের সন্তানের প্রতি যত্ন এবং ভালবাসার ভিত্তিতে। একই সম্পদের পারস্পরিক ব্যবহারের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে নতুন আত্মীয়তার সম্পর্ক। একই পরিবেশ ও ভূমির সাথে বন্ধনে আবদ্ধ থাকার ফলে নতুন আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হচ্ছে।

Alternative Kinship, Marriage, and Reproduction

Nancy E. Levine

নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জন্য নতুন ধরণের জ্ঞাতি সম্পর্কের পদাবলী বিষয়ে লেখক পর্যালোচনা করেন। সমকামী সম্পর্কের বিষয়ে অতি সাম্প্রতিক গবেষণার উপর গুরত্ব দেয়ার পাশাপাশি এই নতুন ধরণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রজনন জটিলতায় আলোচিত হয়েছে। এই নিবন্ধটি আরম্ভ হয়েছে তাত্ত্বিক চিন্তা-ধারার উপর ভিত্তি করে এবং পরবর্তীতে আলোচনার বিষয়বস্তু প্রাক-শিল্প যুগ থেকে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিবাহ ও পরিবার গঠন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হয়েছে। এই গবেষণার জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান দৃঢ় হয়েছে মূলত সমসাময়িক গে পুরুষ ও লেসবিয়ান নারীর সম্পর্ক বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে যেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে কিভাবে সমকামী সম্পর্ক জ্ঞাতি ও পরিবারের সাথে অর্থবহ সম্পর্ক তৈরি করছে। উপরন্তু সমকামী সম্পর্ক প্রথাগত পরিবার ব্যবস্থার রীতিনীতি কিভাবে মেনে চলে অথবা চ্যলেঞ্জ করে তা বিভিন্ন সমাজের উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে নতুন প্রজনন প্রযুক্তি ইউরোপীয়-আমেরিকান সমাজে সমাদৃত হয়েছে এবং জ্ঞাতি সম্পর্ক বিষয়ে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ কিভাবে সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়েছে।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা

খুরশীদ আলম সাগর

আয়তনে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র হলেও সাংস্কৃতিক এবং নৃ-তাত্ত্বিক বৈচিত্রে এই দেশে বৈচিত্রময়। প্রকৃতি যেমন আপন হাতে তার সম্পদদিয়ে সাজিয়েছেন রূপসি বাংলাকে তেমনি বাংলাদেশ জনগোষ্ঠীর বৈচিত্রেও বৈচিত্রময় ও সম্পদশালী। যদিও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাংলাভাষী, বাংলাদেশ ভূখন্ডে ২০ এর অধিক ছোট ছোট নৃগোষ্ঠী তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দিয়ে এদেশের বৃহত্তর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব নৃগোষ্ঠী নিয়ে এখন পর্যন্ত

অর্থবহ কাজ খুব একটা হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে খুরশীদ আলম সাগরের "বাংলাদেশের আদিবাসীর কথা" বইটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। বইটিতে লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সার্বিক পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। বইটিতে এ দেশের বসবাসরত ২০ টির অধিক জাতি ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারনা তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে বাঙালি, চাকমা, সাঁওতাল, মণিপুরী, মুরং বা ম্রো বা মোরো, খাসিয়া, মারমা, রাখাইন, চাক, মুণ্ডা,কুকি, হাজং, লুসাই, লাউয়া মুসলমান, পাঙন মুসলমান, রাজবংশী, ওরাও বা ওরাং, তংচঙ্গা, সেন্দুজ, এবং খুমী জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস, বাংলাদেশে আগমন, সংস্কৃতি এবং সমাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক মনে করেন সুদীর্ঘকাল থেকে অসংখ্যক জনগোষ্ঠীর পদচারণায় মুখর এই জনপদ। একমাত্র ইংরেজ ব্যতীত আর সকল মানব গোষ্ঠী এই দেশের রুপ-রস-গন্ধের সাথে মিশে গেছে। শেকড়ের সাথে তরলায়িত হয়ে তারা আজ গর্বিত বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ অংশ। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির পাশাপাশি চাকমরা, মরমা, মণিপুরী, গারো, সাঁওতাল, রাখাইন, টিপরাসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অনিন্দ সুন্দর আবাস গড়ে তুলেছে । বঙ্গ, বাংলা, বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশে তাদের আগমনকালও বিভিন্ন। প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে আর্য জাতি ভারত বর্ষে আগমন করে। তারা অনেক চেষ্টা করেও বঙ্গদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। আদি বাঙালিদের প্রতিরোধের মুখে তাদের অগ্রযাত্র ব্যহত হয়। কালক্রমে বাঙ্গালী জাতি বাংলায় উন্নত কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে তোলে। পুন্ড্র, পাহাড়পুর,ময়নামতি প্রভৃতি স্থানের সভ্যতা এখানে বাঙ্গালীর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ইদানিং উয়ারী বটেশ্বরে সভ্যতাকে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বাঙালী সভ্যতাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার সমকক্ষ আসনে উপনীত করেছে। লেখক দাবী করেন বাঙালির অনেক পরে চাকমা,মারমা,রাখাইন, গারো, মণিপুরী, সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আগমন করে। কালের বিচারে তারাও আজ এই দেশে প্রাচীন। কিন্তু কোন একটি দেশে বর্তমান বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত আদি বা প্রথম থেকে বাস করছে তারাই আদিবাসী।

Aborigines বা 'Indigenous এর আভিধানিক অর্থ বলতে তিনি নির্দেশ করেন 'from the beginning' এই অর্থে বাংলাদেশে আদি বা প্রথম বসবাসকারী হচ্ছে বাঙালী জনগোষ্ঠী। সুতরাং লেখক যুক্তি উপস্থাপন করেন যে বাংলাদেশের আদিবাসী হচ্ছে বাঙালি। তিনি দাবী করেন কেউ কেউ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতাল, প্রভৃতির যারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর তাদেরকে বাংলাদেশের আদিবাসী হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। এই মানসে আলোচ্য গ্রন্থ বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের আদিবাসী বিতর্কে নতুন গতিপথ তৈরিতে বইটি কৃতিত্বের দাবীদার।

Conceptions of Kinship (1981)

Bernard Farber

বইটিতে বংশগত পার্থক্যের ভিত্তিতে জ্ঞাতিসম্পর্কের আলোচনা করা হয়। আমেরিকার এরিজোনা অঙ্গরাজ্যে ৭৭২ জনের মধ্যে তিনি গবেষণা পরিচালনা করেন। প্রথম ৩ অধ্যায়ে লেখক আত্মীয়দের মধ্যে বংশগত পার্থক্য বিশ্লেষণের জন্য জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যায়নের ৫ টি মডেলের ঐতিহাসিক ভিত্তি বিষলেশন করেন। এই ৫ টি মডেল হল- The Parentela Orders Model, The Civil Law Model, The Canon Law Model, The Genetic Model। তিনি নির্দেশ করেন এই ৪ টি মডেল শুধুমাত্র উত্তরাধিকার নিরুপনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক না বরং জ্ঞাতিসম্পর্কের গঠন উপলব্দিতে বেশ গুরত্বপূর্ণ। যেমন Parentela Orders Modelউৎপত্তি হয়েছে ইহুদীবাদ এবং প্রাচিন গ্রীসে, যেটি আত্মীয়দের শ্রেণিবদ্ধ করে ‘‘Parentela” অনুসারে যার অর্থ হচ্ছে কোন জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে উঠে পূর্ব-পুরুষ+বংশধরদের মাধ্যমে। অপরদিকে The Civil Law Model প্রাচিন রোমান আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যেটি ব্যক্তিদের মধ্যে বংশগত সম্পর্কের যোগসূত্রের সংখ্যা গণনা করার মাধ্যমে জ্ঞাতিসম্পর্ক নির্ধারণ করে। ফার্বার মনে করেন আত্মীয়রা দল বা ব্যক্তি যেভাবেই পরিগনিত হন না কেন অথবা যে উপায়ে তাদের বংশধারা হিসাব করা হোকনা কেন জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থায় এগুলো গুরত্বপূর্ণ। ফার্বার দাবী করেন জ্ঞাতিসম্পর্ক মডেল হচ্ছে Social Space এর রুপক বহিঃপ্রকাশ। তার জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নের অন্যতম কেন্দ্রীয় ধারণা হচ্ছে জ্ঞাতিসম্পর্ক Centripetal অথবা Centrifugal হতে পারে। পরে বৈজ্ঞানিক তথ্যের মাধ্যমে দেখানো হয় যে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা বিভিন্ন ধরনের সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে সমাজ কাঠামোর আলোচনা জ্ঞাতিসম্পর্কসহ আরো অনেক সামাজিক সংগঠনের পর্যালোচনায় গুরত্বপূর্ণ। জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ক ফার্বার এর তাত্ত্বিক আলোচনা শুধুমাত্র নৃবিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ নয় বরং সমাজবিজ্ঞানের, আইন, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তার অন্যতম অবদান হল জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র রচনা করেছেন। জ্ঞাতিসম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলক বিশ্লেষণ কোন সাংস্কৃতিকে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে।

যদিও এ বইটি জ্ঞাতিসম্পর্কের তত্ত্ব নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে কিন্তু এর কিছু দুর্বল দিকও রয়েছে। যেমন যে উপায়ে জ্ঞাতিসম্পর্কের শ্রেণীকরণ করার কথা বলা হয়েছে সেটি অনেকটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে লেখকের আলোচনায়। এর পাশাপাশি বইটিকে প্রাথমিক তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে রচিত দাবী করা

হলেও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Crosstab ব্যবহার করা হয়েছে এবং Appendixএ শুধুমাত্র একটি Regresssion দেখানো হয়েছে।

A Critique of the Study of Kinship (1984)

David M. Schneider

জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নকে Schneider পশ্চিমা পক্ষপাতদুষ্ট মনে করেন এবং সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণের উপাদান হিসাবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করেন। এক্ষেত্রে তিনি কিছু মৌলিক প্রশ্ন করেন যা প্রথাগত পশ্চিমা ধাচের জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে- জ্ঞাতি সম্পর্ক কি? যেভাবে এটাকে ভাবা হয় এটা কি তেমন? মানব সমাজের গুরত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে এটাকে কি খুব ভালভাবে সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে? জ্ঞাতিসম্পর্ক কি বৈশ্বিক? তার আলোচনা শুরু হয় ইয়াপসি জ্ঞাতিসম্পর্ক ও সামাজিক সংগঠন বিষয়ে দুটি ভিন্নধর্মী বর্ণনা উপস্থাপন করার মাধ্যমে। প্রথমটি হল ইয়াপসি সমাজের উপর তার পূর্বের কাজের সারাংশ, যেখানে রিভার্স, ব্রাউন এবং মারডক এর তাত্ত্বিক আলোচনার স্থান রয়েছে। দ্বিতীয়টি হল ইয়াপসি সমাজের সামাজিক সংগঠনের পদাবলির স্থানীয় নাম যেগুলোকে তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে তিনি গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দ্বিতীয়টিকে গুরত্ববহ বলে দাবী করেন। এই বইয়ের মূল বিষয় হল প্রথাগত জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা। প্রথমেই তিনি যাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেন তা হল Doctrine of the Genealogical Unity of Mankind। মরগান থেকে শুরু করে ডুর্খেইম, রিভার্স এবং লাউন্সবারি পর্যন্ত তাত্ত্বিকদের জ্ঞাতিসম্পর্কের বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করে তিনি এমন এক তত্ত্ব দাঁড় করান যার বক্তব্য হচ্ছে জ্ঞাতিসম্পর্ক হল পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যকার জৈবিক সম্পর্ক। Schneider এর মতে জ্ঞাতিসম্পর্কের এই মতবাদ তিনটি অনুমান এর উপর নির্ভর করে- ক) পিতামাতা-সন্তানের মাঝে বন্ধন তৈরির জন্য সকল মানুষের মধ্যে প্রজনন তত্ত্ব বিদ্যমান, খ) বংশলতার মাধ্যমে নিরুপিত পদাবলী অর্থ সাপেক্ষে তুলনাযোগ্য, গ) প্রজনন তত্ত্বসমূহের উপাদানের পার্থক্য সকল মানব সমাজে প্রয়োগযোগ্য বংশধারা নিরুপন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেনা। এই তিন ধরণের তত্ত্ব জ্ঞাতিসম্পর্কের বিষয়ে সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে জৈবিক সম্পর্ককে গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু ইয়াপসি সমাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেন প্রজনন তত্ত্ব পিতামাতা-সন্তানদের সাথে বন্ধন তৈরি করেনা বরং পিতামাতা-সন্তানদের সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিরাজ করে যেটা অনেকাংশে বিনিময় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। ইয়াপসি সমাজে পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক বংশলতার মাধ্যমে নিরুপিত নয় বরং মা-সন্তানের জৈবিক সম্পর্কের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয় হতে পারে। পাশাপাশি জ্ঞাতিসম্পর্কের আলোচনায় ক্রিয়াবাদের কিছু সমালোচনা

উপস্থাপন করেন। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞাতিসম্পর্ককে মানব অস্তিত্বের কিছু অপরিহার্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে দেখা হয়; উভলিঙ্গ প্রজনন, প্রজনন কর্মে যৌন সম্পর্কের ভূমিকা, মানব শিশুর অসহায়ত্ব, গর্বে থাকা অবস্থায় মাতৃত্ব ও সন্তানের লালল-পালন। Schneiderমনে করেন ক্রিয়াবাদীরা মানব প্রকৃতির অপরিহার্য কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে জ্ঞাতিসম্পর্কের বিশেষ স্থান দাবী করে "অপরিহার্য কার্যক্রমের" কোন ধরণের সুস্পষ্ট ব্যাখা ছাড়া এবং "অপরিহার্য কার্যক্রম" কিভাবে সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক রুপ গঠন করে। নৃবিজ্ঞানের শুরু থেকে জ্ঞাতিসম্পর্ক, অর্থনীতি, এবং ধর্ম কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলেও নির্দিষ্ট সংস্কৃতির নিরিখে এসব বিষয়ে আলোচনার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে স্বল্প। এদিক দিয়ে Schneiderনৃবিজ্ঞানের আলোচনাকে Ethnocentrism বলে আখ্যায়িত করেন পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের Blood Is Thicker Than Water ধারণার জন্য। Schneider কর্তৃক Doctrine of Genealogical Unity ও Centrality of parent/child relationship সমালোচনার কিছু দুর্বল দিক রয়েছে। প্রথমত তার যুক্তি ২ টি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত- ক) ইয়াপসিরা বিশ্বাস করেনা যে শারীরিক মিলন গর্ভবতী হওয়ার জন্য দরকারি, খ) পিতা-সন্তান সম্পর্ক জৈবিকভাবে বিবেচনা করা হয়না। কিছু বিষয়ের ফলে তার যুক্তি অনেকাংশে বাতিল বলে পরিগণিত হয়- ক) কোন সন্তানের সাথে কোন পুরুষের চেহারার সাদৃস্য দেখে ইয়াপসি মহিলারা গল্পের ছলে বলাবলি করে কোন সন্তানের বাবা কে ও কার সন্তান কে এবং ধারণা করে ঐ সন্তানের মায়ের সাথে ঐ পুরুষের দৈহিক মিলন হয়েছে। ১৯৭০ সালে একজন ইয়াপসি জাদুকর মহিলা বলেন পুরুষ তিনভাবে সন্তান অর্জন করতে পারে- দৈহিক মিলন ও গর্ভধারণ, দত্তক গ্রহণ, এবং অন্য পুরুষ (স্বামী) কর্তৃক নিজের স্ত্রীর সন্তান। তিনি এই তিন ধরণের সন্তানের মধ্যে পদক্রম তৈরি করেন-

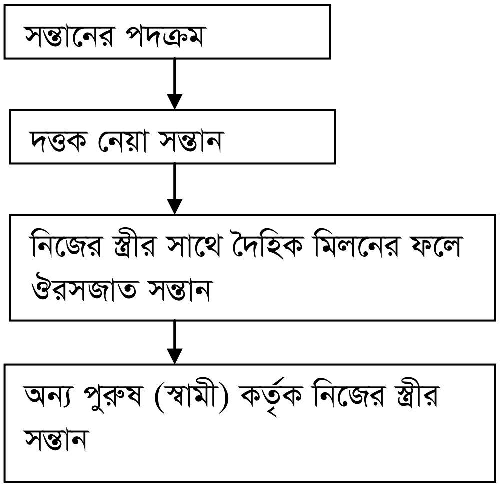

দত্তক নেয়া সন্তানকে বেশি গুরত্ব দেয়ার কারণ হিসাবে তিনি বলেন এই দম্পতি ঐ সন্তানকে তার আসল বাবা-মা থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সন্তানকে মাঝামাঝি অবস্থানে রাখার কারণ হল এই সন্তান তাদের দুজনের মধ্যকার দৈহিক মিলনের ফলে জন্ম নিয়েছে যেখানে দুজনের অবদান সমান। অর্থাৎ পিতা ও মাতার দিক থেকে এ সন্তান মাঝমাঝিতে অবস্থান করে। আর অন্য পুরুষ (স্বামী) কর্তৃক নিজের স্ত্রীর সন্তানকে তৃতীয় অবস্থানে রাখার কারণ হল এই সন্তানের ঔরসজাত পিতা তাকে চায়না। Doctrine of the Genealogical Unity of Mankind কে বাদ দেয়ার জন্য তিনি Doctrine of the Primacy of Cultural Symbols and Meanings প্রস্তাব করেন। এই ধরণের বিভেদ ও মেরুকরণ অনেকটা সাংস্কৃতিক চিন্তার মেরুকরণের মত, যেমন - Materialism vs. Mentalism, Conservatism vs. Liberalism, Determinism vs. Free Willইত্যাদি। যাহোক, উপরোক্ত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও Schneider এর বইটি জ্ঞাতিসম্পর্ক ও সামাজিক সংগঠন অধ্যয়নে বিশেষ তাৎপর্যের দাবীদার।

৩.২ প্রত্যয়গত ও তাত্ত্বিক ধারণা

বর্তমান গবেষণায় নৃগোষ্ঠী শব্দটি ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধীতে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ‘অন্য’ মানুষগুলোকে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসাবে বলা হয়েছে। এ বিষয়ক গবেষণাকে বুঝার জন্য কতগুলো প্রত্যয়ের সাথে পরিচিত হওয়া জরুরি হয়ে উঠে যেমন-আদিবাসী, জাতি, ট্রাইব, পরিচিত, এথনিক গ্রুপ এবং এথনিসিটি ইত্যাদি। বিশ্বের ৫টি মহাদেশের ৯০টির ও বেশি দেশের কমপক্ষে ৫,০০০টি আদিবাসী জাতি রয়েছে যাদের জনসংখ্যা আনুমানিক ৩৭০ মিলিয়ন। আদিবাসীরা মিলে বিশ্বের ২০% এর বেশি পরিমাণ ভূখণ্ড দখল করে আছে এবং বিশ্বের ৮০% এর বেশি সাংস্কৃতিক ও জীববৈচিত্র্য প্রতিপালন ও রক্ষা করছে (বান কি মুন-২০১১)।

বর্তমান অধ্যয়নটিতে নৃগোষ্ঠী বলতে সংখ্যাগত স্বল্পতা, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, ভিন্ন জীবন রীতি, একই বংশধারা, একই ভাষা ও সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে উদ্ধুদ্ধকে বুঝায়। এছাড়া অধ্যয়নটিতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় রয়েছে যা পরিবার এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক। এ প্রত্যয় দুটোকে অধ্যয়নের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হলো- পরিবার হলো মানব সমাজের একটি সার্বজনিন প্রতিষ্ঠান। সমাজের মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পরিবার। যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে মানুষের নিবিড় ও অকৃত্রিম সম্পর্ক রয়েছে পরিবার তাদের মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যেখানে বৈবাহিক ও রক্তের সম্পর্ক সুত্রে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী, তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি এবং কোনো কোনো

ক্ষেত্রে সন্তানাদির স্ত্রী-পরিজনসহ বাস করে। কিন্তু পরিবারের আকৃতি-কাল, সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। ইংরেজী Kin (আত্মীয়) থেকে Kinship শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ককে বুঝাতে Kinship বা জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞাতি সম্পর্ক বলতে বুঝায় যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যাপক অর্থে জ্ঞাতি সম্পর্ক বলতে বুঝায় পূর্ব পুরুষের সাথে জৈবিক বন্ধন, বিবাহ বন্ধন, কাল্পনিক বন্ধন, বন্ধুত্ব, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি বন্ধন সূত্রে জ্ঞাতি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। জ্ঞাতি সম্পর্ক হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর এমন একটি অপরিহার্য অংশ যা সমগ্র সামাজিক সম্পর্কের বিন্যস্ত জাল (Network) হিসেবে কাজ করে। সমাজ জীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে বন্ধন দৃঢ়করনে, সামাজিক দল গঠনে, মানুষের ভূমিকা নির্ধারন ও পালনে জ্ঞাতি সম্পর্কে ভূমিকা অপরিহার্য। তিনটি নৃগোষ্ঠীর জীবন ধারার তুলনামূলক ও আন্তঃসংস্কৃতি অবস্থার মধ্যদিয়ে তাদের পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্কের ধারাটি নৃবৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিকধারার আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনাকে চারটি দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন (Ember and Ember: 2001)| তবে উক্ত অধ্যয়নটি ‘Synchronic তুলনার ভিত্তিতে নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পর্যালোচনা, কতটুকু সম্পর্কিত এবং ফলাফল প্রয়োগকৃত (Karl popper: 1959) তা প্রাথমিক তথ্যের আলোকে বিনির্মাণ করার একটি প্রয়াস মাত্র। আন্তঃসাংস্কৃতিক অধ্যয়নে সাধারণ নীতি হলো চলক সমূহকে মাঠ থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্তের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্লেষণ করা। জাতিতাত্ত্বিক অধ্যয়নে তাত্ত্বিক ধারণার উপস্থিতি যেমন ছিল তেমনি সেগুলোর পর্যালোচনা করে বিকল্প তাত্ত্বিক ধারণা তৈরি হয়েছিল (Malinowaski: 1922, Leach and Leach: 1973, Evans Pritchard: 1940, Leach: 1954, Rappaport: 1968)। অতএব তাত্ত্বিক নীতি এবং অভিজ্ঞতার (Empirical) প্রয়োগ দুটোই সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায়, যা নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও। সংস্কৃতি এবং সমাজ যখন তত্ত্বের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় গবেষক নিয়মাতান্ত্রিকভাবে জাতিতাত্ত্বিক তুলনা করে অতীত বা বর্তমান অবস্থার নিরিখে আন্তঃসাংস্কৃতিক, আন্তঃসমাজ এবং আন্তঃঐতিহাসিক সংশ্লেষণ (Syntheses) এর মাধ্যমে সংস্কৃতি ও সমাজ নিরূপণ করতে পারে (Johnson and Earle 1987, Mary Anski and Turner 1992)|

গবেষণার প্রত্যয় সমূহকে বুঝা বা উপলব্ধি করার জন্য Empathic Understanding প্রয়োজন যা ব্যাখ্যাত্বক (Interpretive) ভাবে গবেষণার বিষয়বস্তুকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা। অর্থাৎ Understand the native’s point of view” (Geertz: 1975, 1983) গিঁয়াটজ এর বক্তব্য সমর্থন করে ব্যাখ্যাত্বক নৃবৈজ্ঞানিরা গবেষণার প্রত্যয় সমূহকে পর্যবেক্ষণের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন (Native and emic) ফলে এমিক (Emic) দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন অবস্থার ব্যাখ্যা করে সঠিক ভবিষ্যৎবাণীর দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান

করে (Goodenoguh:1994)। নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্মকে সমালোচনা করে উত্তর আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা জাতিতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র রচনা করেন (Gudeman and Rivera: 1995, Harry Wolcott: 2005, Jackson: 1995, Marilyn Strathern: 2000)| New ethnograph" এ দৃষ্টি ভঙ্গিতে Multivocality, cross-culture communication and text কে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। সমসাময়িক জাতিতাত্ত্বিক বিবরণ গুলোর মধ্যে পরীক্ষা এবং পদ্ধতি, আত্মঘটিত বা প্রবির্তকতা (Reflexivity) সহযোগিতা (Collaboration) বহুবিধ কর্তৃত্ব এবং সম্পূর্ণ মাঠকর্মের সংলাপ ও অভিজ্ঞতার উপাদান থাকতে হবে বলে উত্তর আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা মত প্রদান করেন (Jeffrey and Robben: 2007)। তবে Rojer Berger's : 1993, æFrom text to fieldwork and back again: Theorizing a post modern ethnography" প্রবন্ধে ফুকোর ক্ষমতা এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে মাঠকর্মকে "The production of truth through power" এই তাত্ত্বিক ধারণার মাধ্যমে জাতিতাত্ত্বিক ঘটনাবলীকে প্রয়োগিক ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন যা মাঠকর্মকে প্রাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার আধিপত্য বলে অবহিত করেছেন। অতএব বর্তমান অধ্যয়নে ব্যাখ্যাত্বক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি নৃবিজ্ঞানী গিয়ার্টজ এর তাত্ত্বিক ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারণ নতুন এথনোগ্রাফি রচনায় নিগূঢ় বর্ণনার (Thick description) মধ্য দিয়ে উল্লেখিত নৃগোষ্ঠীগুলোর সমাজের বৈশিষ্ট্য নিখুতভাবে ধরে রাখা সম্ভব যা পরবর্তীতে পূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে তুলনা করতে পারবে। উক্ত গবেষণার মধ্যে দিয়ে তিনটি নৃগোষ্ঠীর সমাজকে নিবিঢ় পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে স্ব স্ব সমাজের বিরাজমান সত্তাকে বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনিভাবে গিয়ার্টজ ও ক্রপেনজানো (১৯৭৩ ও ১৯৮৬) উল্লেখ করেন যে এথনোগ্রাফির লেখাতে অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিক প্রকাশভঙ্গির মুখ্য ধরণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তারা আরো বলেন যে, নৃবিজ্ঞানী মাঠকর্মে টেক্সট (Text) গুলোকে পাঠের মতো অনুশীলন করা যুক্তিসঙ্গত। তাই গিয়ার্টজ তাঁর Writing culture (1986) এ গল্প কাহিনী এবং কর্মসমূহকে নেটিভদের চরিত্রগুলোকে উপন্যাসের ন্যায় রূপায়ন করেন। অতএব, বর্তমান গবেষণায় উত্তর আধুনিকতাবাদীদের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নতুন এথনোগ্রাফির মতে উপন্যাস ধর্মী ও সাহিত্যগুণ সম্পন্ন একটি আন্তঃসংস্কৃতিক তুলনা করে গবেষকের নিজস্ব ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে নানা পরিসরে উপস্থাপন করার প্রয়াস মাত্র, যা বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান চর্চায় এ ধরনের গবেষণা অনুপস্থিত রয়েছে।

যাহোক নৃবিজ্ঞানী Marshall Sahlins জ্ঞাতিসম্পর্কের এমন এক সর্বজন গৃহীত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন যাতে জ্ঞাতি সম্পর্ক বলতে mutuality of being" বুঝিয়েছেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি দুইটা বিষয় দেখিয়েছেন। ক) জ্ঞাতিজন হল এমন সব ব্যক্তি যারা একে অপরের অংশ এবং তারা এমন এক সম্পর্কের জালে

বসবাস করে যেটা একটি দেহের মত কাজ করে যেখানে একজনের কিছু হলে অন্যরা অনুভব করে। খ) mutuality of being আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতিক যা রক্তের দ্বারা তৈরি হওয়া শুধুমাত্র কোন জৈবিক সম্পর্ক নয়। একই নামের ভিত্তিতে অথবা একই খাদ্য ভাগাভাগি করে খাওয়ার মাধ্যমে জন্মগত সম্পর্ক ছাড়াও মানুষ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তিনি যুক্তি প্রদান করেন- কোন সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্ক জন্মের (জৈবিক) ধারায় নির্ধারিত হওয়ার পিছনে কারণ হল পূর্বপুরুষরা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রজনন কার্যে যুক্ত ছিল। এর ফলে জ্ঞাতি সম্পর্ক জন্মের (জৈবিক) উপর নির্ভর করেনা বরং জন্মের (জৈবিক) ধারণাটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে জ্ঞাতি সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে শাহলিন এর অন্যতম দাবী হল- জ্ঞাতি সম্পর্ক প্রাকৃতিক নয় বরং সাংস্কৃতিক বিষয়।

জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যায়নের ৪ টি ঐতিহাসিক মডেলের কথা উল্লেখ করেন ফার্বার। এগুলো হল- The Parentela Orders Model, The Civil Law Model, The Canon Law Model, The Genetic Model। তিনি নির্দেশ করেন এই ৫ টি মডেল শুধুমাত্র উত্তরাধিকার নিরুপনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক না বরং জ্ঞাতিসম্পর্কের গঠন উপলব্দিতে বেশ গুরত্বপূর্ণ। Parentela Orders Model আত্মীয়দের শ্রেণিবদ্ধ করে Parentela অনুসারে যার অর্থ হচ্ছে কোন জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে উঠে পূর্ব-পুরুষ+বংশধরদের মাধ্যমে। অপরদিকে The Civil Law ব্যক্তিদের মধ্যে বংশগত সম্পর্কের যোগসূত্রের সংখ্যা গণনা করার মাধ্যমে জ্ঞাতিসম্পর্ক নির্ধারণ করে। ফার্বার এর জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নের অন্যতম কেন্দ্রীয় ধারণা হচ্ছে জ্ঞাতিসম্পর্ক Centripetal অথবা Centrifugal হতে পারে। পরে বৈজ্ঞানিক তথ্যের মাধ্যমে দেখানো হয় যে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণা বিভিন্ন ধরনের সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে সমাজ কাঠামোর আলোচনা জ্ঞাতিসম্পর্কসহ আরো অনেক সামাজিক সংগঠনের পর্যালোচনায় গুরত্বপূর্ণ। জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ক ফার্বার এর তাত্ত্বিক আলোচনা শুধুমাত্র নৃবিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ নয় বরং সমাজবিজ্ঞানের, আইন, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তার অন্যতম অবদান হল জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র রচনা করেছেন। জ্ঞাতিসম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলক বিশ্লেষণ কোন সংস্কৃতিকে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে।

জ্ঞাতিসম্পর্ক আলোচনায় Schneider বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তার Doctrine of the Primacy of Cultural Symbols and Meanings ধারণার জন্য। Schneider নৃবিজ্ঞানের আলোচনাকে Ethnocentrism বলে আখ্যায়িত করেন পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের Blood Is Thicker Than Water ধারণার জন্য। Schneider এর যুক্তি ২ টি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত- ক) ইয়াপসিরা বিশ্বাস করেনা যে গর্ভবতী হওয়ার জন্য শারীরিক মিলন দরকারি, খ)

পিতা-সন্তান সম্পর্ক জৈবিকভাবে বিবেচনা করা হয়না। কিছু বিষয়ের ফলে তার যুক্তি অনেকাংশে বাতিল বলে পরিগণিত হয়- ক) কোন সন্তানের সাথে কোন পুরুষের চেহারার সাদৃস্য দেখে ইয়াপসি মহিলারা গল্পের ছলে বলাবলি করে কোন সন্তানের বাবা কে ও কার সন্তান কে এবং ধারণা করে ঐ সন্তানের মায়ের সাথে ঐ পুরুষের দৈহিক মিলন হয়েছে। Doctrine of the Genealogical Unity of Mankind কে বাদ দেয়ার জন্য তিনি Doctrine of the Primacy of Cultural Symbols and Meanings প্রস্তাব করেন। এই ধরণের বিভেদ ও মেরুকরণ অনেকটা সাংস্কৃতিক চিন্তার মেরুকরণের মত, যেমন - Materialism vs. Mentalism, Conservatism vs. Liberalism, Determinism vs. Free Will ইত্যাদি।

সুনির্দিষ্টভাবে, বর্তমান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে Claude Lévi-Strauss এর Alliance Theory ব্যবহার করা হয়েছে। Lévi-Strauss তার Elementary Structures of Kinship (1949) এ তত্ত্ব প্রদান করেন। তার এ তত্ত্ব জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। অজাচার হল এ তত্ত্বের মূল ভিত্তি। এ তত্ত্বের নিরিখে পরিবার ও সম্পর্ককে সমাজ গঠনের মৌল উপাদান হিসাবে ধরা হয়। যে সব সম্পর্ক সমাজ গঠন করে সেসবের গভীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে Alliance Theory (মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব) বেশ কার্যকর। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয় যা পারস্পরিক নির্ভরতা সৃষ্টি করে। এই নির্ভরতা ও সামাজিক সম্পর্ক সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। বর্তমান গবেষণায় ক্ষেত্রে Alliance Theory (মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব) এর মাধ্যমে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজে রক্তের বন্ধনের পাশাপাশি জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ ও পরিবার গঠনের গুরুত্ত্ব দেখা হয়েছে।

Alliance Theory ছাড়াও Descent Theory (বংশ তত্ত্ব) ব্যবহার করা হয়েছে। এ তত্ত্বটি অনেকের কাজের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হল এভান্স প্রিচার্ড, ও মেয়ার ফোর্টিজ। এভান্স প্রিচার্ড এর The Nuer (1940) গ্রন্থে এই তত্ত্বের আবির্ভাব দেখা যায়। একইভাবে মেয়ার ফোর্টিজ এর African Political Systems (1940) গ্রন্থে এই তত্ত্বের মূল উপাদানগুলো উন্নত লাভ করে। Descent Theory এর মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরন ও নেটওয়ার্ক। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল সমাজে পূর্বপুরুষের সাথে একজনের সম্পর্ক। এই তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল কিভাবে জ্ঞাতিসম্পর্কের পরিমাপ মাত্রা সমাজ থেকে সমাজ ভিন্ন হয়। ফলে দেখা যায় এই বংশধারা রীতির কারণে সমাজে একে অন্যের জ্ঞাতিতে পরিণত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

নৃগোষ্ঠীসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৪.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনযাত্রায় বৈচিত্র এবং ভিন্নতা দৃশ্যমান। আবহমানকাল থেকে এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহসহ সংস্কৃতি, চিন্তা-ভাবনা এবং সর্বোপরি নিজস্ব জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছে। দুর্গম পার্বত্য এলাকার পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দন নয়নাভিরাম পাহাড়ি সৌন্দর্য্য এই এলাকার সামাজিক জীবনকে করেছে প্রাচুর্যময়, গ্রাম বাংলার অন্যান্য অংশ থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে করেছে পৃথক। পাহাড়ের গাম্ভীর্যতা এই নৃগোষ্ঠীসমূহের মনকে করেছে সরল, গরল পাহাড়ি দুর্গম সড়ক-দ্বারের ন্যায় জীবন-জীবিকা এখানে অনেক কঠিন, বৈশ্বিক পুঁজিবাদী আগ্রাসন ঐতিহ্যবাহী সয়ংভূত বদ্ধ সমাজকে বাজার নির্ভর করে তুলেছে, বিশ্বায়নের কালো থাবা প্রতিনিয়ত বহির্ভুত জৌলুশ ভোগের জন্য মনকে অভিগামী করে তুলেছে। স্রোতের বিপরীতে যে সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান তার মধ্যে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী রয়েছে। বর্তমান গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে আন্তঃসাংস্কৃতিক, emic এবং গিয়ার্টজ এর নিগুঢ় বর্ণনার (Thick Description) পরিপ্রেক্ষিতে শুরুতে দাবী করা যায়যে- এ তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভর করে।

৪.২ চাকমা

৪.২.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমা সম্প্রদায় সর্ববৃহৎ। বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর পরই চাকমা সম্প্রদায়ের অবস্থান। বাংলাদেশকে বহু-সংস্কৃতির দেশে রুপান্তরিত করার ক্ষেত্রে চাকমা সমাজ-সংস্কৃতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। চাকমা সমাজের লোকেরা নিজেদেরকে বলে চাঙমা। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নৃগোষ্ঠীর লোকেরা চাকমাদেরকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল বা তিন পার্বত্য জেলা তথা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি জেলায় চাকমা সম্প্রদায় বসবাস করে। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটি জেলায় বেশি সংখ্যাক চাকমা জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকার কারণে এখান থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে চাকমারা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে খুব গতিশীল। বর্তমানে জীবন জীবিকার কারণে সারা দেশে চাকমা সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। এছাড়া বিশ্বসম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় এবং নানাবিধ অধিকার আদায়ে এই সম্প্রদায় প্রাগ্রসর।

চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক *গুথি* বা গোত্র এবং *গঝা* বা গোষ্ঠী রয়েছে। এই সংখ্যা ৩২ টির মত হবে। চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। চাকমারা গ্রামকে *আদাম* এবং গ্রামের প্রধানকে কারবারি বলে। এ সমাজে পূর্বে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যেখানে গর্ভবতী মহিলাকে নিজের স্বামীর ঘরে বা স্বামীর গোষ্ঠীর ঘরে সন্তান প্রসব করতে হত। এখন ঐ নিয়ম নেই। পূর্বে *ওঝারাই* নামক ধাত্রী গর্ভবতী নারীদের সন্তান প্রসব করাতেন। চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাত শিশুর নাভি (ন্যেয়) ছিড়ে যাওয়ার পর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে *কোজই* পানি *লনা* নামক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ওঝা ডেকে ঘিলে *কোজোই* (পরিশুদ্ধ) পানি দিয়ে নবজাত শিশুর চুল ধুয়ে পবিত্র করা হয়। *কোজই* পানি লনা অনুষ্ঠানে সীমিত আকারে ঘনিষ্ঠ গন্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়। *ওঝারাইয়ের* মাধ্যমে সন্তান প্রসব হলে উক্ত অনুষ্ঠানে ওঝাকে পুরুষ্কৃত করা হয়। চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ তাদের সার্কেলের প্রধানকে রাজা বলে। রাজা তাদের প্রথা, রীতি, নীতি, ভূমি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, পার্বত্য জেলা পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেয়া, কারবারি নিয়োগ, হেডম্যান নিয়োগের মত কাজ করে থাকে। গ্রামের কারবারি যাবতীয় ঝগড়া, নানা সমস্যার নিস্পত্তি করে থাকেন। হেডম্যানরা অনেক কাজ করলে ও মূল কাজ খাজনা তোলা। আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতিতে চাকমারা নেতৃত্বধর্মী ভূমিকা পালন করে আসছে তৎকালীন বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমল থেকেই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ঠ্যের আলোকে তৎকালীন সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন এবং তাঁর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্নভাষাভাষী জুম্ম জনগোষ্ঠীর আন্দোলন গড়ে গঠে (মোহসিন ২০০০)। অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মত চাকমাদের ও আঞ্চলিক এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে ৫টি সাধারণ এবং ১টি মহিলা আসন চাকমাদের মধ্যে সংরক্ষতি রয়েছে। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাক্রমে ১০টি, ৯টি ও ১টি আসন সংরক্ষিত আছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে চাকমাদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালনের নজির লক্ষ্য করা যায়। তিন পার্বত্য জেলায় পৌরসভাগুলোতেও চাকমা জনগোষ্ঠী থেকে অনেকে চেয়ারম্যান পদে এবং কমিশনার পদে নির্বাচিত হয়েছে (জাহান ২০১৬)।

চাকমাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সাম্যক ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে খানা জরিপ চালানো হয় যা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিচে প্রদান করা হল-

সারণী ৪.১ঃ চাকমা খানার বার্ষিক আয়

বার্ষিক আয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতকরা
১০০০০০-১৪৯০০০	৫	১৬.৬
১৫০০০০-১৯৯০০০	৬	২০.০
২০০০০০-২৪৯০০০	২	৬.৬
২৫০০০০-২৯৯০০০	৭	২৩.৩
৩০০০০০-৩৪৯০০০	৩	১০.০
৩৫০০০০ থেকে বেশি	৭	২৩.৩
মোট	৩০	১০০

গড় আয় ২৭০২৩৯.৩০ টাকা (উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৪.২ঃ চাকমা খানার বার্ষিক ব্যয়

বার্ষিক ব্যয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতাংশ
১০০০০০-১৪৯০০০	৭	২৩.৩
১৫০০০০-১৯৯০০০	৫	১৬.৬
২০০০০০-২৪৯০০০	৬	২০.০
২৫০০০০-২৯৯০০০	৫	১৬.৬
৩০০০০০-৩৪৯০০০	৪	১৩.৩
৩৫০০০০ থেকে বেশি	৩	১০.০
মোট	৩০	১০০

বার্ষিক গড় ব্যয় ২১৬৪২৮.৯৬ টাকা (উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৪.১ ও ৪.২-এ চাকমা খানার বার্ষিক আয় ও ব্যয় দেখানো হয়েছে। সারণী ৪.১ এ দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক খানার আয় আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষের মধ্যে। আবার সম সংখ্যক খানার আয় সাড়ে তিন লক্ষের উপরে। সারণী ৪.২ এ দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক খানার বার্ষিক ব্যয় এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষের মধ্যে। চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যকের ব্যয় দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টাকার মধ্যে। এই সম্প্রদায়ের সব চেয়ে কম সংখ্যকের বার্ষিক ব্যয় সাড়ে তিন লক্ষের উপরে। দেখা যায় চাকমাদের বাৎসরিক গড় আয় ২৭০২৩৯

টাকা যেখানে বাৎসরিক গড় ব্যয় ২১৬৪২৮ টাকা। চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বনিম্ন বাৎসরিক আয় ও ব্যয় হল যথাক্রমে ১২০০০০ টাকা ও ১০০০০০ টাকা। কোন চাকমা খানার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বাৎসরিক আয় হল ৬৫০০০০ টাকা ও সর্বোচ্চ বাৎসরিক ব্যয় হল ৩৯৬০০০ টাকা।

৪.২.২ জীবন-জীবিকা

ভেড়ভেড়ি গ্রামের চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা হল কৃষি কাজ যা জুমের উপর নির্ভর করে। চাকমাদের জীবন যাত্রার সাথে জড়িত হয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ। এটা শুধুমাত্র জীবিকা অন্বেষণের কৌশল নয় বরং বণ্য পরিবেশে টিকে থাকার উপায়ও বটে। জুমের সাথে চাকমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ একই সুতোই গাথা। ঐতিহ্যগতভাবে চাকমা জীবনধারা জুম বা জায়গা বদল চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে রাঙ্গামাটি জেলায় কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে অনেক আবাদী ভূমি পানির নিচে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার ফলে চাকমাদের ঐতিহ্যগত জুম চাষ হুমকির মুখে পড়ে বলে অনেক চাকমা অভিমত ব্যক্ত করেন। জুমের জন্য স্থায়ীভাবে গ্রামের অধিবাসী চাকমারা তাদের আশপাশের পাহাড়ে কয়েক বছরের জন্য জমি চাষ করে, তারপর ওই জমি তারা ফেলে রাখে পুনরায় উর্বর ও আবাদযোগ্য হয়ে ওঠার অপেক্ষায়। সমতলবাসীদের সঙ্গে চাকমাদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন পর্যবেক্ষকদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাষিদের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল (চাকমা ২০১৭)। সেখানে তখন ধান, তুলা ও সবজি উৎপন্ন হতো। বাঁশ ছিল অত্যন্ত জরুরি নির্মাণসামগ্রী। অন্যান্য কাজেও বাঁশের ব্যবহার এত বেশি ও বিচিত্র যে চাকমাদের জীবনধারাকে বাঁশের সভ্যতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিবেশিক আমলে শিক্ষা লাভ করে ও সরকারি রাজস্বের একটা অংশ বিশেষে পুষ্ট হয়ে চাকমা সমাজ ক্রমেই বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত হয়ে ওঠে ও তাদের মধ্যে একটি অভিজাত শ্রেণির সৃষ্টি হয় (চাকমা ১৯৯৮)। বিশ শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাহাড়ি চাষাবাদ সমস্যাগ্রস্ত হয়। এর প্রধান কারণ, তখন থেকে জুমচাষে মধ্যবর্তী যে মেয়াদটিতে জমি স্বাভাবিক কারণে পতিত রাখতে হয় সেটা কমিয়ে আনতে হয় (চাকমা ২০০১)। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চাকমাদেরকে আরও বেশি করে কৃষি-বহির্ভূত কাজ খুঁজে নিতে হয়। এ সমস্যা সরকারের জনসমষ্টি স্থানান্তরের নীতির কারণে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এতে জমির অভাব আরও তীব্রভাবে বেড়ে যাওয়ায় চাকমা জনগোষ্ঠী এ ঘটনাটিকে তাদের জীবনধারার জন্য আরও বিপজ্জনক বলে গণ্য করে। এদের অনেকে কম মজুরে পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়, অনেকে নতুন রাবার বাগানগুলিতে শ্রমিকের কাজ খুঁজে নেয়।

জুম চাষের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবদান সমান বলা চলে। পরিবারের নারী সদস্য জুম চাষে সর্বত্র সহযোগিতা প্রদান করে। জুমের আগাছা পরিস্কার করে শস্য চিটানো, ফসল থেকে আগাছা পরিষ্কার, ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণে

মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা রাখে। বলা চলে চাকমা মেয়েরা অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় অনেক পরিশ্রমী। নিজের স্বামীর উপর নির্ভর না থেকে নিজেই পরিশ্রম করে বিভিন্নভাবে পরিবারে আয় করে থাকেন। *পিনোন- কাদি* হল চাকমা মেয়েদের অন্যতম পোশাক। আর এ *পিনোন কাদি* বুননে চাকমা মেয়েরা অনেক পারদর্শী। *পিনোন-কাদি* তৈরি করে চাকমা মেয়েরা পরিবারে অর্থ যোগান দেয়। এমনকি মেয়েদের চাদর, ব্যাগ, শীত পোশাক ও বয়ন শিল্পেও চাকমা রমণীদের খ্যাতি সমৃদ্ধ। খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চাকমা নৃগোষ্ঠীর পেশাভিত্তিক পরিচয় সারণী ৪.৩-এ প্রদান করা হল-

সারণী ৪.৩ঃ পেশাভিত্তিক পরিচয়

পেশা	গণসংখ্যা	শতকরা
কৃষি (নিজ জমি)	১০	৩৩.৩
বর্গা চাষি	১	৩.৩
কৃষি শ্রমিক	১	৩.৩
অকৃষি শ্রমিক	১	৩.৩
মোটর চালক	৩	১০.০
সরকারি-বেসরাকারি চাকুরিজীবী	১	৩.৩
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৩	১০.০
গৃহিণী	৪	১৩.৩
ছাত্র	৬	২০.০
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় ৩৩.৩ শতাংশ চাকমা নিজের জমিতে কৃষি কাজ করে, ৩.৩ শতাংশ অন্যের অধিভূত জমিতে কাজ করে, ৩.৩ শতাংশ কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে, ৩.৩ শতাংশ অকৃষি শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে, ১০.০ শতাংশ মোটরযান চালায়, ৩.৩ শতাংশ সরকারি-বেসরকারি চাকুরি করে, ১০.০ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসা করে, ১৩.৩ শতাংশ মহিলা উত্তরদাতা গৃহিণী, এবং ছাত্র-ছাত্রী হচ্ছে ২০.০ শতাংশ।

রাঙ্গামাটি জেলায় কাপ্তাই বাধ নির্মাণের ফলে চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী জীবন জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে অনেক চাকমা পাশের জেলায়-উপজেলায় কায়িক শ্রমিক হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে চাকমাদের মধ্যে অনেক চাকরিজীবি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফরেষ্ট ভিলেজার, মৎস্যজীবি রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের অনেক চাকমা রাঙ্গামাটি শহরে হোটেল-মোটেল এ কাজ করার পাশাপাশি ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। দিন মজুর তথা খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যা অধিক চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে। ফলে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্তরায়িত সমাজ পরিলক্ষিত হচ্ছে যারা প্রভাবশালী ও অনেক সম্পদের মালিক। রাঙ্গামাটি জেলার চাকমাদের মধ্যে এই শ্রেণী ক্ষমতা কর্তৃত্ব চর্চা করে।

৪.২.৩ সংস্কৃতি

নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান গবেষণায় বিষয়বস্তুর সুনির্দিষ্টতার জন্য সংস্কৃতির কিছু কিছু দিক নিয়ে গুনবাচক আলোচনা করা হয়েছে। যেমন চাকমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, লোক সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়। চাকমা সমাজে কোন প্রসূতি সন্তান প্রসব করলে আত্মীয়রা ভাত, মাংস, মাছ, শুঁটকি, ডিম, নানা তরকারি কলাপাতায় মুড়িয়ে দেয় যাতে প্রসূতি, নবজাতকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এই প্রথাকে *ভাত মঝা দেনা* বলে। তারা বিজু উৎসব ৩ দিন ধরে পালন করে। যা ফুল বিজু, মুল বিজু এবং নুতন বছরের *গোজ্যাপোজ্যা* দিন হিসেবে পরিচিত। বিজুর দিন শিশু, কিশোর, তরুণ বয়সীরা বন থেকে ফুল এনে বাড়ি সাজায়। বুদ্ধের উদ্দেশ্যে ফুল দেয়, সকাল বেলায় বিভিন্ন বাড়িতে গৃহপালিত প্রাণীদেরকে ফুল দেয়। মুল বিজুতে ঘরে ঘরে বিশেষ খাবার রান্না করা হয়। ঐতিহ্যবাহী পিঠা, তাজা ফলমুল, বিভিন্ন সেদ্ধ আলুসহ, মদ ইত্যাদি। বিশেষ ৫ ধরনের সবজি দিয়ে পাজন তৈরি করা হয়। অনেক সময় ১০০ পদেরও বেশী সবজি দিয়ে শুঁটকি বা শুকনো মাছ মিশ্রিত করে *পাজন* তৈরি হয়। অবশ্য বর্তমানে শহরাঞ্চলে বাঙ্গালীদের মত আধুনিক খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। এই দিন ঘরের বৃদ্ধদেরকে যুবা বয়সীরা গোসল করায়। সন্ধ্যায় মোমবাতি প্রজ্বলিত করে নদীকে পূজা করা হয়। তারপর সবাই বিশেষ করে শিশুরা নতুন জামা-কাপড় পরে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে থাকে। তবে গ্রাম গুলোতে প্রাচীনকালের মতো করে "ঘিলে হারা" (খেলা) হয়। পরের দিন নতুন বছর বা গয্যে পয্যে, নতুন বছরের দিন সবাই মন্দিরে যায়, খাবার দান করে, ভালো কাজ করে, বৃদ্ধদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেয়। এই দিন মুলত পুরোনো বছরের ময়লা আবর্জনা মুছে পুত পবিত্রতার প্রতীক। *গোজ্যাপোজ্যার* দিন বাড়িতে ভিক্ষুদের আমন্ত্রন করে মঙ্গলসূত্র শোনে, *কিয়াঙে* বা উপাসনালয়ে যায়, বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। রাজপুণ্যা হতে চাকমা রাজা নিজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এটি একটি গণ-অনুষ্ঠান তখন হেডম্যানরা তাদের রাজার কাছে কর প্রদান করেন।

এই দিন মেলা বসে, বিনোদনমূলক, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হয়, সাধারন মানুষের জন্য বিশেষ খাবার দাবারের ব্যবস্থা থাকে। পূর্বে চাকমারা এই অনুষ্ঠানটি খুব জাকজমকের সাথে পালন করত। চাকমা সমাজে নারীদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের হার পুরুষের চেয়ে কম। ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

চাকমারা তৈজসপত্র হিসেবে কাঠ, বাঁশ পাকা ফলমুলের জিনিস ব্যবহার করে। এছাড়া (হুক্কা) *দাবা, ফুনি, কুলো, বিজোন, মজরার* মত তৈজসপত্র ব্যবহার করে। কলাপাতা বা আগুনে পুড়িয়ে যে তরকারি তারা খায় তা *কেবাং*। বাঁশ দিয়ে রান্না করা খাদ্যকে তারা *গরাঙ* বলে। প্রচুর মরিচ, পেয়াঁজ, শুঁটকি মিশ্রিত খাবারকে তারা *কোরবো* বলে। তারা শুটঁকি, চিংড়ি মাছ খুব পছন্দ করে। *ফুজি* নামক একপ্রকার মশলা তাদের খুব পছন্দ। *সিক্যা* হচ্ছে লবন মরিচ হলুদ মিশিয়ে বিভিন্ন মাংসখন্ড আগুনে সেকেঁ খাওয়া যা তারা খায়। চাকমারা কোমর জড়ানো গোড়ালি পর্যন্ত পোশাক পরে যাকে *পিনোন* বলা হয়। কোমরের উপর অংশকে বলা হয় *হাদি। হাদি* আর *পিনোন* সাধারণত রঙবেরঙের বিভিন্ন নকশার হয়। এই নকশা প্রথমে *আলাম* নামে পরিচিত এক টুকরা কাপড়ের উপর সেলাই করা হয়।

৪.২.৪ ভাষা

চাকমারা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বতন্ত্রের দাবিদার। যদিও এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে, চাকমারা এক ধরনের তিববতি-বর্মি ভাষায় কথা বলত, তবে তাদের বর্তমান ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়। এখনকার চট্টগ্রামের বাংলা বুলির নির্মিতিগত কাঠামোর সঙ্গে চাকমাদের ভাষার নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। তবে একান্ত আলাদা ধরনের কিছু শব্দসম্ভারের কারণে চাকমাদের ভাষা চট্টগ্রামের সমতলের বিশেষ ধরনের বাংলা থেকে স্বতন্ত্র। অধিকাংশ চাকমাই দ্বি-ভাষিক। চাকমা ও বাংলা ভাষায় তারা কথা বলতে পারে। অনেকে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাতেও কথা বলতে সক্ষম। চাকমা ভাষার নিজস্ব লিপি থাকলেও এ লিপি আজকাল আর ব্যবহার করা হয় না। চাকমা ভাষা এখন সাধারণত বাংলা লিপিতেই লেখা হয়। *গেংখুলি* গায়কদের ঐতিহ্যিক কণ্ঠস্থ বুলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাহিত্যপত্র (যার প্রথম সূচনা হয় ১৯৩৬-এ গৈরিকা-র প্রকাশের মাধ্যমে) ও আধুনিক কবিতার মধ্য দিয়ে চাকমা সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত। আরও যে একটি আধুনিক শিল্প আঙ্গিকে চাকমারা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তা হলো চিত্রাঙ্কন কলা।

৪.২.৫ ধর্ম

চাকমাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তারাই বাংলাদেশের বৃহত্তম বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী। তাদের বৌদ্ধ ধর্মরীতি ও আচারের সঙ্গে আরও প্রাচীন কিছু ধর্মীয় উপাদান যেমন, প্রাকৃতিক শক্তিপূজার মতো বিষয়ের যৌথ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে চাকমাদের মধ্যে ধর্মান্তর হয়ে খৃষ্টান হওয়ার প্রবনতা রয়েছে। এর ফলে তাদের প্রথাগত ধর্ম হুমকির সম্মুখিন। চাকমাদের অন্যতম প্রধান ও লক্ষ্যগোচর বার্ষিক পর্ব হলো বিজু উৎসব। সংস্কৃতিগত দিক থেকে চাকমারা যতো না দক্ষিণ এশীয় তার চেয়েও বেশি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়। তাদের খাদ্যবস্তুতে কোনো বিধিনিষেধ নেই, তাদের সমাজে প্রতিবেশী বাঙালিদের মতো নারী-পুরুষের কড়াকড়ি পৃথকীকরণের বিষয়টিও নেই (শেন্ডেল ১৭৯৮)। চাকমা সমাজে কারো মৃত্যু হলে বিশেষ ঢোল বাজায় যাতে মানুষ বোঝে কেউ মারা গেছে। গৃহস্থেরা খবর নেয়, গৃহিনীরা গৃহের সদর দরজায় মাটির বারকোষ বা অন্য পাত্রে তুষ দিয়ে আগুন জালিয়ে রাখে। যাতে ভুতপ্রেত না আসে। শবদাহের দিন মরদেহ স্নান করানো হয়, মঙ্গলসূত্র পাঠ করা হয়। ঘাট পারের বাড়া হিসেবে মৃতের সাথে টাকা পয়সা দিয়ে দেয়া হয়। মৃতদেহটি পুরুষ হলে শব রাখার আলোংঘর সহ চিতার চারিদিকে ৫বার ও শবদেহটি মহিলার হলে চিতার চারিদিকে ৭বার ঘোরানো হয়। পরে মৃত্যের বড়ছেলে বা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় প্রথম চিতায় আগুন দেয়।

৪.২.৬ ঘরবাড়ির ধরণ ও মালিকানা

ছোট ছোট নদীর তীরে অথবা কম উঁচু পাহাড়ের ওপর খোলামেলা জায়গায় চাকমা গ্রামগুলো অবস্থিত। ঘরগুলো কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত বিধায় ঘরে উঠার জন্য মাটি কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়। তবে আধুনিক প্রযুক্তির হাওয়া লেগেছে চাকমা গ্রামগুলোতে। পূর্বের ঘরবাড়ির সাথে বর্তমানের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাশ কাঠের পরিবর্তে বর্তমানে ইমারতের ঘর দেখা যায়। চাকমা পল্লী গুচ্ছ গ্রামের মত। ঐতিহ্যগতভাবে চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা একসাথে বসবাস করে আসছে। এদের কেউ কেউ শক্ত গাছের ওপর কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মাচাঘর বানায়। মাচাঘরের ওঠার জন্য সিঁড়ি থাকে। মাচাঘরের সামনে জলের পাত্র রাখার জন্য একটি খোলা ছোট মাচা থাকে। একে '*ইজর*' বলে।

খানাজরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চাকমাদের ঘরের ধরণ নিম্নরুপ-

সারণী ৪.৪ঃ ঘরের ধরণ

ঘরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
বিল্ডিং	৫	১৬.৭%
টিন শেড় (পাকা/সেমি পাকা ওয়াল)	৫	১৬.৭%
টিন শেড় (টিন দিয়ে ঘেরা)	১২	৪০.০%
টিন শেড় (মাটি, কাঠের বেড়া)	৭	২৩.৩%
কুঁড়ে ঘর	১	৩.৩%
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

উপরের ৪.৪ নং সারণীতে দেখা যায় ১৬.৭ শতাংশের মত চাকমা অধিবাসীর ঘর সিমেন্ট-রড় তথা ইমারতের তৈরি, আর ১৬.৭ শতাংশের মত চাকমার ঘরের ছাদ টিনের তৈরি যার মেঝে পাকা করা ও দেয়াল আধা পাকা। অন্যদিকে দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণের ঘর পুরোপুরি টিনের তৈরি, অর্থাৎ ঘরের ছাদ ও ছারিদিক টিনের তৈরি। ২৩.৩ শতাংশের ঘরের ছাদ টিনের তৈরি হলেও দেয়াল বাঁশের তৈরি যেখানে ৩.৩ শতাংশের ঘর শুধুই ছাউনি দেয়া।

ছবি ৪.১ঃ চাকমা ঘরের ধরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির মালিকানা একটি বিতর্কিত বিষয়। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাপ-দাদার আমল থেকে বসবাস করে আসছে এবং ভূমি ব্যবহার করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের কাছে ভূমি মালিকানা পদ্ধতি হচ্ছে সামাজিক মালিকানা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ-সরল। মৌজা অধীন সমস্ত জমিজমা এবং বনভূমি ও বনজ সম্পদ মৌজাবাসীর সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মৌজা পদ্ধতির ব্যবস্থাপনায় এই সম্পদ মৌজাবাসী একাধারে যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে ভোগদখল করে থাকে। মৌজা এলাকায় অবস্থিত বনভূমি ও বনজ সম্পদ গৃহস্থলির প্রয়োজনে যে কেউ আহরণ ও ব্যবহার করতে পারে। অন্যদিকে কোন একটা জমিতে বা পাহাড়ে কেউ একবার জুম বা অন্য কোন চাষ করলে উক্ত জমির উপর ঐ ভোগদখলকারীর ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া কেউ জুম চাষ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে দখল করতে পারে না এটাই হচ্ছে যুগ যুগ প্রচলিত প্রথাগত নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে দেশে প্রচলিত দন্ডনীয় অপরাধের মতো আইন লজ্ঘনের সামিল বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফলে এর ব্যতিক্রম কেউ করে না বা ভঙ্গ করার প্রশ্নই উঠে না এবং জায়গা-জমির বন্দোবস্তীর প্রয়োজনও পড়ে না। আজকের যুগে দেশে প্রচলিত বন্দোবস্তীকরণের যে জটিল আইনানুগ ব্যবস্থাপনা চলছে তা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমাজে ভূমি ব্যবস্থপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো নয়ই, উপরন্তু এসব জনগোষ্ঠীর ভূমি সম্পর্কে ধারণার সাথে সম্পূর্ণভাবে বিরোধাত্মক বটে (চাকমা ২০০৫)।

ফলে দেখা যায় এই অধিবাসীদের কাছে ভূমির ব্যবহার স্বত্ব থাকলেও লিখিত কোন দলিল ছিলনা। জমির যে লিখিত দলিল দরকার হয় তাও এদের অধিকাংশের কাছে ছিল অজানা। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে বাড়ির মালিকানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে জটিলতা তৈরি হয়। তারা কি ভূমিহীন নাকি ভূমির মালিক? এর উত্তর পাওয়া যায় কিছু স্থানীয় অধিবাসির সাথে কথা বলে (প্রধান তথ্যদাতা)। বর্তমানে অনেকের জমির মালিকানা স্বত্বের প্রমান স্বরুপ দলিল আছে। অথবা কারবারি/ হেডম্যান কর্তৃক প্রদানকৃত জমির অধিকারস্বত্ব আছে। এই দুয়ের ভিত্তিতে মালিকানার বিষয়টি নৃবৈজ্ঞানিক এমিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মীমাংসা করা হয়।

সারণী ৪.৫ঃ বাড়ির মালিকানা

বাড়ির মালিকানা	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজের জমিতে নিজের বাড়ি	২৮	৯৩.৩
সরকারি বাড়ি	২	৬.৭
	মোট= ৩০	মোট=১০০

খানাজরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়যে ৯৩.৩ শতাংশ চাকমার নিজের জমিতে নিজের বাড়ি রয়েছে (সারণী ৪.৫)। অথবা বাবা-দাদার বাড়ি তথা পৈত্রিক সম্পত্তিতে নিজেরা বসবাস করে। এদের অনেকের ভোগদখলের মালিকানা আছে বা কারো কারো দলিল আছে। ৬.৭ শতাংশের মত চাকমা অধিবাসী সরকারি বাসায় থাকেন। এখানে কিছু বিষয় লক্ষণীয় যে অন্যের জমিতে উত্তরদাতা চাকমাদের বসবাস যেমনটি নেই তেমনি খাস জমিতে এদের বসবাস নেই। বলা যায় রাঙ্গামাটি জেলার চাকমারা নিজের জমিতে বসবাস করে। এই মালিকানা কতটুকু যথার্থ সে বিষয়ে নৃবৈজ্ঞানিক গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

৪.২.৭ শিক্ষা

গত কয়েক দশকে চাকমা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বেড়েছে (চাকমা ২০১৬)। এর ফলে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। শিক্ষিত হওয়ার কারণে এই জনগোষ্ঠীর মানুষজন এখন জুমচাষ ছাড়াও নানা পেশায় যুক্ত হচ্ছেন। বিনিয়োগ করছেন ব্যবসা-বাণিজ্যেও। সুগত চাকমা মনে করেন (২০১৬) শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিগত কয়েক দশকে চাকমাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এ জনগোষ্ঠীর লোকজন মূলত কৃষিজীবী হলেও শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে সনাতন পদ্ধতি ছেড়ে এখন অনেকেই আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন। দেখা গেছে, কোনো কোনো চাকমা গ্রামের শতকরা ৪০ ভাগ লোক শিক্ষিত (প্রাগুক্ত)। আবার কোথাও এই হার এর দ্বিগুণ। শিক্ষিত চাকমাদের বিরাট অংশ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায়, ব্যাংকে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা পদে চাকরি করছেন। তবে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার হারে তারতম্য থাকার কারণে আয় বৈষম্য বাড়ছে। শান্তিচুক্তির পর পাহাড়ে রাজনৈতিক ভেদাভেদ ও সংঘাতের কারণে চাকমা জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে চাকমা জনগোষ্ঠীর ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এখন এগিয়ে (বড়ুয়া ২০১৬)। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে খানাজরিপের মাধ্যমে মৌলিক চলক হিসাবে চাকমাদের পেশা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এর ফলে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ-

সারণী ৪.৬ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতাংশ
লিখতে ও পড়তে জানেন	১	৩.৩
১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী	৪	১৩.৩
মাধ্যমিক পাস	৬	২০.০
নিম্ন মাধ্যমিক পাস	৬	২০.০
এসএসসি পাস	৩	১০.০
এইচএসসি পাস	৮	২৬.৭
স্নাতক পাস	১	৩.৩
স্নাতকোত্তর পাস	১	৩.৩
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

উপরের ৪.৬ সারণীতে দেখা যায় চাকমা উত্তরদাতাদের মধ্যে সবার স্বাক্ষরজ্ঞান আছে। উত্তরদাতা চাকমাদের মধ্যে কোন নিরক্ষর ব্যক্তি নেই। ৩.৩ শতাংশ চাকমা পড়তে ও লিখতে পারেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১ম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাস করেছেন ১৩.৩ শতাংশ। পঞ্চম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পাস করেছেন ২০.০ শতাংশ। নিম্ন মাধ্যমিক পাস করেছেন ২০.০ শতাংশ উত্তরদাতা চাকমা যেখানে ১০.০ শতাংশ পাস করেছেন এসএসসি। সর্বোচ্চ সংখ্যক চাকমা এইচএসসি পাস করেছেন। স্নাতক ও স্নাতোকত্তর পাস করেছেন সমসংখ্যক চাকমা যথাক্রমে ১ ও ১ জন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চাকমারা ক্রমান্বয়ে উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অনুধাবন করছে।

৪.২.৮ সামাজিক সহাবস্থান, সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা

চাকমা সম্প্রদায়ের লোকজন শান্ত প্রকৃতির বলা চলে। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মত চাকমারাও শান্তি প্রিয়। এদের জীবন যাপন সাদামাটা। নিবিড় সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে চাকমারা বসবাস করে। গ্রামের কাঠামো এত সুনিপুণ যে প্রতিনিয়ত গ্রামের সদস্যদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। চাকমা গ্রাম উঁচুতে অবস্থিত

যেখানে বেশ কয়েকটি পাড়া নিয়ে গ্রাম গঠিত হয়। গ্রামে ও পাড়ায় কারবারি আছে যে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা চর্চা করে। চাকমা সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক সহযোগিতা। এখানে বিপদাপদে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। এখানকার সমাজ ব্যবস্থা অনেকটা সম্প্রদায়গত শ্রমের (কমিউনাল) উপর নির্ভর করে। যেমন ঘর তৈরির ক্ষেত্রে তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে যেখানে কোন আর্থিক বিনিময় নেই। আবার দেখা যায় জুম চাষের ক্ষেত্রে পাড়া প্রতিবেশি অন্যের চাষের জমিতে কায়িক শ্রম দেয়। বিনিময়ে কোন আর্থিক মূল্য বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেনা। এসব ক্ষেত্রে সামাজিক ভোজের আয়োজন করা হয় অথবা যারা বিনামূল্যে শ্রম দেন তাদের নিয়ে খাবার আয়োজন করা হয় জুমের প্রথম ফসল দিয়ে, অথবা ধেনো মদ দিয়ে।

রাঙ্গামটি জেলার চাকমা সমাজে বিবাদ যে একবারেই নেই তা অস্বীকার করা উচিত হবেনা। বরং মানব সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে এখানেও বিরোধ রয়েছে। বিবাদ-বিরোধের ধরণ রয়েছে ২ রকম। এক হল ছোট-খাট বিবাধ যা এক সাথে বসবাস করলে খুবই সাধারণ ঘটনা মানব সমাজে। এই সব বিবাদ নিরসনে বয়স্ক ব্যক্তিরা মধ্যস্থতা করেন। তাতে না হলে কারবারি ভূমিকা রাখেন। অন্য ধরণের বিবাধ হল রাজনৈতিক স্বার্থ ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে। এই বিবাদের উৎপত্তি মূলত রাঙ্গামাটি জেলাসহ পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষমতার চর্চা এবং পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানের কারণে।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় চাকমা মনোজগত প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হচ্ছে, ভিনদেশি সংস্কৃতি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রভাব ফেলছে চাকমা সমাজে। এই গবেষণার সময়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেখা গেছে যাদের বাড়িতে টেলিভিশন আছে তাদের প্রায় সকলের বাড়িতে ক্যবল নেটওয়ার্ক আছে। এদের অনেকে হিন্দি সিরিয়াল দেখে অভ্যস্ত। ফলে বিবাদ-প্রতিহিংসার বীজ যে তাদের মননে গ্রোথিত হচ্ছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পাশাপাশি জুম চাষ নিষিদ্ধ হওয়ায় কারণে চাষাবাদের পরিমাণ কমে গেছে। পরিবেশগত দূষণ, পাহাড় কাটা ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখানে জীবিকা হয়ে উঠছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ফলে সীমিত সম্পদের সাথে খাপ-খাইয়ে নিতে অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হচ্ছে চাকমা অধিবাসীদের। ঐতিহ্যগত সহযোগিতার পরিবর্তে স্থান করে নিচ্ছে প্রতিযোগিতা। ফলস্বরুপ বিবাদ-বিরোধ সামাজিক সম্প্রীতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

৪.৩ মারমা

৪.৩.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যার দিক দিয়ে মারমাদের স্থান দ্বিতীয়। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা অতি সুপ্রাচিন, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। মারমাদের নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা, সংস্কৃতি, সমাজ ও সামাজিক বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। মারমাদের শারীরিক গঠন হল গায়ের রং ফর্সা এবং পায়ের গোড়ালি বড়। বার্মিজদের সাথে তাদের চেহারার মিল রয়েছে। অধিকাংশ মারমাদের বসবাস বান্দরবান জেলায়। এজন্য বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার মারমা নৃগোষ্ঠীকে নির্বাচন করা হয়েছে। বতর্মানে মারমা জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লাখ (ইসলাম ২০১৫)। কিছু কিছু মারমা নিজেদেরকে "*মগ*" নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। মারমা শব্দটি "*ম্রাইমা*" শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার বা বার্মা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমা নৃগোষ্ঠিদের আগমন। মিয়ানমার ভাষায় মারমা শব্দটি অর্থ "*ম্রাইমা*" (মারমা ২০০৭)। মারমা নৃগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত জাতি। মারমা সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। মারমাদের ১০টি গোত্রের উপস্থিত পাওয়া যায়। গোত্র গুলো হচ্ছে *রিগো বা খ্যংসা, ককদাইংসা, মারোসা, ক্যকফ্যাসা, ফ্রাংসা, থংসা, প্যালেঙসা, ওয়ইংসা, মুরিখ্যংসা, লংদুসা* ইত্যাদি (প্রাগুক্ত)।

ঐহিত্যগত মারমা সমাজ ব্যবস্থাপনাকে গ্রাম, মৌজা ও সার্কেল তিন পর্যায়ে ভাগ করে পরিচালনা করা হয়। গ্রাম পরিচালনায় প্রধান হচ্ছেন "কারবারী"। মোজা পর্যায়ে "হেডম্যান" এবং সার্কেল প্রধান হচ্ছে রাজা বা *মাং।* বতর্মানে মারমাদের দুটি সার্কেল বিদ্যমান। খাগড়াছড়িতে মং সার্কেল ও বান্দরবানে *বোমাং* সার্কেল। মারমাদের বেশীর ভাগ লোকই পাহাড় ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল (ইসলাম ২০১৫)। বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় মারমা জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশি। এ এলাকার মারমা জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য খানাজরিপের সাহায্য নেয়া হয়। নিচে খানাজরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হল-

সারণী ৪.৭ঃ মারমা সম্প্রদায়ের বাৎসরিক আয়

বার্ষিক আয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতাংশ
১০০০০০-১৪৯০০০	৫	১৬.৬
১৫০০০০-১৯৯০০০	২	৬.৬
২০০০০০-২৪৯০০০	৩	১০.০
২৫০০০০-২৯৯০০০	১০	৩৩.৩
৩০০০০০-৩৪৯০০০	১	৩.৩
৩৫০০০০ থেকে বেশি	৯	৩০.০
মোট	৩০	১০০

গড় বার্ষিক আয় ২৫৩০৯৬.৬৬ টাকা (উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৪.৮ঃ মারমা সম্প্রদায়ের বাৎসরিক ব্যয়

বার্ষিক ব্যয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতাংশ
১০০০০০-১৪৯০০০	৩	১০.০
১৫০০০০-১৯৯০০০	৮	২৬.৬
২০০০০০-২৪৯০০০	৭	২৩.৩
২৫০০০০-২৯৯০০০	৬	২০.০
৩০০০০০-৩৪৯০০০	৪	১৩.৩
৩৫০০০০ থেকে বেশি	২	৬.৬
মোট	৩০	১০০

গড় বার্ষিক ব্যয় ১৯২৮৬৩.০৬ টাকা (উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৪.৭ ও ৪.৮- এ মারমা সম্প্রদায়ের বার্ষিক আয় ও ব্যয় উপস্থাপন করা হয়েছে। সারণী ৪.৭-এ দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক মারমার বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ থেকে প্রায় তিন লক্ষের মধ্যে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খানার বার্ষিক আয় সাড়ে তিন লক্ষের উপরে। একইভাবে সারণী ৪.৮-এ দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক খানার বার্ষিক মোট ব্যয় দেড় লক্ষ থেকে প্রায় দুই লক্ষের মধ্যে অবস্থিত। আয়ের সাথে ব্যয়ের সঙ্গতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। মারমা জনগোষ্ঠীর গড় বাৎসরিক আয় ২৫৩০৯৬ টাকা এবং গড় বাৎসরিক ব্যয় ১৯২৮৬৩ টাকা। এই

জনগোষ্ঠীর কোন খানার সর্বনিম্ন বাৎসরিক আয় ১২৫০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ব্যয় ১১২০০০ টাকা। সর্বনিম্ন আয়ের বিপরীতে মারমা নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ হল ৪৯৬০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ বাৎসরিক ব্যয় হল ৩৬৯০০০ টাকা।

৪.৩.২ জীবন ও জীবিকা

মারমা জনগণের প্রধান পেশা কৃষি। জুমচাষ তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রাথমিক কৃষিজ প্রয়াস। অবশ্য এর পাশাপাশি তারা পাহাড়ি অরণ্য থেকে গাছের পাতা, মূল এবং কন্দ সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। তাদের অনেকেই চাকুরী ও চাষাবাদের মাধ্যমে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করে দেশ বিদেশে চাকরি করছে। মারমারা ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা বেশি কর্মঠ মারমা জনগণের মধ্যে বসতবাড়ি-সংলগ্ন ভিটায় ক্ষুদ্র আকৃতির বাগানচাষও দেখা যায়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে ঝুড়ি তৈরি, চোলাই মদ তৈরি এবং মজুরি শ্রম।

ছাগলখাইয়া গ্রামের মারমা নৃগোষ্ঠীর অন্যতম অর্থকরী ফসল হল তামাক। মাতামুহুরী নদীর দুপাশে অন্যান্য রবি ফসলের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমিতে স্থানীয় চাষীরা তামাক চাষ করেন। বান্দরবন জেলার লামা ঝিরির উপরিভাগে সুন্দর বড় বড় পাতার তামাক গাছ দেখতে দৃষ্টিনন্দন লাগে। লামা উপজেলার ছাগলখাইয়া গ্রামের মারমা কৃষক অং গিও মারমা (২৯) বলেন-

এই যে মাতামুহুরী নদীর চর এখানে কী আর চাষ হবে বলুন। আগে বনের গাছ কেটে আমাদের জীবন চলতো। এখন গাছ কোথায় পাব। আবার গাছ কাটাও নিষেধ। অভাব আমাদের সব সময় লেগে থাকতো। তামাকই একমাত্র ফসল যার মূল্য সরকার নির্ধারণ করে দেয়। তাই ফসলের মূল্য নিয়ে আমাদের ভাবতে হয় না। সরকার নির্ধারিত মূল্যেই সরাসরি কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রি করি। আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যাংক একাউন্ট আছে। কোম্পানিগুলো তামাক বিক্রির টাকা সরাসরি আমাদের ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। তামাকের পাশাপাশি আমরা অন্যান্য ফসলও চাষ করি। তামাক তিন মাসের ফসল এবং এর পরে এই জমিতেই ধান, ভুট্টা, অন্যান্য সবজী আবাদ করে থাকি।

ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও তামাক গাছ কিন্তু স্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় বলে দাবি করেন লামা উপজেলার লাইনঝিরির ছাগলখাইয়া গ্রামের কিছু কৃষক যারা গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে তামাক চাষের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তামাক চাষ করে কৃষকরা যে মুনাফা অর্জন করে সেই টাকা তারা অন্যান্য বিভিন্ন লাভজনক

ফসল, বনায়ন, গবাদী পশু ও হাঁস-মুরগীর খামারে বিনিয়োগ করে। যা স্থানীয় অর্থনীতিতে বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলে (দত্ত ২০১৮)।

জুম চাষের জন্য পৌষ-মাঘ মাসে সুবিধাজনক সময়ে এক টুকরো জঙ্গল নির্বাচন করে মারমা সম্প্রদায়। জমি নির্বাচনের সময় গাছ, বাঁশ ও আগাছাসহ পাহাড়ের গায়ের ঢালু জায়গাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারপর সেই জঙ্গলের সমস্ত গাছ, বাঁশ, ঝাড়-জঙ্গল কেটে ফেলা হয়। কাটার পর সেগুলি রোদে শুকানো হয় চৈত্র মাস পর্যন্ত। সাধারণত চৈত্র ও বৈশাখের শুরুতে এতে আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়। তাতে শুকিয়ে যাওয়া গাছপালা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সঙ্গে ওপরের ১-২ ইঞ্চি মাটিও পুড়ে যায়। ছাই ও পোড়ামাটির জন্য জমি উর্বর হয়। এরপর দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে জমি ভিজে নরম হয়। তারপর বীজ বোনার কাজ শুরু হয়। চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষের অনুষ্ঠানের পর সাধারণত জমিতে ফসল বোনার উৎসব শুরু হয়। এ সময় পরিবারের সবাই মিলে বীজ বোনার কাজ শুরু করে। সাধারণভাবে জন্মানো প্রধান ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, ভুট্টা, কাউন, তিল, শসা, মিষ্টিকুমড়া, তরমুজ, বরবটি, তুলা, কলা, আদা, হলুদ প্রভৃতি। বীজ বপনের জন্য দা নামে সাধারণভাবে পরিচিত একটি প্রশস্ত বেøডের ছুরি ব্যবহৃত হয়। বাঁ হাতে দা-এর মাথা দিয়ে মাটি ফাঁক করে তাতে একত্রে মেশানো বীজ পরিমাণ মতো ডান হাত দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর দা তুলে নিলে মাটিতে আপনা আপনি বীজগুলি ঢেকে যায় (ইসলাম ও হোসেন ২০১২)।

এ চাষপদ্ধতিতে ফসল পেতে হলে খুব পরিশ্রম করতে হয়। বিশেষ করে ধান কাটার সময় অন্য যেসব ফসলের চারাগাছ থাকে, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। জুমচাষে বন্য পশুপাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা ব্যতীত কদাচিৎ আগাছা দমন করা হয়। বিভিন্ন ফসল আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যবর্তী সময়ে পরিপক্ক হয় এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলি সংগ্রহ করা হয়। জুমচাষের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি পাওয়া যেত বলে এর মূল কৌশল হিসেবে প্রাকৃতিক অরণ্য সৃষ্টির জন্য দীর্ঘসময় অনাবাদি রাখা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অনাবাদি সময়কাল প্রথাগত দশ বছর থেকে বিপজ্জনকভাবে দুই থেকে তিন বছরে হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ জনসংখ্যার চাপ ও কাপ্তাই জলাধারের কারণে কৃষি জমির হ্রাস।

জুম চাষ ও বিভিন্ন কাজে মারমা নৃগোষ্ঠীর মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। তারা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমী। চাকুরী থেকে শুরু করে সংসারে সমস্ত কাজ ও দেখাশুনা করে। তাই মারমা সমাজে মেয়েদের সম্মান একটু বেশি। এসব কাজের ফাঁকে কাপড় বুনাসহ হাতের তৈরি নানা রকম কাজ করে। বস্ত্র তৈরি মারমা মেয়েদের মধ্যে একটি খুবই সাধারণ কর্মকান্ড। মারমারা বেশির ভাগ হাতে তৈরি পোষাক ও বার্মীজ কাপড় পড়ে

থাকেন। চাষ বাস ছাড়াও সংসারের প্রায় কাজ মেয়েদের উপর ন্যস্ত। মারমা সমাজে পুরুষরা অনেকটাই অপ্রধান। তবে মারমা সম্প্রদায় পিতৃ প্রধান সমাজের মানুষ। মেয়েরা চাষ বাস ছাড়াও কাপড় বুনন ও চুরুট তৈরিতে বেশ পটু। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও মারমারা কাপড় এবং চুরুট বাইরে রফতানি করতে পারে। তবে মেয়ে পুরুষ উভয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসে।

সারণী ৪.৯ঃ মারমা নৃগোষ্ঠীর পেশা

পেশা	গণসংখ্যা	শতাংশ
কৃষি (নিজ জমি)	১২	৪০.০
মোটর চালক	১	৩.৩
সরকারি-বেসরাকারি চাকুরিজীবী	৪	১৩.৩
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৪	১৩.৩
গৃহিণী	৭	২৩.৩
ছাত্র	১	৩.৩
অন্যান্য	১	৩.৩
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৪.৯ থেকে যানা যায় মোট ৩০ জন মারমা উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক তথা ৪০ শতাংশের পেশা হল কৃষি কাজ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মারমা সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা কৃষি কাজ করে তাদের সবারই প্রধান কৃষি পণ্য হল তামাক। লামা উপজেলায় ব্যাপকহারে তামাক চাষ হয়। মারমা নৃগোষ্ঠীর সিংহভাগ মানুষ তামাক চাষের সাথে সম্পৃক্ত। এটা এই নৃগোষ্ঠীর অন্যতম আয়ের উৎস। তবে তামাকের মাঝামাঝি সময়ে ধান চাষ হয়। কিছু কিছু মারমা বাণিজ্যিকভাবে আম চাষ করে। গবেষণা এলাকা তথা ছাগলখাইয়াতে আম চাষ হয়না। প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার দূরে আম বাগান রয়েছে। ৩.৩ শতাংশ মারমা ছোট মোটরযান এর চালক এবং ১৩.৩ শতাংশ জীবিকা নির্বাহ করে সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় চাকুরি করার মাধ্যমে। ১৩.৩ শতাংশ মারমা ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যুক্ত। মারমা মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহিণী। গৃহিণী হলেও তারা গৃহের আঙ্গিনায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক আয় বর্ধক কাজ করে থাকে।

৪.৩.৩ সংস্কৃতি

ভাত এবং সিদ্ধ করা শাকসবজি মারমাদের প্রধান খাদ্য। মারমা সম্প্রদায় *সাংগ্রাই পোয়েঃ, সাংগ্রাইং, ওয়াছো পোয়েঃ, ওয়াগ্যোয়াই পোয়েঃ, পইংজ্রা পোয়েঃ,* ফানুস বাতি উড়ানো, জলকেলি, রথযাত্রা এ সবকে প্রদান সামাজিক উৎসব হিসেবে পালন করে থাকে (মারমা ২০১৬)। মারমাদের আদি সংস্কৃতি মধ্যে রয়েছে থালা নৃত্য, পাখা নৃত্য, মাছ ধরা নৃত্য, *পাংখুং, জাইক, কাপ্যা* প্রভৃতি। নিজেদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মারমা সমাজে খুবই জনপ্রিয়। মাতৃভাষায় রচিত অসংখ্য ভিডিও ও অডিও গান রয়েছে। মারমারা বর্ষবরণকে প্রধান সামাজিক উৎসব হিসেবে পালন করে থাকেন। এ বর্ষবরণকে মারমা তাদের ভাষায় *সাংগ্রাই পোয়েঃ বা সাংগ্রাইং* উৎসব বলে থাকে। ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে এ উৎসব পালিত হয়। যা বর্তমান অধ্যয়নটি নিগুঢভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস গ্রহণ করে।

বাংলা নববর্ষ থেকে মারমাদের *সাংগ্রাই পোয়েঃ* উৎসব হয়। এ উৎসব ৪ দিন ব্যাপী মারমারা পালন করে থাকে। পৃথিবীর সকল জাতির মতন করে মারমারা গ্রেগরিয়ান ইংরেজি ক্যালেন্ডার ছাড়াও নিজস্ব একটা ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করে, মারমাদের ক্যালেন্ডার অবশ্য বর্মী ক্যালেন্ডারের কে অনুসরণ করেই করা হয়। মারমাদের বর্ষপঞ্জিকাকে "ম্রাইমা সাক্রঃয়" বলা হয়। "ম্রাইমা সাক্রঃয়" এর পুরনো বছরের শেষের দুই দিন আর নতুন বছরের প্রথম দিনসহ মোট ৩দিন কে মারমারা সাংগ্রাই হিসেবে পালন করে থাকে। আগে "ম্রাইমা সাক্রঃয়" অনুযায়ী এই ৩ দিন ইংরেজি ক্যালেন্ডারের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে পড়লেও এখন ইংরেজি ক্যালেন্ডারের সাথে মিল রেখে এপ্রিলের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখে পালন করা হয় (প্রাগুক্ত)। ১৩ তারিখের সকালে *পাঃংছোয়াই* (ফুল সাংগ্রাই), ১৪ তারিখে প্রধান সাংগ্রাই আর ১৫ তারিখে পানি খেলার সাথে মারমাদের ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোও অনুষ্ঠিত হয়। সাংগ্রাই এর প্রধান আকর্ষন হল পানি খেলা যেটিকে মারমারা বলে "ড়ি লং পোয়ে"। সাংগ্রাই আসলে পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়াকেই বোঝায়। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে নতুন জুম চাষের মৌসুমের শুরুও সাংগ্রাই-এর পরেই হয়ে থাকে। শুধু জুম চাষই নয় মারমারা মাঘী পূর্ণিমার পর থেকে সাংগ্রাই এর আগ পর্যন্ত নতুন বিয়েই করে না অর্থাৎ সাংগ্রাইকে মারমারা নতুন বছরের শুরুসহ পুরনো সব জিনিসকে ঝেরে ফেলে নতুন করে শুরু করাকেই বোঝায় (মারমা ২০০৯)। আর তাই মারমারা এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্শীবাদের আশায় নতুন বছর উদযাপন করে থাকে।

সাংগ্রাই এপ্রিলের ১৩ তারিখ থেকে শুরু হলেও মারমাদের মাঝে সাংগ্রাই নিয়ে উদ্দীপনা জানুয়ারি থেকেই শুরু হয়। মারমা গ্রামের গিন্নিরা সাংগ্রাই নিয়ে নানা পরিকল্পনা করতে থাকে। তারা নতুন করে তাদের ঘরগুলো

সাজাতে থাকে। মাটির ঘরগুলোকে আবার নতুন করে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়, মাচাং আর ছনের ঘরগুলোতে পুরনো ছন বাদ দিয়ে পাহাড় থেকে নতুন ছন এনে বাড়িতে লাগানো হয়। এছাড়া জুম থেকে পাওয়া চাউল নানা রকমের পিঠার জন্য রেখে দেওয়া হয়।

মারমা শুকর ব্যবসায়ীরা ৩ মাস আগে থেকেই নতুন নতুন শুকরের ছানা পালতে থাকে যেন সাংগ্রাই-এর বাজারে বিক্রি করতে পারে। মারমা শিকারীরা সাংগ্রাইয়ের আগে তাদের অস্ত্রগুলো গুছাতে থাকে যেন সাংগ্রাই-এর আগেই বড় রকমের হরিণ, গুইসাপ, কচ্ছপসহ আরো নানা রকমের পশু-পাখী শিকার করতে পারে। এছাড়া অন্যন্য ব্যবসায়ীরাও সাংগ্রাইকে নিয়ে তাদের ব্যবসায়ী পরিকল্পনা বানাতে থাকে। সেই সাথে তরুণ-তরুণীরাও সাংগ্রাইকে নিয়ে সাংস্কৃতিক আয়োজনের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। মারমা তরুণীরা দর্জিদের কাছে ছুটে যায় যেন তার সাংগ্রাইয়ের "*থামি* (মারমা মেয়েদের পোশাক)" টা সব থেকে সুন্দর আর ব্যতিক্রমী হয়। এছাড়া যুবক- যুবতীরা তাদের বিয়ের তারিখগুলোও সব সাংগ্রাইয়ের পরে ঠিক করে রাখে। মোটামোটিভাবে জানুয়ারির পর থেকে সাংগ্রাইকে ঘিরে সকল স্তরের মারমারা নানা রকমের পরিকল্পনা সাজাতে থাকে। "পাঃংছোয়াই" এর অর্থ ফুল ছিঁড়ার দিন। এটি সাধারণত ১২ এপ্রিলের রাতেই হয়ে থাকে। শীতের পর বসন্তের আগমনে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলোতেও বসন্তের ছোঁয়া লাগে, ফলে পাহাড়ে দেখা যায় নানা ফুলের সমারোহ।। নানা রকমের ফুলে গ্রামের চারপাশে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলোতে ছেয়ে যায়। আর এই ফুলগুলো সাংগ্রাইয়ের আগে ছেঁড়া হয় না একেবারে "পাঃংছোয়াই" এর রাতেই পাহাড় থেকে ফুলগুলো ছিঁড়ে বাড়িগুলোতে সাজানো হয়। পাহাড়ে অনেক ফুল থাকলেও কিছু নির্দিষ্ট ফুল আছে যেগুলো দিয়েই বাড়িঘর গুলো সাজানো হয়। তন্মধ্যে "সাংগ্রাই পাঃং" নামে সাদা রংঙের ফুলটিই সবথেকে প্রিয়। সবাই মূলত এই ফুলকে প্রধান করেই "পাঃংছোয়াই" এর পরের দিনে গিন্নীরা তাদের ঘরগুলো সাজাতে থাকে। এই ফুল ছেঁড়ার কাজটি মূলত মারমা তরুণ-তরুণীরাই করে থাকে। এই "পাঃংছোয়াই" কে কেন্দ্র করে মারমা তরুণ-তরুণীরা এর আগের রাতে নানা রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনেকে সারারাত জেগে পিঠা বানায়, আবার অনেকে মারমাদের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী খেলার ব্যবস্থা করে, অনেকে মারমা নাচ-গান করে থাকে, মূলত মারমা তরুণ-তরুণীরা সারারাত জেগে থাকার জন্য নানা ধরণের ব্যবস্থা করে। এরপরে আলো ফোটার আগেই একদম ভোর-সকালে দলে দলে পাহাড়ে গিয়ে "সাংগ্রাই পাঃং" তুলে নিয়ে মায়ের হাতে তুলে দেয় (মারমা ২০১৬)।

গিন্নিরা সকাল হলেই সুতা দিয়ে ফুলগুলো সাজাতে থাকে। প্রথমে ভগবান বুদ্ধকে ফুল পূজা করে বাড়ির প্রতিটি দরজাগুলোকে "সাংগ্রাই পাঃং" দিয়ে সাজানো হয়। বাড়ির দরজায় সাজানো ফুলগুলো দিয়েই বোঝতে পারা যায়

সাংগ্রাই অর্থাৎ নতুন বর্ষবরন শুরু হয়ে গেছে। শুধু তরুণ-তরুণীরাই নয়, মারমা ছোট ছেলেমেয়েদেরও এই *পাঃংছোয়াই* নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। কিন্তু মারমাদের বয়োজষ্ঠ্যরা ছোট ছেলেমেয়েদেরকে সবসময় "ফ্রুজুমা" (মারমা ডাইনী) এর ভয় দেখিয়ে রাখে। এমনকি এই "পাঃংছোয়াই" নিয়ে অনেক কিচ্ছাও আছে। তার মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় হল *ফ্রুজুমা-র* ফাঁদে আটকে যাওয়া। ফ্রুজুমা "সাংগ্রাই পাঃং" এর লোভ দেখিয়ে কোন একজনকে দলছুট করে এমন গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাবে যে তা থেকে দিনের আলো ফোটার আগে কখনোই আর মুক্তি পাওয়া যাবে না কারণ ফাঁদে পড়ার পর যেখানেই যাবে শুধু জংগল আর জংগলই পাবে। আর *সাংগ্রাই পাঃং* সাধারণত সকালের আলো ফোটার আগেই ছিঁড়তে হয়। এই ঐতিহ্যগত কিচ্ছা দিয়েই মারমা মা-বাবারা তাদের সন্তানদের আগলে রাখে। "পাঃংছোয়াই" এর দিনেই অর্থাৎ ১৩ তারিখেই *সাংগ্রাই জীঃঈ* হয়ে থাকে।

সাংগ্রাইকে উপলক্ষ করে অনেক বড় হাট বসে। হাটে সাংগ্রাইয়ের জন্য সকল প্রয়োজনীয় জিনিসই পাওয়া যায়। গিন্নিরা সাংগ্রাইতে বিহারে পাঠানোর জন্য অনেক ভালো ভালো খাবার কিনে। এছাড়া গৌতম বুদ্ধেকে স্নানের জন্য পবিত্র পানি, নারকেল, চীনা কাগজ, মোমবাতি, আগরবাতি মোটামোটিভাবে বিহারে পাঠানোর জন্য যার যেরকম সামর্থ্য সেই অনুযায়ী কিনে। এছাড়া সাংগ্রাইতে ছোট-বড় সবারই মাঝে নতুন জামা থাকবেই। আর ছোট্ট বাচ্চারা সাংগ্রাইতে পানি মারার জন্য পানির বোতল, পানি মারার নানা রকমের প্লাস্টিকের অস্ত্রও কিনে রাখে। প্রধান সাংগ্রাই বর্তমানে ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে এপ্রিলের ১৪ তারিখেই পালন করা হয়। মারমা গৃহিণীরা ("ইংথসাং") ভালো ভালো খাবার ("ছোয়াঈ") আর পিঠা নিয়ে বিহারে যায়। শুধু নিজেদের বিহার ছাড়াও আশেপাশের বিহারেও "ছোয়াঈ" পাঠানো হয়। "ছোয়াঈ" শুধু ভগবানের উদ্দেশ্যে নয়, নিজেদের আত্মীয়দের মাঝে যারা উপোস পালন করে তাদের উদ্দেশ্যেও পাঠানো হয়। বিহার ছাড়াও মারমা বিভিন্ন দেবতাদেরকেও পূজা দেওয়া হয়। এছাড়া গ্রামের পরিচিত বয়োজৈষ্ঠদেরকেও খাবার আর পিঠা পাঠানো হয়। আর মারমা তরুণ-তরুণীরা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বয়োজৈষ্ঠ্যদের স্নান করাতে যায়। প্রত্যেক পরিবারের বয়োজৈষ্ঠ্যরা গোসল শেষে তরুণ-তরুণীদেরকে সাংগ্রাই এর সেলামি প্রদান করে। সেই সাথে তরুণ-তরুণীরা বছরের শুরুতে বয়োজৈষ্ঠ্যদের কাছে নতুন বছরের আর্শীবাদ নিয়ে আসে। শুধু গোসলই নয় প্রতি পরিবার থেকে মারমা তরুণ-তরুণীদের কিছু না কিছু খেয়ে আসতে হয় (প্রাগুক্ত)।

প্রধান সাংগ্রাই তে বিহারে যে ভগবান বুদ্ধ মূর্তি আছে তাদেরকে পবিত্র পানি দিয়ে গোসল করানো হয়। সে পানি মারমারা খেয়ে থাকে কারণ মারমাদের বিশ্বাস এই পানি তাদের শরীরে সকল রোগমুক্তির অবসান করাবে। আর এর পরেই ধর্মদেশনা হয়। এতে এলাকার সকল পুরুষ-মহিলা যোগ দেয়। সকল পরিবারেই চাল-নারকেল-চীনা

কাগজ-মোমবাতি বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিহারে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে। বিহারের প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষু নতুন বছরের শুভদিনের জন্য ধর্মদেশনা প্রদান করে। সেই সাথে নতুন বছরের দিনগুলো যেন শুভাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয় তার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ধর্মদেশনার পরই বৌদ্ধ বিহারে সকলেই ভগবানের উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বালানো হয়। শুধু ভগবান নয় অনেক তাদের পূর্বপুরুষদের সমাদিতেও মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। প্রধান সাংগ্রাই এর দিনের আলো শেষেই সন্ধ্যে নামলেই মারমা তরুণ-তরুণীরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বিহারে চলে আসে। সাংগ্রাইকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক বিহারেই এক নতুন সাজে সেজে যায়।বিহারে বিহারে গিয়ে তারা মোমবাতি জ্বালাতে থাকে। এরপরে তরুণ-তরুণীরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে একসাথে বসে ধর্মদেশনা শুনে। এছাড়া পরবর্তী দিনের “ড়িলংপোয়ে” এর জন্য একসাথে বসে আলোচনা করে। প্রধান সাংগ্রাইয়ের পরেই বিভিন্ন জায়গায় “ড়িলংপোয়ে”এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এটি শুধু এপ্রিলের ১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়না, অনেক জায়গায় ১৬, ১৭, ১৮ তারিখেও বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হয় যেন সকলেই সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতে পারে। অনুষ্ঠানের দিন সকাল থেকেই বিভিন্ন দূর-দূরান্ত থেকে মারমারা তাদের ঐতিহ্যবাহী “থামি (মেয়েরা)” আর লুংগি” (ছেলেরা) পরে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকে। খুব সকালেই স্থানীয় এলাকার তরুণ-তরুণীরা সাংগ্রাই র‍্যালি করে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা মারমা তরুণ-তরুণীরা “সাংগ্রাই মা ঞিঞিঈ ঞাঞাই, রিগ জাঃং কাঈ পাঃ মেঃ” গান গেয়ে দলে দলে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকে। এরপরে মারমা রাজা কিংবা মারমাদের হেডম্যান (মৌজা প্রধান) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের পরই আনুষ্ঠানিক “ড়ীলং পোয়ে” শুরু হয়।

মারমা তরুণ-তরুণীরা দল বেঁধে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়, এরপরে তাদের এক অপরের দিকে পানি ছোড়াছুঁড়ি শুরু হয় যথক্ষণ পর্যন্ত তাদের সামনে রাখা পানির পাত্রটি শেষ না হয়ে যায়। এভাবে একদলের পর আরেকদল পানি খেলতে থাকে। মারমা তরুণ-তরুণীদের পরস্পরকে পানি ছিটানোর দৃশ্যএভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পানি খেলা ছাড়াও ওইদিন সবার হাতেই একটা করে পানির বোতল থাকে। যার যাকে মন চায় সে তাকেই পানি ছিটাতে পারবে, এতে কেউ কোন আপত্তি করে না বরং এটিকে আর্শিবাদ আর শুভ লক্ষনের প্রতীক হিসেবে ধরে নেয়। পানি খেলার পরপরই মারমাদের ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ছেলেদের বলি খেলা, মেয়েদের দড়ি টানাটানি খেলা হয়ে থাকে। আর সবথেকে আকর্ষন হল ছেলেদের বাশঁ উঠানো (“তং তাং”) খেলা। এতে একটা লম্বা ২৫ ফুট বাশঁ থাকে যার একদম শীর্ষে একটি বড় পরিমাণের টাকা থাকে। মোটামোটিভাবে একজনের কাধেঁ আরেকজন উঠে শীর্ষের টাকাটা নিতে হবে। মোটামোটিভাবে পাঁচজন হলেই টাকার নাগাল পাওয়া যায়। আর যে দল আগে নিতে পারবে সেই দল সেই টাকা পেয়ে যাবে। তবে তা সহজ নয়, কারণ বাশেঁর উপরের অংশে তেল থাকে তাই যতই বাশঁ নাড়ানো হোক না কেন ততই উপর থেকে তেল পরে বাশঁকে পিচ্ছিল করতে

থাকে। দুপুরের পরই এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে মারমাদের ঐতিহ্যগুলোকে নানাভাবে তুলে ধরা হয়। সাংগ্রাই নৃত্য সহ আরো নানা ধরনের নৃত্য এতে পরিবেশন করা হয় (মারমা ২০১৪)।

৪.৩.৪ ভাষা

মারমাদের নিজস্ব ভাষা আছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, মারমাদের ভাষা ভোট বর্মী শাখার বর্মী দলভুক্ত একটি ভাষা। বর্ণমালার নাম *ম্রাইমাজা*। বাম থেকে ডান দিকে লেখার রীতি অনুসারী বর্ণমালা উপমহাদেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি হতে উদ্ভূত (খান ২০১৫)। তবে এরা লেখার ক্ষেত্রে বার্মিজ লিপি ব্যবহার করে থাকে। যার কারণে বার্মার অনেক কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে মারমাদের মিল পাওয়া যায়। মারমাদের শতভাগ মারমা ভাষায় কথা বলে। এরা ছাড়া ম্রো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরাও মারমা ভাষা ব্যবহার করে। বাংলাদেশের মারমাদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা। পাশাপাশি আরো অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাও মারমারা ব্যবহার করে। সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম বাহন হল মারমা ভাষা, নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগে তাদের ভাষা ব্যবহারে মারমারা অনেক দক্ষ। যদি অন্যান্য ক্ষুদ নৃগোষ্ঠীর ভাষা তারা না পারে সেক্ষেত্রে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা অথবা চলিত বাংলা ব্যবহার করে।

৪.৩.৫ ধর্ম

মারমারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে এর পাশাপাশি কিছু নিজস্ব সনাতন আচারানুষ্ঠান করে। মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । গৌতম বুদ্ধের অনুশাসনই তাদের ধর্মের মূল মন্ত্র। এছাড়া প্রকৃতি পূজারিতেও মারমারা বিশ্বাসী (খান ২০১৫)। ছাগলখাইয়া গ্রামের অনেক মারমা প্রকৃতি পূজারী। এ গ্রামের মধ্যখানে কারবারীর বাড়ির সামনে একটা বট গাছ আছে যেখানে প্রকৃতি পূজা করা হয়। সপ্তাহের সাত দিনে সাত রকমের প্রাণীর পূজা করা হয়। মনে করা হয় একটি বিশেষ দিন বিশেষ প্রাণীর জন্য। এই প্রাণীর মধ্যে আছে হাতি, সাপ, ইদুর ইত্যাদি। শিশুর জন্ম যে দিনে হয় ঐ দিনের জন্য নির্ধারিত প্রাণীর পূজা করা হয়। মনে করা হয় শিশুর ভাগ্য, সুখ-দুঃখ ঐ প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত।

৪.৩.৬ ঘরবাড়ির ধরণ ও মালিকানা

মারমাদের ঘর ঐতিহ্যবাহী। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে মারমাদের ঘর খুবই দৃষ্টিনন্দন। মারমাদের ঘর মাটি থেকে কিছু উপরে থাকে । মারমা জনগণের বাড়িঘর বাঁশ, পাহাড়ি ছন ও ঘাসের তৈরি। এসব বাড়িঘর মূলত

বাঁশ দিয়ে উঁচু মাচাং-এর উপর তৈরি করা হয়। বাড়ির প্রত্যেকটি কক্ষই একাধারে শয়নকক্ষ ও গুদামঘর। মাচাং-এর নিচের জায়গাটি গবাদিপশু রাখা, জ্বালানি কাঠ সংরক্ষণ অথবা তাঁত স্থাপনের মতো নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু বাড়ি মাটির তৈরি এবং মাচাং-বিহীন। স্থানীয় মারমাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় জানা যায় কয়েক প্রজন্ম আগে যখন মারমারা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তখন এ অঞ্চল ছিল হিংস্র বন্যপ্রাণী আবেষ্টিত। এসব হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘর মাটি থেকে উচুতে তৈরি করা হত। এই প্রথা এখনো চলমান। মারমা ঘরের ধরণ সম্পর্কিত খানাজরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিচে দেয়া হল-

সারণী ৪.১০ঃ মারমা সম্প্রদায়ের ঘরের ধরণ

ঘরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
টিন শেড় (পাকা/সেমি পাকা ওয়াল)	৭	২৩.৩
টিন শেড় (টিন দিয়ে ঘেরা)	১৬	৫৩.৩
টিন শেড় (মাটি, কাঠের বেড়া)	৭	২৩.৩
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৪.১০ থেকে জানা যায় মারমা সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ সংখ্যক তথা ৫৩.৩ শতাংশের ঘরের দেয়াল টিন দিয়ে তৈরি। বাকি ২৩.৩ শতাংশের ঘরের দেয়াল পাকা অথবা অর্ধ-পাকা। সমসংখ্যক মারমার ঘরের দেয়াল বেড়ার তৈরি। মারমা সম্প্রদায়ের মধ্যে খানাজরিপ পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের বেলায় বিল্ডিং বা ইমারতের ঘর না পাওয়া গেলেও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তিতে দেখা যায় গুটিকয়েক ইমারতের ঘর রয়েছে। ইমারতের ঘর তৈরির প্রক্রিয়া ইদানিংকালে চালু হয়েছে বলে জানা যায়। তবে এই ঘরের নির্মাণের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যবাহী মারমা ঘর তৈরির কৌশলকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ঘর ইমারতের হলেও কক্ষের ধরণ, সিঁড়ি, এবং সর্বোপরি ঘর মারমা ঐতিহের আদলে হয়।

সারণী ৪.১১ঃ মারমা বাড়ির মালিকানা

বাড়ির মালিকানা	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজের জমিতে নিজের বাড়ি	২৮	৯৩.৩
অন্যের জমিতে নিজের বাড়ি	২	৬.৭
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

লামা উপজেলার মারমারা যুথবদ্ধভাবে বসবাস করে। নদীর পাড়ে ছাগলখাইয়া লোকালয়ের অবস্থান। শত শত বছর ধরে একই এলাকায় বসবাসের কারণে এখানকার জমির মালিকানা উত্তরাধিকারসূত্রে নির্ধারিত। বাজার নির্ভরতা এই জনগোষ্ঠীকে জমির মালিকানা বিষয়ে সচেতন করেছে। সারণী ৪.১১ এর মাধ্যমে দেখা যায় ৯৩.৩ শতাংশ মারমার নিজের জায়াগায় নিজের বাড়ি রয়েছে। অর্থাৎ মারমা নিজের মালিকানা জমিতে বসবাস করে। আর ৬.৭ শতাংশ বসবাস করে অন্যের জমিতে। কেউ কেউ অন্য এলাকা থেকে ছাগলখাইয়া গ্রামে এসে বিবাহ করার কারণে শ্বশুরের জমিতে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। যেহেতু বসতভিটার মালিক শ্বশুর তাই সেক্ষেত্রে জমির মালিকানায় অন্যের জমি দেখানো হয়েছে।

ছবি ৪.২ঃ মারমা ঘরের ধরণ

৪.৩.৭ শিক্ষা

মারমাদের মধ্যে দিন দিন শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন মারমারা শিকারে অভ্যস্ত ছিল তখন শিক্ষার গুরুত্ব ছিল কম। কয়েক প্রজন্ম আগে মারমাদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল কম। কিন্তু গত শতাব্দির শেষ দশকে ও বর্তমানে মারমাদের মাঝে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। পাহাড়ে জীবন যাপন করলেও তারা শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে আধুনিক জীবন যাপনের দিকেও ঝুঁকছে। মারমা শিশুরা বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করে। তাদের নিজস্ব ভাষায় রচিত কিছু বই আছে। তবে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার হার তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। সে তুলনায় এ প্রজন্মের মারমাদের মধ্যে শিক্ষার প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক মারমা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে সম্মান শ্রেণীতে পড়ছে। কিছু মারমা বাংলাদেশের স্বনামধন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। ভোগ নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বাজার নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় রুপান্তরের কারণে প্রাত্যাহীক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিয়মান হয়েছে বেশি। পাশাপাশি তামাক চাষের ফলে উৎপাদন নিশ্চয়তা থেকে অর্থের সঞ্চয় শিক্ষা লাভের মত মৌলিক বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করেছে। এতে মারমা সমাজটি পরিবর্তিত হয়ে ক্রমানুসারে একটি জটিত ও স্তরায়িত সমাজের দিকে অগ্রসরমান।

খানাজরিপ থেকে প্রাপ্ত সারণী ৪.১২ এ দেখা যাচ্ছে মারমা উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬.৭ শতাংশ নিরক্ষর। বলা যায় এই শ্রেণী অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যারা কৃষি কাজের সাথে নিযুক্ত। সর্বনিম্ন সংখ্যক মারমা উত্তরদাতা শুধু পড়তে ও লিখতে পারেন। ১৬.৭ শতাংশ ১ম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাস করেছেন। ১৩.৩ শতাংশ প্রাইমারি তথা পঞ্চম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পাস করেছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক মাধ্যমিক পাস করেছেন। ১৩.৩ শতাংশ এসএসসি ও ১০.০ শতাংশ এইচএসসি পাস করেছেন। সম্মান শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েছে ৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা।

সারণী ৪.১২ঃ মারমা নৃগোষ্ঠীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	গণসংখ্যা	শতাংশ
নীরক্ষর	২	৬.৭
লিখতে ও পড়তে জানেন	১	৩.৩
১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী	৫	১৬.৭
মাধ্যমিক পাস	৪	১৩.৩
নিম্ন মাধ্যমিক পাস	১০	৩৩.৩
এসএসসি পাস	৪	১৩.৩
এইচএসসি পাস	৩	১০.০
স্নাতক পাস	১	৩.৩
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৪.৩.৮ সামাজিক সহাবস্থান, সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা

লামা উপজেলার বৈশিষ্ট হল দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল। কিন্তু ছাগলখাইয়া গ্রামের অবস্থান সমতল ভূমিতে। এর এক পাশে দৃষ্টিনন্দন করা স্বচ্ছ পানির বহতা নদী মাতামহুরি আর অন্য পাশে উচু খাড়া পাহাড়। কিছু দূরে ম্রো নৃগোষ্ঠীর বাসস্থান। এ গ্রামের পাশেই আছে বাঙ্গালী ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর বসবাস। সামাজিক জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখা মারমা সমাজের অন্যতম অংশ। অধ্যয়নটি যখন জানতে চায় তাদের সাথে বাঙ্গালী বা অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কারো সাথে সামাজিক সংঘাত হয় কিনা। তখন অনেকে বলেন - *সমাজে একসাথে বসবাস করতে গেলে*

আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যেও ভুল বোঝাবোঝি হয়। এটা আমরা নিজেরা মীমাংসা করি। তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের সাথেও ভুল বোঝাবুঝি হয়। কিন্তু তা কখনো সংঘাতে রুপ নেয়না। আমরা আমাদের সাথে অন্যদের খুব কমই পার্থক্য করি (মাঠ গবেষণা ২০১৮)।

ছাগলখাইয়া গ্রামে প্রবেশ করলে মনে হবে এক টুকরা শান্তির নীড়। নদী তীরে অবস্থিত হওয়ার কারণে ছাগলখাইয়া গ্রামের মারমা পাড়ায় পাহাড়ি নদীর শীতল আবেশ উপলব্ধি করা যায়। গ্রীষ্মের তপ্ত রোদের মধ্যে এই পাড়ার মধ্যে পাওয়া যায় শীতলতার পরশ। ঘরবাড়ির চারপাশে ফলজ গাছ গ্রামটাকে মোহময় করে তুলেছে। গাছের ছায়ার ন্যায় শান্ত-শীতল আবেশ টের পাওয়া যায় এখানকার মারমা জাতীয় চরিত্রে। এই জাতি অত্যন্ত শান্ত, সহযোগিতাপূর্ণ এবং বিবাদ এড়িয়ে চলে। এরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। গৃহে অতিথি আসাকে তারা ভাগ্যের শুভ লক্ষণ মনে করে। তারা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং বন্ধুবৎসল। তারা এখন সমতলের বাঙালিদের মতোই পোশাক পরিধান করছে। তাদের ছেলে-মেয়েরা এখন আধুনিক জীবন যাপনের দিকে গেলেও আপন সংস্কৃতির প্রতি তাদের পরম মমত্ববোধ রয়েছে। তাই কোনো উৎসব এলেই সকল ছেলে-মেয়ে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারায় বোনা পোশাক পরিধান করে এবং উৎসবে মেতে ওঠে। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে বলতে গেলে বলা যায়- মারমারা এখনো তাদের ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তারপরও পরিবর্তনের বহিঃচলকগুলো তাদের সমাজকে একটি পরিবর্তনশীল সমাজের দিকে ধাবিত করছে বলে বর্তমান অধ্যয়নটি মনে করে।

সামাজিক জীবনে মারমারা নিজ সম্প্রদায়ের সাথে লেনদেন বেশি করে। জুম চাষের সময়কালে এদের মধ্যে সহশ্রম ছিল সক্রিয় বিষয়। তামাক চাষের বেলায় পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে স্থান করে নেয় অর্থনৈতিক নগদ বিনিময় ব্যবস্থা। এর ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছাড়াও অনেক বাঙ্গালী মারমাদের তামাক ক্ষেত্রে কাজ করছে অর্থের বিনিময়ে। দূরের পাহাড়ে দলগতভাবে শিকার করা প্রথা ছিল ঐতিহ্যগত। শিকার বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। তাই এখন ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিকভাবে শুকর পালন করা হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে বিনিময় হয় একতরফা। অর্থাৎ মেয়ে পক্ষকে ছেলে পক্ষ উপহার দেয়।

৪.৪ ত্রিপুরা

৪.৪.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ত্রিপুরা সমাজ ব্যবস্থায় হেডম্যান ও কারবারির মধ্যে ভাল সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে। এ সমাজের হেডম্যান বর্তমানে ওয়ার্ড ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার। এখানকার সমাজে বিরোধ নেই বললেই চলে। নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তঃকলহ নেই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সুখে শান্তিতে বাস করে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা। সমাজে পুরুষেরা আয়বর্ধক কাজ করে। তবে মহিলারা অনেকাংশে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকে। এখানে সমতল ও পাহাড়ী জমি আছে। সমতম জমিতে ধান চাষসহ অন্যান্য শস্য চাষ হয়। তবে জমির মালিকানা নিয়ে কখনো অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে হেডম্যান বিশেষ ভূমিকা রাখে। খাগড়াছড়ি জেলা সদরের অনেকাংশে ত্রিপুরা সমাজের বাস। খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি সড়কের পাশে অনেক পরিবারের বসবাস। এখানে উঁচু জমির পাশাপাশি সমতল জমি আছে। যেগুলোতে কৃষি কাজ হয়। পাশাপাশি পাহাড়ি জমিতে কলা, সফেদা, লেবু, আম, কাঠাল, লিচুসহ অনেক ফলজ গাছ রয়েছে। ত্রিপুরা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। পিতাই পরিবারের প্রধান এবং পিতার পরিচয়ে সাধারণত সন্তানদের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয়। অবশ্য ত্রিপুরাদের কোন কোন গোত্রে মেয়ে সন্তানেরা মায়ের বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয়। যেমন: *ফাদুঙ, দেনদাউ, গাবিং* ইত্যাদি গোত্রে মেয়ে সন্তানরা মায়ের বংশ পরিচয়ে পরিচিত হন। ত্রিপুরা জাতি ৩৬ দফা বা গোত্রে বিভক্ত। এগুলি হলো: *গুরপাই, রিয়াং, খালি, জমাতিয়া, নাইতং, কেওয়া, কেমা, দেনদাক, গাবিং, আসলং, তংপাই, আনোক, ফাতং, গর্জং, খাকুলু, কলই, মোকছাক, মুইচিং, উসুই, গাইগ্রা, বেরী, রুক্কিনী, মলসম, হারবাং, রংচের, বঙ, জানতং, চরই, দাম্পা, মংবাই, হালাম, কলি, মুরাসিং, মাখ্রা* এবং *মাইপালা*।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী কৃষি কাজ ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক কাজের সাথে যুক্ত থাকে। অনেক সদস্য হালকা মটরযান ও অটোরিক্সা চালায়। খাগড়াছড়ি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী। এ সমাজের একজন সম্মানিত সদস্য হলেন প্রভাংশু ত্রিপুরা যিনি বাংলা একাডেমি পুরষ্কারপ্রাপ্ত। ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে এই প্রবীণ সদস্যের একচ্ছত্র অবদান রয়েছে। ত্রিপুরা সম্প্রদায় ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু ধর্মালম্বী। সমাজের মূলধারার হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে অনেক মিল রয়েছে। জাতিগত পরিচয়ে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠী হিসাবে উপস্থাপন করলেও সমাজ-সংস্কৃতির অনেক কিছু প্রথাগত হিন্দু ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সনাতন প্রথা সবচেয়ে বেশি বিরাজমান। মুলধারার বাঙ্গালী হিন্দুর সাথে অনেক বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। বাঙ্গালী হিন্দু সংস্কৃতিতে

গরু ও শুকরের মাংস খাওয়া নিরুৎসাহিত করা হয়। কিছু নিচু বর্ণের হিন্দুর মধ্যে শুকর পালন ও খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শুকর পালন ও খাওয়া অনেকাংশে নিষিদ্ধ বলা চলে। কিন্তু ত্রিপুরা সমাজে শুকর পালন ও ভক্ষণ বৈধ। অনেকে গরু পালন করে ও ভক্ষণ করে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে শতশত বছর ধরের বসবাস করে আসছে। বসত ভিটা ও চাষের জমি ঐতিহ্যগত ব্যবহারের প্রথা অনুযায়ী ব্যবহার করে আসছে। জমির কোন লিখিত দলিল তাদের কাছে নেই। তবে দলিল না থাকলেও তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে জমির সীমানা আছে যা তারা জানে কোনটা কার জমি যেটি উহ্য। উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন সংস্থা জমি গ্রহণ করলেও তার বিনিময়ে জমি বা নগদ টাকা প্রদান করে। এক্ষেত্রে সমস্যা হল কৃষি জমি হারানোর ভয় থাকে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য খানাজরিপ পরিচালনা করা হয়। নিচে এর থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হল-

সারণী ৪.১৩ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক আয়

বার্ষিক আয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতাংশ
৫০০০০-৯৯০০০	৬	২০.০
১০০০০০-১৪৯০০০	১৫	৫০.০
১৫০০০০-১৯৯০০০	৮	২৬.৬
২০০০০০-২৪৯০০০	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০

গড় আয় ১৪৭৭১২.৬৩ টাকা (উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৪.১৪ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক ব্যয়

বার্ষিক ব্যয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতাংশ
৫০০০০-৯৯০০০	১১	৩৬.৬
১০০০০০-১৪৯০০০	৮	২৬.৬
১৫০০০০-১৯৯০০০	৯	৩০.০
২০০০০০-২৪৯০০০	২	৬.৬
মোট	৩০	১০০

গড় বার্ষিক ব্যয় ১৩৩৭৯৬.৬৬ টাকা (উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরা খানার বার্ষিক আয় ও ব্যয় উপস্থাপন করা হয়েছে সারণী ৪.১৩ ও ৪.১৪ তে। দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ পঞ্চাশ শতাংশ ত্রিপুরা খানার বার্ষিক আয় এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকার মধ্যে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অর্থাৎ ২৬.৬ শতাংশ খানার বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ থেকে প্রায় দুই লক্ষের মধ্যে। অপরদিকে সারণী ৪.১৪ তে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ত্রিপুরা খানার বার্ষিক ব্যয় পঞ্চাশ হাজার থেকে নিরানব্বই হাজারের মধ্যে। ত্রিপুরাদের গড় বাৎসরিক আয় ১৪৭৭১২ টাকা এবং গড় বাৎসরিক ব্যয় ১৩৩৭৯৬ টাকা। এই নৃগোষ্ঠীর বাৎসরিক গড় আয়ের অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা বেশি হল নূন্যতম আয় এবং বাৎসরিক গড় ব্যয়ের অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা বেশি বাৎসরিক নূন্যতম ব্যয়। অন্যদিকে বাৎসরিক সর্বোচ্চ আয় হল আড়াই লক্ষ আর সর্বোচ্চ বাৎসরিক ব্যয় দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার।

৪.৪.২ জীবন-জীবিকা

খাগড়াপুর ও খাগড়াছড়া গ্রামের ত্রিপুরাদের প্রধান পেশা কৃষি। কৃষির মধ্যে রয়েছে জুমচাষ, লাঙ্গলচাষ ও ফলবাগান চাষ। এ সব চাষের সাথে জড়িত চাষীদের বাইরে রয়েছে চাকরীজীবী, কতিপয় ব্যবসায়ী ও দিনমজুর। এছাড়া সমাজে আর একটি পেশাজীবী রয়েছে যারা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তারা জঙ্গল থেকে লাকড়ি, শন, তরকারী ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিক্রি করে জীবনধারণ করে। ত্রিপুরা জাতির মাঝে ব্যবসা করে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম। সে কারণে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দৈন্যতা খুব বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

সারণী ৪.১৫ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পেশা

পেশা	গণসংখ্যা	শতাংশ
কৃষি (নিজ জমি)	৬	২০.০
বর্গা চাষি	১	৩.৩
কৃষি শ্রমিক	৩	১০.০
রিক্সা/ ভ্যান চালক	১	৩.৩
মোটর চালক	০	০.০
সরকারি-বেসরাকারি চাকুরিজীবী	৩	১০.০

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	৪	১৩.৩
গৃহিণী	৫	১৬.৭
বেকার	৩	১০.০
ছাত্র	৪	১৩.৩
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক তথা ২০ শতাংশ চাষাবাদ করে (সারণী ৪.১৫)। আর ৩.৩ শতাংশ বর্গা চাষ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পার্বত্য অঞ্চলে বর্গার ধারণা সমতলের মত নয়। কিন্তু খাগড়াছড়ি সদরের পাশে যেখানে ত্রিপুরাদের অবস্থান সেখানে অনেক সমতলী জমি আছে। এগুলো অনেক সময়ে বর্গা দেয়া হয়। আবার অনেকের জমি সরকার অধিগ্রহন করেছে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য। ফলে দেখা যায় এসব ত্রিপুরারা অন্যের জমিতে কাজ করছে। ত্রিপুরাদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক হল গৃহিণী। এরা গৃহিণী হলেও আয় বর্ধক কাজ তারা করে থাকে। চাষের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা নারীরা বিশেষ অবদান রাখে। ত্রিপুরা সমাজে ছোটখাট দোকান আছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা হল ১৩.৩ শতাংশ। এই দল মূলত খাগড়াছড়ি বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ব্যবসা করে। এদের পণের মধ্যে বেশিরভাগই হল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য। ত্রিপুরাদের মধ্যে ১০ শতাংশ উত্তরদাতা পাওয়া গেছে যারা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। আলুটিলা পাহাড়ের বিপরীতে অবস্থিত খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি সড়কের ত্রিপুরা পাড়ায় ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারি পাওয়া গিয়েছিল।

জুম চাষ ত্রিপুরাদের জীবন-জীবিকার প্রধান পেশা। সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অতীতে মূলত জুম চাষের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। জুমের উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরাদের অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ত্রিপুরাদের নাচ, গান, ছড়া, গল্প, মূল্যবোধ, বাদ্য-যন্ত্র, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে জুম চাষকে কেন্দ্র করে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কাছে জুমচাষ যেমনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজার ব্যবস্থা তেমনি তাদের সংস্কৃতির জগতটাও এই জুমচাষকে কেন্দ্র করে। এবং একেঅপরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রও রয়েছে জুমচাষকে কেন্দ্র করে। জুমচাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা জুমিয়ারা বিভিন্ন আচার-বিশ্বাস ও পূজা-পার্বন সম্পন্ন করে থাকে (ত্রিপুরা ২০১৬, ত্রিপুরা ১৯৭৮)।

জুমজমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা বেশ কিছু আচার-বিশ্বাস মেনে চলে। যেমন- স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পাহাড় পছন্দ করে বিশেষ একটি পূজা সম্পাদনের মাধ্যমে পাহাড় নির্ধারণ করে বাড়িতে ফিরতে হয়। এটাকে ত্রিপুরা ভাষায় *'লাওয়া*

কাইনাই' বলা হয়। সাধারণত দূর্গা পূজার দশমির দিনে এ কার্য সম্পাদন করতে হয়। এই কার্যটি সম্পাদন করতে জুমিয়া গৃহস্থকে পছন্দকৃত পাহাড়ের অল্প কিছু জঙ্গল পরিস্কার করে সেখানে পাহাড় বা বন দেবতার প্রকৃতিস্বরূপ তিন টুকরা বাঁশের চোঙা মাটিতে গেড়ে, তাতে পাতা বিছিয়ে, পাতায় তিন টুকরা সেই পাহাড়ের মাটি বিশেষ করে কেঁচোর মাটি রেখে দিয়ে বন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে পাহাড়টি জুম চাষ করার জন্য অনুমতি নিতে হয়। পূজায় দেয়া তিন টুকরা মাটি বাড়িতে নিয়ে এসে রাতে বালিশের নিচে রেখে ঘুমাতে হয়। আর ওইদিন জুমিয়া স্বামী-স্ত্রী স্নান করতে পারবে না। তবে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যিনি রাতে স্বপ্নের মধ্যে বনদেবতার অনুমতির প্রতীক্ষায় থাকবেন বলে দায়িত্ব নেন তিনি ছাড়া বাকীজন স্নান করতে পারবেন। ওই রাতেই বনদেবতা বিভিন্নরূপে জুমিয়া স্বামী-স্ত্রীর স্বপ্নে দেখা দিবে। নির্ধারণ করা পাহাড়টি কোনরকম দোষ-ত্রুটি না থাকে তাহলে তারা ইতিবাচক স্বপ্ন দেখতে পায় আর দোষ-ত্রুটি থাকলে নেতিবাচক কিছু স্বপ্নে দেখতে পাওয়া যায়। ওই এক রাতের স্বপ্নের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ-নির্বাচন করে আসা পাহাড়টিতে তারা সে বছর জুমচাষ করতে পারবে কি না। আবার এখানে বিশ্বাসের মর্যাদাও দেখা যায়। নির্বাচিত পাহাড়টিতে *'লাওয়া* কাইনাই' চিহ্ন দেখতে পেলে ওই পাহাড়টি আর কেউই তাতে হাত দেয়না।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের দিকে জুমের জঙ্গল কাটা শুরুর আগে ত্রিপুরা গ্রামগুলোতে *'কের পূজা'* উৎসব শুরু হয়। ত্রিপুরাদের প্রধান দেবতা কেরপূজাও জুমচাষ ও জীবন-জীবিকাকে কেন্দ্র করে সম্পাদন করা হয়। কের পূজা মূলত প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের প্রধান দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য হয়ে থাকে। যাতে, জঙ্গলে বসবাসকারীদের জীবিকার তাগিদে জুমে-জঙ্গলে কাজ করার সময় কোনো জন্তু-জানোয়ার দ্বারা আক্রমণের শিকার না হয়, কাজ করার সময় যেন দুর্ঘটনা না ঘটে, জুমচাষে যেন ভাল ফলন উৎপাদন করা যায়। গ্রামবাসীরা সারা বছর মঙ্গলজনকভাবে বাঁচতে পারে ইত্যাদি এসব কারণে কেরপূজা দেয়া হয়। কেরপূজা যেদিন হবে তার আগের রাত থেকে বেশকিছু নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি পালন করতে হয় সংশ্লিষ্ট পাড়াবাসীকে।

পূজার আগের দিনে সন্ধ্যাকাশে তারা উদয় হবার পর থেকে এবং পূজার দিনের সন্ধ্যা তারা দেখা না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গ্রামে বাইরের কোনো লোক প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি গ্রামের কেউ বাইরে থাকলে সেই ব্যক্তিও প্রবেশ করতে পারবে না। এবং গ্রামের লোকজনও বাইরে বেরোতে পারবে না। যদি কেউ ভুলবশত বা অজান্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে জরিমানা হিসেবে পূজার সমস্ত খরচ দিতে হবে। যাতে সেই জরিমানার টাকা দিয়ে পুনরায় পূজা দিতে পারে। আর এই কারণে গ্রামে প্রবেশ দ্বারে নোটিশসমেত বেড়া বা চিহ্নিত করে প্রবেশ দ্বার আটকানো থাকে। সম্ভব হলে প্রতি প্রবেশ দ্বারে লোক পাহারা দিয়ে রাখা হয়। এবং *কেরপূজার* পূর্বের দিনে সন্ধ্যা হবার আগেই ঘরে যদি জঙ্গলী শাক-সবজি, লতা-পাতা থাকে সেগুলো ঘরের বাইরে অথবা ঘরের চালের

উপর রাখতে হয়। সেইদিন জঙ্গলী শাক-সবজিও ভোজন করা নিষেধ থাকে। এভাবেই ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকেরা *কেরপূজা* সম্পাদন করে থাকে (বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ১৯৮১)।

ত্রিপুরা জুমিয়ারা জুম জঙ্গল কাটার প্রথম দিন বেশ কিছু আচার-বিশ্বাস পালন করে থাকে। প্রথম দিন জঙ্গল কাটা শুরু করতে হয় বিজোড় সংখ্যা শ্রমিক দিয়ে। তিনজন, পাঁচজন, সাতজন এভাবে। প্রথম দিন যতজন দিয়ে শুরু হয়েছে ঠিক সেই সংখ্যার লোক নিয়ে কাটা শেষ করতে হবে। মাঝখানের দিনগুলোতে ইচ্ছামত লোক জুম কাটার কাজ করতে পারে। আর প্রথম দিন ভাতের সাথে তরকারি নিতে হয় ছাইয়ের পানি দ্বারা রান্না করা তরকারি এবং দুধ। তাঁদের বিশ্বাস ছাই পানির তরকারির ভাত খেয়ে জঙ্গল কাটা শুরু করলে কাটা জঙ্গল পোড়ানোর সময় সম্পূর্ণ ছাই হয়ে দুধের মত সাদা হবে, এবং শত্রু, জীব-জন্তু ও ক্ষতিকর পোকামাকড়ও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এক থেকে তিন মাস কাটা জঙ্গল রোদে শুকানোর পর চৈত্রের শেষদিকে তা আগুনে পোড়ানো হয়। জুমচাষের কাটা জঙ্গল আগুন দেয়ার সময় কিছু আচার-বিশ্বাস দেখা যায়। প্রথমে দুই-তিনজন সারা কাটা জঙ্গলের পাহাড় হেঁটে হেঁটে সেখানকার জীব-জন্তু, পোকামাকড় তাড়াবে। যাতে আগুনে উপকারী কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি মারা না যায়। তারপর নিয়ম অনুযায়ী জুম পোড়া দেয়। আগুন না নেভা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে আগুন নেভানোর পর পোড়া জুম পাহাড়ে মিশ্র শস্যবীজ ছিটিয়ে দেয়া হয়। চৈত্রের শেষ দুইদিন ও বৈশাখের প্রথম দিন *বৈসু* (বিজু, সাংগ্রাই ইত্যাদি) উৎসব করার পর বাংলা নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে পুরোদমে জুমচাষের কাজ শুরু হয়। পুড়ে না যাওয়া উচ্ছিষ্টাংশ ফেলে দিয়ে পরিস্কার করে বীজ বপন করা, নিড়ানী, ধান কাটা, ধান বহন করে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজগুলো তারা শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে কোনো টাকার বিনিময়ে শ্রম ক্রয় করে না। তবে, ইদানিংকালে শ্রম ক্রয় করেও জুম চাষের কাজগুলো করা হচ্ছে।

আষাঢ় মাসের সাত তারিখে ত্রিপুরা জুমিয়ারা কেউই জুমে বা জমিতে কোথাও কাজ করে না। এই দিনকে তাঁরা 'আলপালনি' বা 'আলপালন' উৎসব হিসেবে পালন করে থাকে। ত্রিপুরাদের বিশ্বাস, প্রতি বছর এদিনে ধরিত্রী (পৃথিবী) মায়ের ঋতুস্রাব হয়ে থাকে। আর ঋতুস্রাব কালীন একজন নারীর দেহ-মন যেমনি একটু অস্বাভাবিক থাকে তেমনি পৃথিবীরও অস্বাভাবিক হয়ে থাকে বলে তাঁদের বিশ্বাস। তাই এই দিনে পৃথিবীর কোনো ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী কাজ করতো না। উদ্দেশ্য হলো মাটির ওপর আঘাত না দেয়া। মাটি কাটা, গাছ কাটা, হাল চাষ এমনকি গাছের ফলমূলও ছিড়ে না তারা এই দিনে। এইদিন ত্রিপুরাদের প্রায় ঘরে ঘরে মাংস, পিঠা-পায়েস, বিন্নিভাত, মদ ইত্যাদি ভোজন চলতে থাকে সারাদিন।

জুমে নতুন যেকোনো ফসল খাওয়ার আগে প্রথমে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে উৎস্বর্গ করা হয়। নতুন শাক-সবজিগুলো ছড়া বা নদীর পাড়ে পাতা বিছিয়ে রেখে দিয়ে এক ধরণের পূজা দেয়া হয়। তারপরেই নিজেরা জুমের নতুন ফসল মুখে তোলে। জুম পাহাড়ে যখন ধানের শীষগুলো সোনালী রং ধারণ করে সেসময় আরেকটা উৎসবে ধুম পড়ে যেত ত্রিপুরা জুমিয়াদের ঘরে ঘরে। Mai ba lanai (মাই বা লানাই) বা Mai khulumwng (মাই খুলুমং) এটা ধন সম্পদের দেবী Mailongma (লক্ষ্মীদেবী)'র উদ্দেশ্যে পূজা সম্পাদন করা। জুমের নতুন ধান উত্তোলনের পর নতুন ধানের চাউলের মদ তৈরি করে পরিবারের স্বর্গীয় পিতা-মাতা বা দাদা-দাদীর উদ্দেশ্যে 'Chok Chemnai' (মদ উৎস্বর্গকরণ) আয়োজন করে গ্রামের যারা যারা মদ খায় তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয়। কোন সময় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা বাণিজ্যিকভাবে মদ তৈরী করতো না। এভাবে উৎসব-উপলক্ষে মদের আয়োজন করে সবাই মিলে আনন্দ করতো।

৪.৪.৩ সংস্কৃতি

ত্রিপুরাদের নাচ ও গান অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ঐতিহ্যবাহী সেসব গানের মধ্যে ইতোমধ্যে ২টি গীতিকাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই দুটি গ্রন্থের নাম ১) *লাংগৈ রাজানো বুমানি* ও ২) *পুন্দা তানমানি*। এ ধরণের আরো বেশ কয়েকটি গীতিকাব্য যেমন ১) *গঙ্গা তলীয় থাঁমানি*, ২) *গোঁসাই রাজ্যঅ থাঁমানি*, ৩) *কুচুক হা সিকাম কামানি*, ৪) *হায়া বিদেশী থাঁমানি*, ৫) *খুন কামানি* ইত্যাদি সাহিত্য সমৃদ্ধ গীতিকাব্য ত্রিপুরা জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। ত্রিপুরাদের নাচ-গান পরিবেশিত হয় সাধারণত বিবাহ অনুষ্ঠানে, পূজা পার্বণে ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে। ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী নাচগুলির মধ্যে *গড়িয়া* নৃত্য, *কাথারক* নৃত্য বা *বোতল* নৃত্য, *হজাগিরি* নৃত্য, *কেরপূজা* নৃত্য, *মাইমিতা* নৃত্য অন্যতম।

ত্রিপুরাদের বয়নশিল্প ও পোশাকের নকশা বেশ সমৃদ্ধ। নানা ধরণের পরিধেয় বস্ত্র প্রতিটি ঘরে তৈরি হয়ে থাকে। ত্রিপুরারা জুম চাষ করে। জুমচাষের জমি থেকে কার্পাস উৎপন্ন হয়। এই কার্পাস থেকে ত্রিপুরা রমণীরা সুতা উৎপাদন করে। কার্পাস বা তুলা থেকে সুতা কিভাবে তৈরি করা হয় এবং সুতায় রং করার প্রযুক্তি ত্রিপুরা রমণীরা প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার করে আসছে। এই রং করা সুতা দিয়ে ত্রিপুরা রমণীরা সুন্দর সুন্দর নকশা সম্বলিত বিভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র তৈরি করে থাকে। ত্রিপুরা নারীরা অলংকার প্রিয়। ত্রিপুরা নারীদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অলংকার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে- *বেংকি*, *বারা*, *কুনচি*, *তাল*, *খার্চী*, *আঁচলী*, *রাংবাহাতাং*, *তয়া*, *ওয়াখুম*, *সুরাম*, *সাংগে*,

নাকে, লীক, য়াইতাম, চাংখুং, বাতাং, কুংবার, আংতা, তালবাতাং, খানাইসেপ ইত্যাদি। অতীতে ত্রিপুরী নারীদের মতো পুরুষেরাও অলংকার ব্যবহার করতেন ।

ত্রিপুরা সমাজে শিশু জন্ম হলে জন্মের পর পর *গুমাচক* (দাত্রী), *অচাই* (পৌরহিত) মিলে *ছড়া* বা নদীতে যেয়ে পূজা দিতে হয়। এ পূজাকে বলা হয় *কউমা বৌতৈ লানাই*। হলুদ, *সুকই বমলক* ও পানি মিশিয়ে *কউমা বৌতৈ* তৈরি করতে হয়। সেই *কউমা বৌতৈ* বাঁশের চোঙায় করে বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। পূজা দেওয়ার পর সেই বাঁশের চোঙার *কউমা বৌতৈ*-এর সাথে পূজায় বলি দেওয়া মুরগির রক্ত মিশাতে হয়। *গুমাচৌকসহ* যে সব নারী-পুরুষ সন্তান প্রসবের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাদের সবার শরীরে *কউমা বৌতৈ* ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করতে হয়। শরীর থেকে নাভি পৃথক হবার পর আবার মুরগি কেটে নদী বা *ছড়ায়* গিয়ে পূজা দিতে হয়। ত্রিপুরা সমাজে শিশুর জন্মসংক্রান্ত সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হল *আবিয়াক সুনায়* পান্ডা বা নামকরণ অনুষ্ঠান। ছাগল, শূকর, মুরগি কেটে এই *আবিয়াক সুনায়* অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরারা সাধারণত মৃতদেহকে দাহ করে। একেবারে কম বয়সী শিশু মারা গেলে বা কোন লোক দুরারোগ্য বা ছোঁয়াচে রোগ যেমন কলেরা, বসন্ত, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তাকে কবর দেয়া হয়। রীতি অনুসারে মৃতব্যক্তির সন্তানরাই প্রথম চিতায় অগ্নিসংযোগ করে। মৃতব্যক্তির সন্তান না থাকলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা প্রথম অগ্নিসংযোগ করে। সামাজিক রীতি অনুসারে মৃতদেহ দাহ করার সাতদিন অথবা তেরদিন পর শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে হয়।

বিশেষ কোনো কার্য উপলক্ষে আয়োজিত ভোজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আয়োজক কর্তৃক আহবান করাকে নিমন্ত্রণ বলে। ত্রিপুরাদের জনজীবনে নিমন্ত্রণ সংস্কৃতিকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যে ভোজানুষ্ঠানের সাথে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, অনুপ্রেরণা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে ত্রিপুরা ভাষায় এমন ভোজানুষ্ঠানকে *পানা* বলে। যেমন জন্মবার্ষিকী ও বিবাহ অনুষ্ঠান। আর যে ভোজানুষ্ঠানের সাথে দুঃখ, বেদনা, শোক বিরহ নিহিত রয়েছে এমন ভোজানুষ্ঠানকে *সামৌং* বলে। ত্রিপুরাদের জীবন ও জীবিকা, আচার আচরণে গীতি নৃত্য ও বাদন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে জড়িয়ে আছে। লোকাচারে কোন ত্রিপুরা যখন বিবাহের অনুষ্ঠান করে তখন তাকে অবশ্যই গীতি বাদ্য ও নৃত্য সহকারে অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে হয়। এমনকি যখন কোনো ত্রিপুরা জন্মগ্রহণ করে তার আগমনী বার্তাও ঘোষিত হয় শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে। আর যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তারও সমাপ্তি টানা হয় গীত, বাদ্য ও নৃত্যের মাধ্যমে। লোক নৃত্যে ত্রিপুরাদের রয়েছে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্যের মধ্যে *সিমতুং, কাথারক, সাকচরাই,*

চুমলাই, কেরপূজা, গোমতী, নাইরাং, হাচুকমা, সিবরাই, জুয়াংফা, সাকাল, গড়িয়া, হজাগিরি, লেবাং, মামিতা, ত্রিপুরেশ্বরী, মাইখুলুম, হাবা, খুমকামৌং, অনজালা উল্লেখযোগ্য।

ত্রিপুরাদের প্রধান সামাজিক উৎসবের নাম *বৈসু*। ত্রিপুরারা তিনদিন ধরে এই উৎসব উদযাপন করে থাকে। এগুলো হল ১) হারি বৈসু, ২) বৈসুমা ও ৩) বিসিকাতাল। পুরনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোকে কেন্দ্র করে এ ঐতিহ্যবাহী উৎসব উদযাপন করা হয়ে থাকে। এই তিন দিনে বিন্নি চাল দিয়ে নানান ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। নারী পুরুষেরা নূতন নূতন কাপড়-চোপড় পরিধান করে আনন্দে মেতে উঠে। এদিনে গান বাজনা হয়, খেলাধুলা হয়। বৈসু উপলক্ষে ৫/৭ দিন গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করা হয়। দল বেঁধে গড়িয়া দল গ্রামে গ্রামে ঘুরে গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করে। *বৈসুমার* দিনে ধনী-গরিব সবাই সামর্থ্যনুযায়ী নানা ধরনের পিঠা, মদ, সরবত, পাঁচন ইত্যাদি অতিথিদের পরিবেশন করে। তবে বৈসুমার দিনে প্রানীবধ একেবারেই নিষিদ্ধ। বৈসুমার দিনেও গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করা হয়। গড়িয়া নৃত্য ছাড়াও পালা গান ও বিভিন্ন খেলাধুলা সারাদিন ধরে চলে। বিসিকাতাল দিনে নববর্ষকে স্বাগত জানানো হয়। এদিকে নতুন বছরে সুন্দর ও নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায় সমাজের সকল বয়সের মানুষ বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট আর্শীবাদ গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতী নতুন কাপড়-চোপড় পরিধান করে গ্রামের ঘরে ঘরে হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পশু-পাখির খাবার বিলিয়ে দেয় এবং ত্রিপুরা সামাজিক রীতি অনুসারে বয়স্কদের পা ধরে সালাম করে আর্শীবাদ গ্রহণ করে। এদিনে পরিবারের সকল সদস্যের মঙ্গলের জন্য পূজা ও উপাসনা করা হয়।

৪.৪.৪ ভাষা

ত্রিপুরা ভাষার নাম *ককবরক*। এ জনগোষ্ঠীর ভাষা ককবরক হল সিনো-টিবেটান পরিবারের তিব্বতী-বর্মী উপ-পরিবারের ভাষা। ত্রিপুরাদের লোক-সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। যেমন *পুন্দা তান্নায়, লাংগই রাজানো বুমানি, হায়া হা সিকাম কামানি, খুম কামানি গাঁ তলিয়ো থাঁমানি* ইত্যাদি সমৃদ্ধ গীতিকাব্য। এছাড়া ত্রিপুরাদের বহু রূপকথা, লোককাহিনী, ধাঁধাঁ, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদিও বেশ সমৃদ্ধ (ত্রিপুরা ২০১৭)। *ককবরক* ভাষাটি বিভিন্ন রূপে ১ম শতাব্দী থেকেই এই অঞ্চলে প্রচলিত। ককবরক ভাষায় দু ধরনের লিপিতে লেখার প্রচলন আছে রোমান ও বাংলা। *ককবরক* ভাষা এই দুই লিপির কোনটিতে লেখা উচিত, তা নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্ক আছে (প্রথম আলো)। ঐ শতকে ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস লিখিত আকারে প্রথম সংরক্ষণ করা শুরু হয়। যে লিপিতে ককবরক ভাষাটি লেখা হত, তার নাম কোলোমা লিপি। ত্রিপুরার রাজাদের কাহিনী রাজরত্নকর নামের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়।

বইটি আদিতে দুর্লবেন্দ্র চোনতাই কোলোমা লিপি ব্যবহার করে *ককবরক* ভাষাতে রচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে *শুক্রেশ্বর* ও *বাণেশ্বর* নামের দুই ব্রাহ্মণ গ্রন্থটিকে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় ও পরে ১৪শ শতকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। *ককবরক* ভাষায় লেখা আদি গ্রন্থটির আজ আর কোনও অস্তিত্ব নেই। ১৪শ শতক থেকে ২০শ শতক পর্যন্ত ককবরক ভাষাকে স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষায় পর্যবসিত করা হয় এবং বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরার রাজদরবারের ভাষা বানানো হয়।

৪.৪.৫ ধর্ম

ত্রিপুরারা মূলত সনাতন (হিন্দু ধর্ম) ধর্মাবলম্বী। তবে বর্তমানে বান্দরবান জেলার ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায়ও ত্রিপুরাদের একটি অংশ বর্তমানে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল ত্রিপুরা সনাতন ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকেরা দূর্গাপূজা, কালী পূজা, রাজ মেলা, স্বরস্বতী পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। অপরদিকে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা বড়দিন পালন করে। এছাড়াও ত্রিপুরারা বহুবিধ পূজা-পার্বণ করে থাকে। পূজা-পার্বণের মধ্যে ক) *কের পূজা, খ) কাথারক পূজা, ৩) চুমুলাই পূজা, ৪) সাকচরাই, ৫) নাইরাং, ৬) খ্রাঙ পূজা, ৭) মৌতাই কাইমানি, ৮) খার্চি পূজা, ৯) গড়িয়া পূজা* ইত্যাদি অন্যতম। ত্রিপুরীদের রয়েছে বৈচিত্র্যমন্ডিত উৎসব ও পূজা পার্বণ। প্রধান উৎসব ও পূজা হলো: বৈষু, কের, গোমতী, সিবরাই, খাচী, হাকা। প্রধান উৎসবের নাম বৈষু। ত্রিপুরাব্দ, মগাব্দ ও বঙ্গাব্দ এই তিনটি বর্ষপঞ্জিকাই সৌরবর্ষ। ত্রিপুরীদের বৈসু উৎসবে যে অনুষ্ঠান করার রীতি রয়েছে তার পুরোটাই প্রকৃতি জগতের রূপ-রসের ব্যঞ্জনায় পুষ্ট। *কের* শব্দের অর্থ গন্ডি বা বেষ্টনি দেওয়া। প্রতি বছর ত্রিপুরাদের *তালতুক* মাসের (*শকাব্দের* শ্রাবণ) কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিনে কের পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা জাতি গোমতী নদীকে দুগ্ধ স্রোতরূপী মাতৃনদী হিসাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করে থাকে। গোমতী পার্বত্য কন্যা ত্রিপুরা সুন্দরী নামে পরিচিত। গোমতী পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরাব্দের *তালতুং* (*শকাব্দের* জ্যৈষ্ঠ) মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। ত্রিপুরাব্দের *তাল্লাং* (*শকাব্দের* ফালগুন) মাসের উত্তরায়ন চতুর্দশী তিথিতে *সিবরাই* পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর ত্রিপুরাব্দের *তালয়ুং* (*শকাব্দের* আষাঢ়) মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে চতুর্দশ দেব মন্দিরে ৭ দিন ব্যাপী তীর্থ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মন্দিরে যে পূজানুষ্ঠান সম্পাদিত হয় তাই খাচী পূজা। হাবা পূজা মানে কৃষি পূজা। কৃষি ক্ষেত্র প্রস্তুত করার আগে ধরিত্রীকে আহবান করে পূজা উৎসব করা হয়। এর নাম হাবা পূজা উৎসব। ত্রিপুরাদের জনজীবনে দুধরণের অর্ন্ত্যোষ্টিক্রিয়া প্রচলিত, যথা দাহক্রিয়া ও শ্রাদ্ধক্রিয়া এবং তারা নারী ও পুরুষের জন্যে দুধরণের শশ্মান তৈরি করে থাকে (ত্রিপুরা ১৪১৩ ত্রিপুরাব্দ)।

৪.৪.৬ ঘরবাড়ির ধরণ ও মালিকানা

ত্রিপুরা সমাজে ঘর বাড়ির ধরণ অতি সাধারণ। এদের ঘরের ধরন মূলধারার বাঙ্গালীদের মত অনেকটা। পার্থক্য হল এদের ঘরের অবস্থান মাটি থেকে উঁচুতে হয়ে থাকে। ঘরে উঠার জন্য মাটির সুদর্শন সিঁড়ি কেটে রাখে। অনেক ত্রিপুরার ঘরের দেয়াল মাটি বা বাঁশ দিয়ে তৈরি। ত্রিপুরাদের ঘর তাদের অর্থনৈতিক দৈন্যতা প্রকাশ করে অনেকাংশে। ঘরের মেঝে সাধারণত মাটির তৈরি থাকে। বাড়ির আঙ্গিনায় ছোট উঠান থাকে কারো কারো। এরা পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার কারণে পিতার সূত্রীয় জ্ঞাতিজনরা একসাথে একই বাড়িতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বসবাস করে। অধিকাংশ বাড়ি পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত। সমতলে ঘরবাড়ির অবস্থান খুবই কম। এদের কৃষি জমি বিশেষ করে ধান চাষের জমি সমতলে অবস্থিত। জুমের জমি পাহাড়ে অবস্থিত। ঘর বাড়িও পাহাড় বা অপেক্ষাকৃত উঁচুতে অবস্থিত। এর কারণ হল বন্য জন্তু থেকে নিরাপদ থাকা। ঘর উঁচুতে হওয়ার কারনে এদেরকে পানির সমস্যায় পড়তে হয়। যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা সমতল জমিতে মোটর বসিয়ে পানি উপরে ঘরে নিয়ে আসে। আর বাকিরা সাধারণত পানি সংগ্রহ করে থাকে। ঘর তৈরিতে ত্রিপুরাদের মধ্যে আধুনিক কৌশলের ব্যবহার মাত্রা খুবই কম। সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কিছু ঘর পাওয়া যায় যাতে সিমেন্ট বালি ব্যবহার হয়েছে।

ছবি ৪.৩ঃ ত্রিপুরা ঘরের ধরণ

খানাজরিপ থেকে প্রাপ্ত সারণী ৪.১৬ এর মাধ্যমে দেখা যায় যে ত্রিপুরা সমাজের উত্তরদাতাদের মধ্যে বিল্ডিং এর তৈরি ঘর কারো নেই। সবচেয়ে বেশি সংখ্যকের (৭৩.৩%) ঘরের ছালা টিনের এবং দেয়াল টিন, মাটি বা বেড়ার। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ২৩.৩ শতাংশের ঘর আধা পাকা যার ছালা টিনের।

সারণী ৪.১৬ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ঘরের ধরণ

ঘরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
টিন শেড় (পাকা/সেমি পাকা ওয়াল)	৭	২৩.৩
টিন শেড় (টিন দিয়ে ঘেরা)	১	৩.৩
টিন শেড় (মাটি, কাঠের বেড়া)	২২	৭৩.৩
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বাড়ির মালিকানা নিয়ে বিপরীতমুখী তথ্য পাওয়া যায়। অনেক ত্রিপুরা অভিযোগ করেন যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ত্রিপুরাদের জমি অধিগ্রহণ করার ফলে তারা তাদের অনেক জমি হারিয়েছেন। যে সব জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছে সেগুলোতে ত্রিপুরাদের মালিকানা ছিল ঐতিহ্যগত ভোগ-দখল সূত্রে কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন লিখিত দলিল ছিলনা। এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত বিষয় হল এই যে- মালিকানার স্বপক্ষে লিখিত দলিল না থাকা সত্ত্বেও সরকার ভোগ-দখলকারী ত্রিপুরাদেরকে জমির মূল্য পরিশোধ করেছে। ত্রিপুরাদের কেউ কেউ মনে করেন মালিকানা দাবীর জন্য লিখিত দলিল থাকতে হবে, আবার অধিকাংশ মনে করেন তাদের লিখিত কোন কাগজপত্র বা দলিল দরকার নেই। উত্তরাধিকারসূত্রে কেউ কোন জমি ভোগ করলে সে তার মালিক এবং একইভাবে কেউ চাষ অযোগ্য দুর্গম পাহাড়কে চাষাবাদের উপযুক্ত করলে সে পাহাড়ের মালিকানা তার। যাহোক উক্ত অধ্যয়নে খানাজরিপ থেকে প্রাপ্ত সারণী ৪.১৭ তে দেখতে পায় যে ত্রিপুরাদের মাত্র ১৬.৭ শতাংশের নিজের জমিতে বাড়ি রয়েছে। কিন্তু সর্বোচ্চ সংখ্যক ত্রিপুরা অধিবাসীর বাড়ি সরকারি জমিতে।

সারণী ৪.১৭ঃ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বাড়ির মালিকানা

বাড়ির মালিকানা	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজের জমিতে নিজের বাড়ি	৫	১৬.৭
সরকারি বাড়ি	২	৬.৭
সরকারি জমিতে নিজের বাড়ি	২৩	৭৬.৭
	মোট= ৩০	মোট=১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৪.৪.৭ সামাজিক সহাবস্থান, সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা

এ সমাজে যৌতুক নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে বিনিময় হয় একতরফা। অর্থাৎ শুধুমাত্র ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষকে বা কনেকে উপহার সামগ্রি দিয়ে থাকে। ত্রিপুরা সমাজে এই বিনিময় ব্যবস্থা ***দাপা*** নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় বিয়েতে ছেলেপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে মেয়েপক্ষকে উপহার দিয়ে বিয়ে করতে হয়। ছেলে যত বেশি উপহার দিতে পারবে ততবেশি কনেকে সম্মান জানানো হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা হয় ছেলে মেয়েকে কেমন উপহার দিল এবং ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষকে কেমন আপ্যায়ন করল। এ সমাজে ছেলে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে বিয়ে করেনা। বরং মেয়েকে ছেলের বাড়িতে নিয়ে এসে বিয়ে করে এবং সামাজিক ভোজের আয়োজন করে। যদি ছেলে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে তবে সেক্ষেত্রে ছেলেকে ঘর জামাই হিসাবে ধরা হয় যার প্রচলন খুব কম। সামাজিক জীবনে এরা একে অপরকে উপহার দিয়ে থাকে। এই সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার কারণে সবাই পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতিজনদের সাথে বসবাস করে। তাই দেখা যায় সমাজ জীবনে পিতার দিকের জ্ঞাতিজনদের সাথে লেনদেন বেশি হয়। দৈনন্দিন বিনিময় ব্যবস্থা যেমন আর্থিক লেনদেন, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ধার করা, সংকট মূহুর্তে কোন দ্রব্যাদি ধার করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত নিজ সম্প্রদায়ের সদস্যের থেকে ধার নিয়ে থাকে।

সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ত্রিপুরদের সাথে বাঙ্গালী হিন্দুদের খুব ভাল সম্পর্ক। এই দুই সম্প্রদায় ধর্মীয় বিষয়াবলী ভাগাভাগি করে। ফলে তাদের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ জীবনে মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বাহিরে বাঙ্গালী হিন্দুদের সাথেই তাদের লেনদেন বেশি। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে রাখতে পছন্দ করে। তাই বয়স্করা নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা পছন্দ না

করলেও বাঙ্গালী হিন্দুদের সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে তেমন আপত্তি করেনা। তবে হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও পাশের বাঙ্গালী মুসলিম সম্প্রদায় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে ত্রিপুরাদের ভাল সম্পর্ক আছে। সামাজিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে। অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানেও ত্রিপুরারা অংশগ্রহণ করে। আধুনিকায়নের ফলে এই সমাজে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার মাত্রা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। জ্ঞাতিজনদের সাথে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। এছাড়া জুম চাষ সঙ্কুচিত হওয়ায় কারণে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে উঠছে। এর ফলে দেখা দিচ্ছে প্রতিযোগিতা। সামাজিক সম্পর্ক হয়ে উঠে উঠছে টিকে থাকার লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ।

৪.৫ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার নৃবৈজ্ঞানিক স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই তিন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে নিবিড় ধারণা পেতে আন্তঃসাংস্কৃতিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ জরুরি। কারণ সাংস্কৃতিক তুলনামূলক গবেষণা বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে সহায়ক (বক ২০০৯)। বলার অপেক্ষা রাখেনা - নৃবিজ্ঞানে আন্তঃসাংস্কৃতিক ও তুলনামূলক গবেষণা হল এথনোগ্রাফির মৌলিক বৈশিষ্ট যার মাধ্যমে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং সর্বোপরি সাধারণকীকরণ করা অধিকতর ফলপ্রসু হয়।

৪.৫.১ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো এ তিন সম্প্রদায়কে একদিকে করেছে স্বতন্ত্র এবং অন্যদিকে করেছে পৃথক। আপাতদৃষ্টিতে তিন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও জীবনমান একই সরলরেখায় গাথা মনে হলেও এদের প্রত্যেকের ভেতরকার গল্প বা বয়ান আলাদা। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা হিসাবে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার, মৌখিক ইতিহাস, প্রধান তথ্যদাতা ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে এমিক ও নিগূঢ় বর্ণনা (থিক ডেসক্রিপশন) দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সরলরৈখিক ও বিপরীত সম্পর্ক অনুসন্ধান করা হয়। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়-ব্যয়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সারণী ১৮ তে।

সারণী ৪.১৮ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের বাৎসরিক আয়-ব্যয়

	গড়		সর্বনিম্ন		সর্বোচ্চ	
নৃগোষ্ঠী	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়
চাকমা	২৭০২৩৯.৩০	২১৬৪২৮.৯৬	১২০০০০.০০	১০০০০০.০০	৬৫০০০০.০০	৩৯৬০০০.০
মারমা	২৫৩০৯৬.৬৬	১৯২৮৬৩.০৬	১২৫০০০.০০	১১২০০০.০০	৪৯৬০০০.০০	৩৬৯০০০.০
ত্রিপুরা	১৪৭৭১২.৬৩	১৩৩৭৯৬.৬৬	৭৫০০০.০০	৬০০০০.০০	২৫০০০০.০০	২৩০০০০.০
মোট	২২৩৬৮২.৮৬	১৮১০২৯.৫৬	৭৫০০০.০০	৬০০০০.০০	৬৫০০০০.০০	৩৯৬০০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

প্রত্যেকটা নৃগোষ্ঠীর বাৎসরিক আয়-ব্যয় পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে পূর্বে। সারণী ৪.১৮ থেকে আমরা একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমাদের গড় বাৎসরিক আয় ও ব্যয় বেশি। মোট ৯০ জন অর্থাৎ অধ্যয়নটিতে সকল নৃগোষ্ঠীর খানার বাৎসরিক গড় আয় হল ২২৩৬৮২ টাকা এবং গড় ব্যয় হল ১৮১০২৯ টাকা। খানাজরিপ তথ্যের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কম আয় ও ব্যয় করে। নূন্যতম বাৎসরিক আয়ের দিক দিয়ে মারমাদের নূন্যতম বাৎসরিক আয় ও ব্যয় অন্যদের থেকে বেশি। তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বনিম্ন আয় ও ব্যয় হল ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর। সর্বোচ্চ বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বেলায় চাকমা সম্প্রদায় অবস্থান শীর্ষে।

৪.৫.২ জীবন-জীবিকা

তিন সম্প্রদায়ের আয়ের অন্যতম উৎস হল কৃষি কাজ। এর সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সরাসরি যেমন জড়িত তেমনি পরোক্ষভাবে অনেকের জীবিকা কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। পার্বত্য অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এখানে কৃষি জমি সঙ্কুচিত হয়ে কৃষি নির্ভর উৎপাদন কঠিন হয়ে উঠছে। ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য তিন সম্প্রদায়কে নানবিধ পেশার দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। প্রথাগত জনগোষ্ঠী যারা জীবনধারণের জন্য সরাসরি প্রকৃতির উপর নির্ভর তারা জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা অধিক হুমকির সম্মুখিন (উদ্দিন ২০১৭)। পাহাড় কাটা, পাহাড়ে বসতি

স্থাপন, পরিবেশগত বিপর্যয় ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তিন সম্প্রদায়ের কেউ কেউ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে নানাবিধ পেশায় অভিগমন করছে। কিন্তু এর পরও জুমচাষ পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীসমূহের স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পুঁজিবাজারমুক্ত একটি নিজস্ব বাজার ব্যবস্থা হিসাবে টিকে আছে এখনো। যেখানে সারাবছর পর্যায়ক্রমে ধান, তিল, তুলা, শাক-সবজি, ফুলসহ শতরকমের ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, কেবল লবণ আর জ্বালানী তেল ছাড়া বাকী সবকিছু জুমে উৎপাদন করতো জুমিয়ারা (ত্রিপুরা ২০১৬)।

ফলে খানাজরিপ থেকে জানা যায় (সারণী ৪.১৯) সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৫.৬ শতাংশ চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরার জীবন ধারণের প্রথম অবলম্বন হল কৃষি কাজ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের ১২.২ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত ও সম শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী। মহিলা উত্তরদাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহিণী। তাদের প্রাথমিক পেশা গৃহিণী হলেও তারা বাড়ির আঙ্গিনায় নানা ধরণের ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে যা তাদের আয় উপার্জনে সহায়তা করে। আবার এদের অনেকে কৃষি জুম চাষে অনেকভাবে ভূমিকা রাখে। এছাড়া সমতলের চেয়ে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রকৃতি ও প্রতিবেশের সাথে যেমন অধিক সংগ্রাম করতে হয় তেমনি পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলা সদস্যদেরকে বেশি ভূমিকা রাখতে হয়। কিছু সংখ্যক কৃষি শ্রমিক এবং কিছু আটো রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

সারণী ৪.১৯ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের জীবিকা নির্বাহের উপায়

			নৃগোষ্ঠী			মোট
			চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা	
পেশা	কৃষি (নিজ জমি)	গণসংখ্যা	১০	১২	১	২৩
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	৩৩.৩%	৪০.০%	৩.৩%	২৫.৬%
	বর্গা চাষি	গণসংখ্যা	১	-	৬	৭
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	৩.৩%	-	২০.০%	৭.৮%
	কৃষি শ্রমিক	গণসংখ্যা	১	-	৩	৪
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	৩.৩%	-	১০.০%	৪.৪%
	অকৃষি শ্রমিক	গণসংখ্যা	১	-	-	১
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	৩.৩%	-	-	১.১%
	রিক্সা/ ভ্যান চালক	গণসংখ্যা	-	-	১	১
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে	-	-	৩.৩%	১.১%

		শতাংশ				
	মোটর চালক	গণসংখ্যা	৩	১	-	৪
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	১০.০ %	৩.৩%	-	৪.৪%
	সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবী	গণসংখ্যা	১	৪	৩	৮
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	৩.৩%	১৩.৩ %	১০.০ %	৮.৯%
	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	গণসংখ্যা	৩	৪	৪	১১
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	১০.০ %	১৩.৩ %	১৩.৩ %	১২.২%
	গৃহিণী	গণসংখ্যা	৪	৭	৫	১৬
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	১৩.৩ %	২৩.৩ %	১৬.৭ %	১৭.৮ %
	বেকার	গণসংখ্যা	-	-	৩	৩
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	-	-	১০.০ %	৩.৩%
	ছাত্র	গণসংখ্যা	৬	১	৪	১১
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	২০.০ %	৩.৩%	১৩.৩ %	১২.২%
	অন্যান্য	গণসংখ্যা	-	১	-	১
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	-	৩.৩%	-	১.১%
মোট		গণসংখ্যা	৩০	৩০	৩০	৯০
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	১০০.০ %	১০০.০ %	১০০.০ %	১০০.০ %

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৪.৫.৩ সংস্কৃতি

বৃহৎ প্রেক্ষাপটে আলোচনার সময় বাংলাদেশে দুই ধরণের সংস্কৃতি কথা বলা হয়। এক হল বৃহত্তম বাঙ্গালী সংস্কৃতি আর অন্যটি হল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। অন্যকথায় বলা যায় সমতলের সংস্কৃতি আর পাহাড়ি সংস্কৃতি। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের আলোকে যদি প্রশ্ন করা হয় এই দুই সংস্কৃতির স্বরুপ কেমন? অথবা আরো ক্ষুদ্র পরিসরে বললে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির স্বরুপ কেমন? সংক্ষেপে এর উত্তর দেয়া কঠিন। কারণ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমন্বিত সংস্কৃতি বলতে কিছু খোঁজা অর্থবহ নই। কারণ সংস্কৃতি স্থান থেকে স্থান ও ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভিন্ন হয়। নৃবিজ্ঞানে একটি গবেষণা প্রথা হল সামঞ্জস্যতা (সিনক্রোনিক) যেখানে সংস্কৃতির ক্ষুদ্র একক নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা করা হয়। এ

ধারায় গবেষণার উপাদানসমূহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে গবেষণা করা হয়। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে এই ধারা অনুসরণ করে সংস্কৃতির কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিশদ আলোকপাতের চেষ্টা হয়েছে।

নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির স্বরূপ জানতে তাদের সংস্কৃতির কিছু দিক যেমন খাবার-দাবার, পোশাক, গহনা, শিল্প ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা হয়েছে। চাকমারা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের চেয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির দিকে বেশি ঝুঁকছে। মারমারা এদিক থেকে তাদের নিজস্ব পোশাক সংস্কৃতি অনেকটা ধরে রেখেছে। স্থানীয় বিভিন্ন সবজি যেমন কচি বাঁশ তিন নৃগোষ্ঠীই খায়। প্রত্যকের আছে আলাদা ধরণের নাচ-গান। কিন্তু বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যের ন্যায় এখানেও এক সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতির থেকে কিছু উপাদান ধার করে অথবা ধার দেয়। যেমন কাপড় বুননের ক্ষেত্রে ও চাষের ক্ষেত্রে তিন সংস্কৃতির মিল পাওয়া যায়। পার্থক্য দেখা যায় জুমচাষ কেন্দ্রিক প্রথাগত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে। ফলে অধ্যয়নকৃত নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক সাদৃস্য ও বৈসাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়, যা তাদের প্রত্যেককে করেছে স্বতন্ত্র এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেছে এক বৈচিত্রময় ও বহুজাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে।

৪.৫.৪ ভাষা

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে। এদের মাতৃভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। তিনটি ভাষার সাথেই পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের ভাষার মিল রয়েছে। এই তিন ভাষার চর্চা স্থানীয় পর্যায়ে আগের মতই আছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য নৃগোষ্ঠীসমূহ নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তুঅধিকাংশ সদস্য মাতৃভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারলেও লিখতে পারেনা। আবার কেউ কেউ বাংলা বা ইংরেজি বর্ণমালায় লিখতে অভ্যস্ত। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষা ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিন সম্প্রদায়ের অনেক সদস্য চাকমা ভাষায় যোগাযোগ করতে পারে। অর্থাৎ চাকমা ছাড়াও মারমা ও ত্রিপুরা চাকমা ভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারে। তিন ভাষার মধ্যে কিছু সমব্যবহৃত শব্দ আছে। যেগুলোর উচ্চারণ স্থান বেদে ভিন্ন হয়। তবে একই ভাষার ক্ষেত্রেও উচ্চারণ স্থান বেদে ভিন্ন হয়। যেমন খাগড়াছড়ির ককবরক (ত্রিপুরা ভাষা) ভাষার উচ্চারণ আর বান্দরবানের ককবরক ভাষার উচ্চারণ এক নয়। কিছু ভিন্নতা রয়েছে। নৃগোষ্ঠীদের একটি ভাষার কিছু শব্দ অন্য ভাষায় আংশিক পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহার হয়। বাঙ্গালী সমাজের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৃগোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব ধাঁচে বাংলা ব্যবহার করে। তবে নৃগোষ্ঠীর মাঝে বাংলা ভাষার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪.৫.৫ ধর্ম

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব থেকে পার্বত্য অঞ্চলে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চলমান। এর ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক সদস্য ঐতিহ্যগত ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। যার কারণে প্রথাগত প্রকৃতি পূজাসহ অনেক ঐতিহ্যগত ধর্ম হুমকির সম্মুখিন। তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে শুধুমাত্র ত্রিপুরাদের ধর্ম হিন্দু। এরা সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করে। এদের অনেকে প্রকৃতি পূজারী। গুনবাচক তথ্য ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় যে- নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তরের হার অনেক কম। চাকমা ও মারমা নৃগোষ্ঠীর ধর্ম হল বৌদ্ধ (সারণী ২০)। এদের মধ্যেও কিছুটা প্রকৃতি পূজারী পাওয়া যায়।

সারণী ৪.২০ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের ধর্ম

ধর্ম					
			ধর্ম		মোট
			হিন্দু	বৌদ্ধ	
নৃগোষ্ঠী	চাকমা	গণসংখ্যা	-	৩০	৩০
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	০.০%	১০০.০%	১০০.০%
	মারমা	গণসংখ্যা	-	৩০	৩০
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	-	১০০.০%	১০০.০%
	ত্রিপুরা	গণসংখ্যা	৩০	-	৩০
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	১০০.০%	-	১০০.০%
মোট		গণসংখ্যা	৩০	৬০	৯০
		নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শতাংশ	৩৩.৩%	৬৬.৭%	১০০.০%

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৪.৫.৬ ঘরবাড়ি ধরণ ও মালিকানা

পার্বত্য জেলাসমূহে ঘরবাড়ির ধরণ সমতল থেকে আলাদা। তিন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে মারমাদের ঘর তৈরির কৌশল ভিন্ন এবং চমৎকার। মারমাদের ঘর তৈরির সাথে বন্য প্রাণীর আক্রমন থেকে প্রতিরোধের বিষয় জড়িত। ত্রিপুরাদের ঘর অনেক জীর্ণকায়। এটা তাদের দৈন্যদশার প্রতিনিধিত্ব করে। আর চাকমাদের ঘর ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে নির্মাণ করা হয়। তিন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে মারমাদের ঘরের নিচ তলা গুদামঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সকলের

ঘরের অবস্থান হয় গুচ্ছ গ্রামের মত। নির্দিষ্ট এলাকায় পাড়া কেন্দ্রিক ঘরবাড়ি গড়ে উঠে। তবে ঘর নির্মাণ কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় টিনের ছাউনি ও বাঁশ বা কাঠের বেড়া (চিত্র ৪.১)। টিনের প্রচলন খুব বেশি বছর ধরে হয়নি। আগে স্থানীয় উপাদানের শন ছাউনি ব্যবহৃত হত। কিন্তু কয়েক দশকধরে টিন ছাউনি ও বেড়া হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

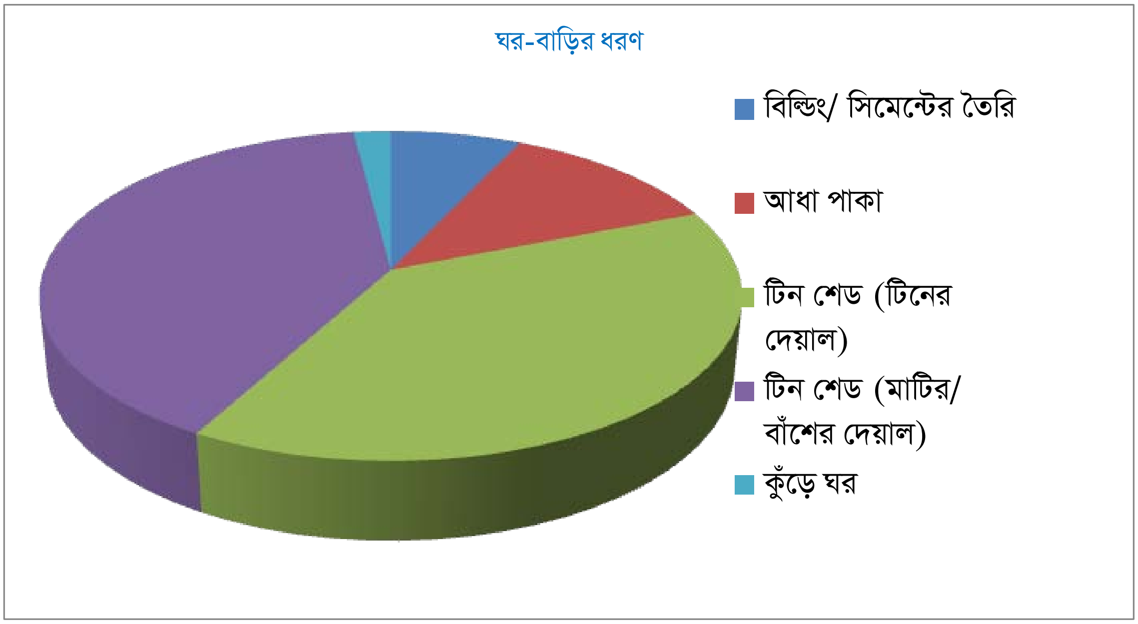

চিত্র ৪.১ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের ঘরবাড়ির ধরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল ভূমি সমস্যা। ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি পর ভূমি সমস্যা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেও তা আজও বিদ্যমান। যার কারণে পার্বত্য অঞ্চলে অস্থিরতা লেগেই আছে। ফলে দেখা যায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের তাদের বসত ভিটা সহ অন্যান্য ভূমি মালিকানার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। এদের অনেকের কাছে বসত ভিটার কোন লিখিত দলিল না থাকায় ভূমি হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়।

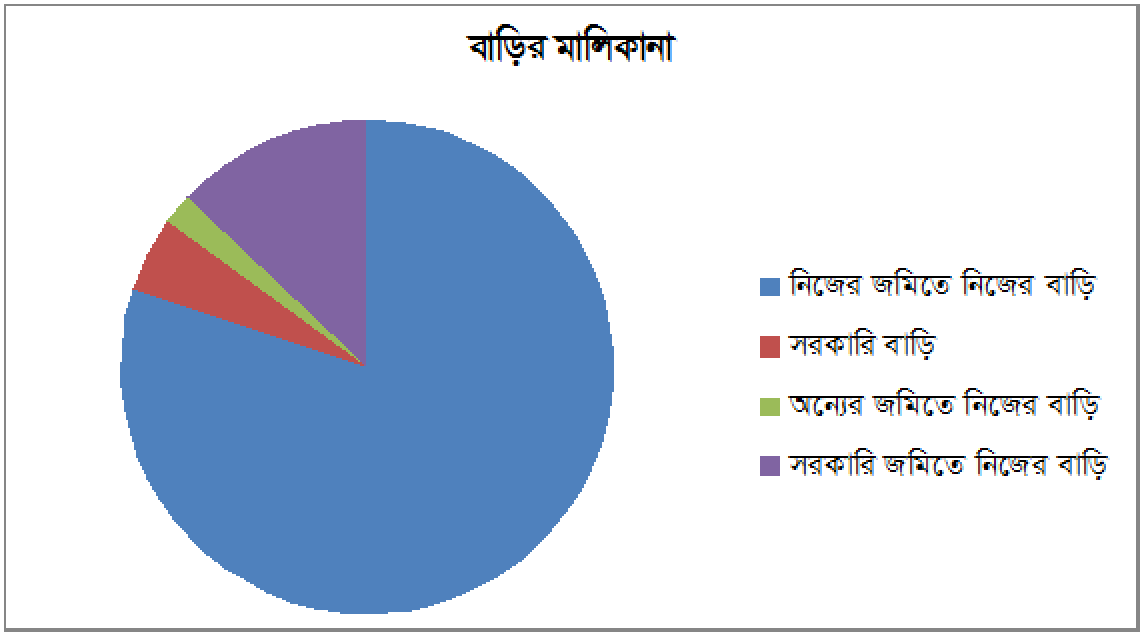

চিত্র ৪.২ঃ বাড়ির মালিকানা

চিত্র ৪.২ থেকে জানা যায় যে সিংহভাগ উত্তরদাতার বাড়ি নিজের জমিতে অবস্থিত। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতার বাড়ি সরকারি জমিতে অবস্থিত। এদের কাছে কোন লিখিত দলিল নেই। এরা কয়েক পুরুষ ধরে এই এলাকায় বসবাস করে আসছে। এদের অনেকের কাছে লিখিত দলিল অনেকটা অজানা। এর গুরুত্ব এদের কাছে অর্থহীন। এই নৃগোষ্ঠীসমূহের সচেতন সদস্যরা বর্তমানে জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা অবলম্বনপূর্বক লিখিত দলিল করার পাশাপাশি সরকারি নিবন্ধন করে থাকে। তবে এই সমাজসমূহের জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত প্রথা এখনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যেহেতু একই গোত্রের সবাই একই পাড়ায় একসাথে বসবাস করে তাই দেখা যায় কেউ জমি বিক্রি বা অন্য কোন বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে হস্তান্তর করতে চাইলে নিজের গোত্রের লোকই তা সংগ্রহ করে। তাই দেখা যায় এক সম্প্রদায়ের জমি অন্য গোত্র বা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। এতে অধ্যয়নটিতে নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বাড়ি, জমি ও প্রতিবেশিদের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয়। তবে বহিঃ ও আন্ত চলকসমূহের প্রভাবে নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থানের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন লক্ষণীয় যা সমাজগুলোকে রূপান্তর করছে।

৪.৫.৭ শিক্ষা

শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের হার কম হওয়ার ফলে সাক্ষরতায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী। শিক্ষা ভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন এডুকেশন ওয়াচ এর মতে দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৮ শতাংশ, যা গড় সাক্ষরতার হারের তুলনায় অনেক কম। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না থাকায় সাক্ষরতায় তারা পিছিয়ে রয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা (বণিক বার্তা, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬)। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়েছে। অথচ এখনো পর্যন্ত সরকারি কোনো বিদ্যালয়ে তা চালু করা হয়নি। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারীরা সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন। মাত্র ২৫ শতাংশ নারী সাক্ষরতার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ নারীই সাক্ষরহীন পর্যায়ে রয়েছেন।

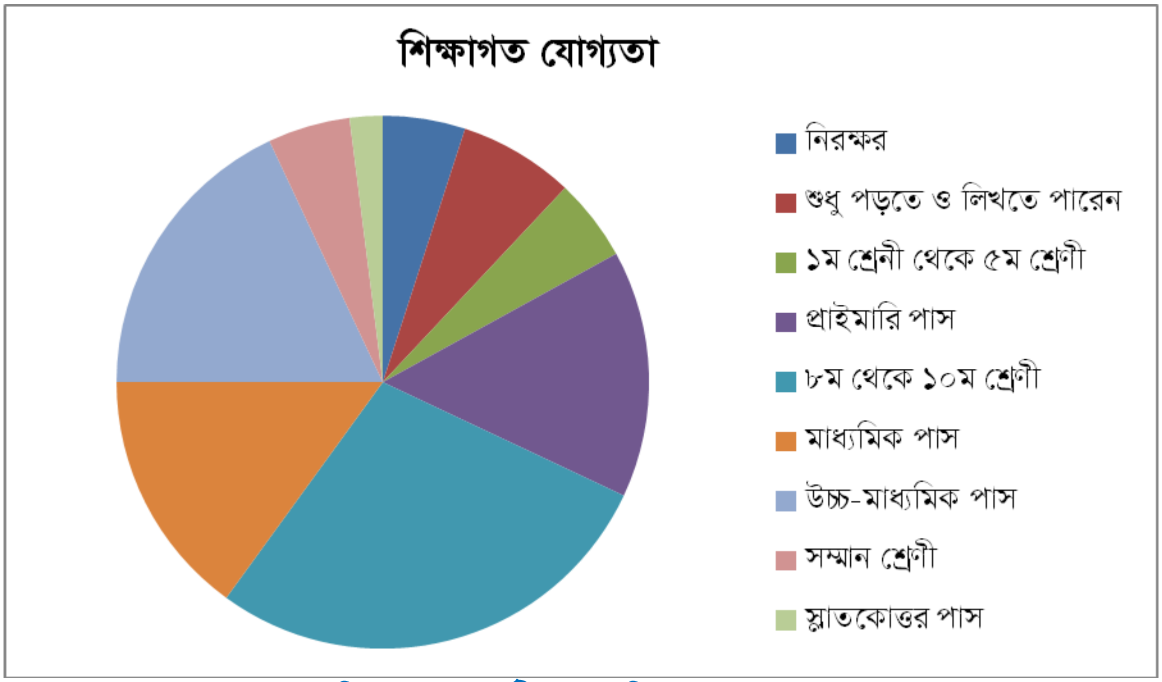

চিত্র ৪.৩ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের শিক্ষাগত যোগ্যতা

চিত্র ৪.৩ এ দেখা যায়- উত্তরদাতাদের মাঝে সর্বোচ্চ সংখ্যক হল মাধ্যমিক পাস। তার পরে সর্বোচ্চ হল এইচএসসি পাস। ছাত্র-ছাত্রী উত্তরদাতা হওয়ায় কারণে এইচএইসসি পাসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। প্রায় সম সংখ্যক উত্তরদাতা প্রাইমারি ও এসএসসি পাস। কিছু উত্তরদাতা শুধু লিখতে ও পড়তে পারেন কিন্তু এর বাহিরে

আর বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতা তাদের নেই। শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাদের মধ্যে নিম্নমুখি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ১৯৯৮ সালে এডিবি কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের ৬৫.৫১%, মারমাদের ৫৩.১৭% ও ত্রিপুরাদের শিক্ষার হার ২৭.২৪%। সুযোগ-সুবিধার অভাব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বান্ধবহীন শিক্ষা নীতিমালা, শিক্ষা চেতনার অভাব ইত্যাদি কারণে নৃগোষ্ঠীসমূহ শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ পিছিয়ে আছে। গ্রামীণ জীবন, ভৌগলিক অবস্থানগত কারণ, যুগ যুগ ধরে শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চনা, শিক্ষা দীক্ষায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ।

৪.৫.৮ সামাজিক সহাবস্থান, সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা

পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ এক অপরের সাথে নিবিড় সম্পর্কে বসবাস করে। সমাজ জীবনে একে অপরের যেমন প্রতিবেশি তেমনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একে অপরকে সহায়তা ও সহযোগিতা করে। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহ ছাড়া পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক যুথবুদ্ধতা, একাগ্রতা , সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতা এই তিন নৃগোষ্ঠীর সমাজে এখনও বিদ্যমান। প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় একজন সদস্য বলেন- *কিছু ছোটখাট সমস্যা, বিবাদ ও ভুল বোঝাবুঝি আমাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই হয়। সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে হওয়া আরো স্বাভাবিক। এগুলো আমরা নিজেরা মিমাংসা করি। থানা-পুলিশ দরকারই হয়না। কারবারী, হেডম্যান ও স্থানীয় ইউপি মেম্বার এসব জামেলার সমাধান করে। অনেকাংশে মিমাংসা করার জন্য কারো মধ্যস্থতা দরকার হয়না। নিজেরাই সমাধান করি* (মাঠকর্ম ২০১৮)।

আধুনিকায়ন ও বিশ্বায়নের প্রভাব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাত্যাহিক জীবনে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়। আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার ফলে মানুষের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া একদিকে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে আন্তরিকতা হ্রাস পাচ্ছে। বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কৃতিসহ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন উপায়ে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে নৃগোষ্ঠীসমূহের সনাতন সংস্কৃতি ও প্রথা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। স্থান করে নিচ্ছে নতুন রীতি। যেমন- অনেক বয়স্ক অধিবাসী মনে করেন মোবাইল আবিষ্কারের ফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহপূর্ব যোগাযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে সম্প্রদায়ের বাহিরে পাত্র-পাত্রি পছন্দের পরিমাণ (বহিঃগোত্র বিবাহ) বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে বয়োজৈষ্ঠ্যরা সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধতা রক্ষার ক্ষেত্রে হুমকি মনে করেন।

যাহোক সারণী ৪.২১ এ নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, সহযোগিতা ও লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে । এতে দেখা যায় চাকমা, মারমা, ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সবচেয়ে বেশি সুসম্পর্ক বিদ্যমান। তিন নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শুধু মত্র নিজ সম্প্রদায়ের সাথে শতভাগ নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়। ৯৬.৭ শতাংশ চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা মনে করে বিপদাপদে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পায় নিজ সম্প্রদায় থেকে। ৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বাঙ্গালীদের থেকে বিপদাপদে সহযোগিতা পেয়ে থাকে বলে মনে করে। ঐতিহ্যগতভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ বিনিময় ব্যবস্থার উপর নির্ভর ছিল। বাজার ব্যবস্থার পূর্বে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিনিময় করা হত। আরো পরে বাজার অর্থনীতি বিকাশ হলে এদের মধ্যে বাজার ভিত্তিক বিনিময় ও লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। পার্বত্য অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাদেশে পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিপরীতে এখনো কিছু ঐতিহ্যবাহী প্রথা টিকে আছে। সামাজিক জীবনে কেউ কোন বিপদে পড়লে বা আর্থিক সংকটে পড়লে প্রথম সহযোগিতা করে জ্ঞাতিজনরা। বাংলাদেশের মত প্রথাগত সমাজে আর্থিক লেনদেন, সহযোগিতা ও ঋণের প্রাথমিক উৎস হিসাবে ভূমিকা রাখে জ্ঞাতিজনরা। এ পরিস্থিতি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জীবনে অধিক সত্য। তাই দেখা যায়, চামকমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিমাণ সমাজ জীবনে নিজ সম্প্রদায়ের সাথে বেশি লেনদেন করে। এ সম্প্রদায় অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে মাঝে মধ্যে লেনদেন করে। বাঙ্গালীদের সাথে উত্তরদাতা চাকমাদের লেনদেনের চিত্র পাওয়া যায়নি। মারমাদের মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক মারমা সমাজ জীবনে নিজ সম্প্রদায়ের সাথে বেশি লেনদেন করে। তবে মারমারা কখনো কখনো বাঙ্গালীদের সাথে লেনদেন করে। ত্রিপুরাদের মধ্যেও সর্বোচ্চ সংখ্যক নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সচরাচর লেনদেন করে।

সারণী ৪.২১ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও লেনদেন

নৃগোষ্ঠী	সমাজে সুসম্পর্ক	যোগাযোগ	বিপদাপদে সহযোগিতা		সমাজ জীবনে লেনদেন		
	নিজ সম্প্রদায়	নিজ সম্প্রদায়	নিজ সম্প্রদায়	বাঙ্গালী	নিজ সম্প্রদায়	অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	বাঙ্গালী
চাকমা	১০০%	১০০%	৯৬.৭%	৩.৩%	৯৬.৭%	৩.৩%	-
মারমা	১০০%	১০০%	৯৬.৭%	৩.৩%	৯৬.৭%	-	৩.৩%
ত্রিপুরা	১০০%	১০০%	৯৬.৭%	৩.৩%	৯৩.৩%	-	৬.৭%

উপরোক্ত আন্তঃসাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহকে একটি সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো যা সারণী ৪.২২ এ প্রদত্ত হলো।

সারণী ৪.২২ঃ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা
আর্থ-সামাজিক অবস্থা	চাকমাদের জীবন গতিশীল, আধুনিকতার প্রভাব বেশি লক্ষণীয়, ও সামাজিক যোগাযোগ অন্য নৃগোষ্ঠীর চেয়ে ভাল।	মারমাদের জীবন কিছুটা গতিশীল, জীবনযাত্রা আধুনিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।	ত্রিপুরাদের জীবনযাত্রা অভিগমনের প্রেক্ষিতে গতিশীল নয়, আধুনিকতার প্রভাব কম, এবং সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামাজিক ইতিহাস সুপ্রাচিন ও ঐতিহ্যপূর্ণ।
জীবন-জীবিকা	চাকমাদের জীবন-জীবিকা শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করেনা। ঐতিহ্যগত পেশার বাহিরে বিভিন্ন পেশায় চাকমারা নিযুক্ত হচ্ছে। জীবিকার সন্ধানে প্রত্যন্ত অঞ্চল ছেড়ে শহরের দিকে অভিগমন করছে। কাপ্তাই লেক জীবন-জীবিকার পথে সম্পদ ও হুমকি উভয়।	মারমাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস হল কৃষি কাজ। প্রধান অর্থকরী ফসল হল তামাক দ্রব্য। ধান ও বাণিজ্যিক আম চাষ নগদ অর্থ উপার্জনের অন্যতম উপায়।	জীবন-জীবিকা জুম চাষের উপর বেশি নির্ভর করে। স্বয়ংভূত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে বাজার নির্ভর উৎপাদনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যেমন আনারস, কলা, পেঁপে চাষ।
সংস্কৃতি	বাঙ্গালী সংস্কৃতির বাহিরে বৃহত্তম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।	মারমা সংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিশেষ করে পোশাক ও	ত্রিপুরা গান ও নাচ সমৃদ্ধ। ত্রিপুরাদের

	চাকমা সংস্কৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী।	প্রসাধনী হিসাবে চন্দনের ব্যবহার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে।	নান্দনিক অলংকার তাদের স্বতন্ত্রের দাবীদার।
ভাষা	চাকমা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়	মারমা ভাষা ভোট বর্মী শাখার অন্তর্ভুক্ত	ককবরক ভাষা তিব্বতী-বর্মী উপ-পরিবারের ভাষা
ধর্ম	ঐতিহ্যগত ধর্ম বৌদ্ধ। প্রকৃতি পূজারীও আছে কিছু। ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টান হচ্ছে।	মারমাদেরও পৈতৃক ধর্ম বৌদ্ধ। ধর্মান্তরের মাত্রা কম। সপ্তাহের সাত দিবসে সাত প্রাণীর পূজা করা হয়।	ত্রিপুরাদের ধর্ম সনাতন হিন্দু। অনেকে প্রকৃতি পূজাও করে।
ঘরবাড়ির ধরণ ও মালিকানা	ঘর সাধারণত কাঠ ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। ছাউনি হিসাবে টিন ব্যবহৃত হয়। অনেক ঘর তৈরির ক্ষেত্রে আধুনিক উপাদান ও নির্মাণশৈলি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাড়ির মালিকানা বিষয়ে সচেতন।	তিন নৃগোষ্ঠির মধ্যে গৃহ নির্মাণশৈলি সবচেয়ে আকর্ষণীয়। ঘর মাটি থেকে উপরে মাচার মত করে তৈরি করা হয়। ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক নির্মাণশৈলি ও উপাদানের মিশ্রণ বেশ লক্ষণীয়। বসতভিটার মালিকানা ব্যক্তিগত।	অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে ঘর নির্মাণ করা হয়। ত্রিপুরাদের ঘরের সাথে চাকমা ঘরের মিল রয়েছে। ঘর নির্মাণে ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়।
শিক্ষা	চাকমাদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা তুলনামূলক বেশি থাকার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হার বেশি।	বর্তমানে মারমারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের দিকে ঝুঁকছে। তামাক চাষের ডিলারদের সাথে দরকষাকষির জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।	ত্রিপুরাদের মধ্যে শিক্ষার হার তুলনামূলক কম।
সামাজিক সহাবস্থান,	সমাজ জীবনে সবচেয়ে ভাল	মারমারা দলবদ্ধভাবে বসবাস	ত্রিপুরাদের বসবাস

সুসম্পর্ক ও বিনিময় ব্যবস্থা	সম্পর্ক চাকমা সম্প্রদায়ের সাথে। তাই নিজ সম্প্রদায়ের সাথেই বেশি যোগাযোগ ও লেনদেন হয়।	করে বলে তাদের সামাজিক জীবনের সবকিছু নিজ সম্প্রদায় কেন্দ্রিক।	আলাদা আলাদা স্থানে হওয়ায় কারণে নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে বাঙ্গালীদের সাথে লেনদেন করতে হয়।

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

পঞ্চম অধ্যায়

নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও বিবাহ

৫.১ ভূমিকা

পরিবার মানবসমাজের মৌল ভিত্তি। পরিবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি এবং সামাজিক জীবনের মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু পরিবার গঠন ও কর্মে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিবারের ভূমিকাও ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের কোনো একক রূপ নেই, নেই কোনো সার্বজনীন সংজ্ঞা। তবে পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে তার বৈচিত্র্য। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবারের গঠন, কার্যাবলী ও অন্যান্য অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেই সব সমাজ ও সংস্কৃতিতেই পরিবার পিতৃতান্ত্রিক অথবা পুরুষ প্রাধান্য। তবে এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার আগে নাকি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আগে। নৃবিজ্ঞানীর এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য সমাধানে পৌছাতে পারেন নি বলে এ বিষয়ে বয়ান চলমান রয়েছে। মধ্যযুগে ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং সামন্ততন্ত্র দ্বারা পরিবার প্রভাবিত হতো। এক্ষেত্রেও ছিল পুরুষ প্রাধান্য এবং পরিবারের ব্যাপকতা। একই সময় মুসলিম পরিবারের অবস্থা ছিল তার উল্টো। এ সময় মুসলমান পরিবারে নিজস্ব সম্পদের প্রতি মহিলাদের কর্তৃত্ব ছিল। শিল্প বিপ্লব পরিবারের গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। শিল্পায়ন ও নগরায়ন ভেঙে দেয় জমিদারি রাজত্ব এবং পরিবর্তন আনে জীবন ও কর্মক্ষেত্রে। বহু লোক বিশেষ করে তরুণরা ক্ষেত-খামার ছেড়ে শহরে কারখানায় কাজ নেয়। ক্রমে পুরুষ প্রধান পরিবারের প্রবেশ করে মহিলাদের কর্তৃত্ব। সমতার সম-অধিকারের হাওয়া বইতে শুরু করে পরিবারে পরিবারে। মহিলা শুধু ঘরের কাজ ও ছেলেমেয়েদের দেখবে আর পুরুষ শুধু আয় করবে, এ চর্চার অবসান নেমে আসে ধীরে ধীরে। অনেক স্ত্রী ঘরের বাইরে আসে। যোগ দেয় নানা কাজে, পক্ষান্তরে বহু স্বামী অংশগ্রহণ করে ঘরের কাজে। পরিবারের গঠন,কর্মকাণ্ড,নেতৃত্বসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তনের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের সব জায়গায় এ পরিবর্তন দৃশ্যমান। এ পরিবর্তন এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। তবে কিছু কিছু সাধারণ ব্যাপারও রয়েছে। যেমন ক্ষুদ্র অনু পরিবার-পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘ স্থায়িত্ব পরিবারের মধ্যে সম্পর্কে ও মূল্যবোধে পরিবর্তন। হারিয়ে যাচ্ছে আনুষ্ঠানিক বিয়ে,বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদ।

পারিবারিক জীবনবিবর্জিত মানবসভ্যতা কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের জন্য পারিবারিক জীবন তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার ওপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। যদি পারিবারিক জীবন অসুস্থ ও নড়বড়ে হয়, তাতে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দেয়। আর তা হলে সমাজজীবনে নানা অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি হতে বাধ্য। পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি।

সুতরাং আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন (নোমান ২০১৭)। পরিবার-প্রতিষ্ঠান দ্বারা একজনের গার্হস্থ্য জীবন গঠিত হয় সংসারের জন্য যথাযোগ্য আচরণ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, অন্যান্য পোষ্য, প্রত্যেকের দায়িত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং এইরকম আরও কিছু নিয়মসূত্রে। পরিবারের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক ভূমিকা ও সম্পর্ক, সহযোগিতা ও বিবাদ চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞাতিবর্গের একের সঙ্গে অন্যের আত্মীয়তার প্রতিফলন ঘটায়। জ্ঞাতিত্ব বন্ধন ও অবস্থান এখন আর পরিবারকে কোন বিশেষ ভৌগোলিক ও সামাজিক আয়তনে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে না (আজিজ ২০১৪)। পরিবারে দুই লিঙ্গের মানুষের বসবাস। পুরুষের এক ধরণের ভূমিকা রয়েছে আর নারীদের এক ধরণের ভূমিকা রয়েছে। নারী-পুরুষ পরিবারে কেমন ভূমিকা রাখবেন তা সমাজ ঠিক করে দেয়। পরিবার পিতা মাতা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের কেন্দ্র করে হতে পারে, দ্বিতীয়ত একসঙ্গে বসবাসরত আত্মীয়-স্বজন সমবায়ে একটি প্রসারিত পরিবারও হতে পারে। তৃতীয় ধরনের পরিবার হলো একটি বৃহৎ সংসার, যেখানে অন্যান্য আত্মীয় ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কিংবা তাদের ছাড়া আত্মীয়রাও ও যুক্ত হয়। পরিবার প্রায়শ সন্তানসহ বা সন্তানবিহীন এক বা একাধিক দম্পতির ছোট সংসার নিয়ে গঠিত। এর আর্থিক ভিত্তি রয়েছে। এই ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আত্মীয়, সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ঐক্যবদ্ধ কাজের মাধ্যমে তা রূপায়িত হয়। পরিবারের বিকাশে সন্ধানযোগ্য বংশগত সম্পর্ক সাধারণত জ্ঞাতি সম্পর্কের চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। এই শৃঙ্খলার মধ্যে সদস্যরা সমাজের আর্থিক ও সামাজিক উপ-প্রথাগুলি গড়ে তোলে।

বিশ্বের পরিবারও রক্তসম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বিশ্বের যেকোন পরিবারের অধিকাংশই স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে গঠিত। স্বামী ও স্ত্রী, অথবা বিবাহিত জীবনের এই দুই অংশীদারের যে-কেউ একজন সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ-কর্মের চালক। পরিবার প্রধানের দিক থেকে বংশানুক্রমিক সদস্যদের মধ্যে দাদা, দাদি, বাবা, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ছেলের বউ, নাতি, নাত-বউ এবং নাতনি অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, জ্ঞাতি সদস্যদের মধ্যে রয়েছে চাচা ও চাচী, চাচার ছেলে ও মেয়ে, ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী, ভাইয়ের ছেলেমেয়ে এবং এই ধারাবাহিকতায় অন্যান্যরা।

বিশ্বে বংশের পরিজনরা পিতা থেকে পুত্র ক্রমিকতায় অর্থাৎ পুরুষ পরম্পরার নিম্নগামী ধারায় সংজ্ঞায়িত ও পরিচিত। পিতৃতান্ত্রিক সূত্র নববিবাহিত দম্পতিকে স্বামীর ঘরে ও সংসারে বসবাসের প্রথার সঙ্গে যুক্ত করে। এই উপ-প্রথাসমূহ অনেকগুলো খণ্ডরূপে প্রতিফলিত, যেমন বাড়ি (একটি উঠানকে কেন্দ্র করে বহু লোকজন নিয়ে গঠিত), পাড়া (চারদিকে অনেকগুলি বাড়ি নিয়ে গঠিত প্রতিবেশ) এবং সমাজ (ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী যেখানে

সাধারণভাবে সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় সুবিধাদি লভ্য)। সম্ভবত সমাজ সদস্যদের খুঁজে নেওয়া যায় কয়েকটি সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশ-পরম্পরায়। বাংলাদেশের মানব সম্প্রদায়গুলোর এই বিভাজিত সংগঠনকে এক সূত্রীয় বংশগতির নিয়ম অবলম্বন করতে হয়েছিল। বিশ্বের পরিবারগুলি পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অনুশীলনকারী। ব্যাপক অর্থে তারা এক একটি মুক্ত দল। বিবাহিত দম্পতির বন্ধন আত্মীয়বর্গের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত। স্বামী-স্ত্রী দুজনের যেকোন একজন আত্মীয়দের দায়-দায়িত্ব বহন করে। বিশ্বে পরিবারের লোকজনদের চেনা যায় একই খানা বা চুলার অংশীদার হিসেবে। একজন বিবাহিত পুরুষ ও নারী মিলিয়ে একটি সমাজ একক। তাদের সংহতি, অভিন্ন স্বার্থ ও কর্তব্য তাদের যেকোন একজনের অন্যবিধ সম্পর্কজাত দায় ও স্বার্থ থেকে অধিক পূর্বাধিকার পায়। তাদের বংশধররা পারস্পরিক স্বার্থে যুক্ত এবং বিবাদরত। পরিবারের সদস্যরা একে-অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং সম্পদ, শ্রম ও আবেগ-অনুভূতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা জীবনের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক দিকগুলি পরিচালনা করে।

নির্দিষ্ট বংশধারায় সাধারণত একজন নারী বিভিন্ন বংশের কোন একজন পুরুষের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। বিয়ের পর সে নিজের বাপের বাড়ি ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়িতে যুক্ত হয় এবং সন্তান লাভ করে। শিশুটি পিতা-মাতা উভয় দিকের বংশানুগতির অংশী হয়। উভয় দিক থেকে পরিজাত বলে পিতা-মাতার এই সন্তান মামার বাড়িতে গিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। বিবাহিত কন্যার বংশ-পরিচিতি অভিব্যক্ত হয় পিতৃসম্পত্তিতে তার অধিকারে এবং প্রধানত তার প্রথম সন্তানের জন্ম, ঘরে ধান আসা, ভাই-বোনের বিয়ে ও প্রধান প্রধান নৈমিত্তিক উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাপের বাড়িতে আগমনে। বাংলাদেশে প্রধানত নিচের ছয়টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবার প্রথা দেখা যায়:- স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবার, কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার, আকারের ভিত্তিতে পরিবার, বংশ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবার, বিবাহোত্তর স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের ভিত্তিতে পরিবার, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবার ।যাহোক এই অধ্যায়ে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজের প্রেক্ষিতে পরিবার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.২ চাকমা

৫.২.১ পরিবার ব্যবস্থা

চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। পারিবারিক ক্ষমতা স্বামী, বা বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। পিতার বংশ পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হয় ও উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়। বিয়ের পরে মেয়েরা স্বামীর বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠে

পরিবার গঠন করে। চাকমা সমাজে পিতা মারা যাওয়ার পর সন্তানেরা উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি পেয়ে থাকে। মেয়েরা কোন অংশ পায়না। তবে মেয়েদেরকে অবহেলা করা হয়না। পু ত্র সন্তান না থাকলে মেয়েরা বাবার সম্পত্তির মালিকানা পায়।

৫.২.২ পরিবারের আকার

গবেষণায় পরিবারের আকার নির্ণয় গবেষণাকে তথ্যবহুল করে তোলে। দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক চাকমা পরিবারের আকার ৫-৬ জনের মধ্যে। এগুলো একক পরিবার যেখানে সাধারণত বাবা-মা ও অবিবাহত সন্তানরা থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে বর্তমানে চাকমাদের মধ্যে বৃহৎ পরিবারের ধারণা পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে দেখা যায় চাকমা পরিবারে ৮ জনের বেশি সদস্য আছে এমন পরিবারের সংখ্যা হল ২। পরিবারের গড় আকার হল ৪ জন।

সারণী ৫.১ঃ পরিবারের বর্তমান আকার

চাকমা পরিবারের বর্তমান আকার			চাকমা পরিবারের অতীত আকার	
আকার	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
১-২ জন	১	৩.৩	-	-
৩-৪ জন	৯	৩০	৭	২৩.৩
৫-৬ জন	১৩	৪৩.৩	৪	১৩.৩
৭-৮ জন	৫	১৬.৬	১১	৩৬.৬
৮ জন থেকে বেশি	২	৬.৬	৮	২৬.৬
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

অতীতে পরিবারের সাথে তুলনায় দেখা যায় পরিবারের আকার চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে দিন দিন ছোট হচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবে কয়েক দশক আগেও যেখানে সবাই যুথবদ্ধভাবে বসবাস করত এখন সে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তবে অতীতেও একক পরিবারের উপস্থিতি এই সমাজে ছিল। দিন দিন পরিবারের আকার ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে। এর সাথে জড়িত আছে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে বহুল প্রচারিত জন্ম নিয়ন্ত্রন কর্মশালা এবং নগরায়ন, শিল্পায়ন, ও বিশ্বায়ন। আগে দম্পতিদের সন্তান জন্মদান প্রবনতা আর এখন সন্তান জন্মদান প্রবণতার মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এই সারণীতে। জনমিতিকভাবে দেখা যায় দিন দিন চাকমা পরিবারের আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে।

৫.২.৩ পরিবার প্রধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পারিবারিক পরিমণ্ডলে সিদ্ধান্ত গ্রহন অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের সমাজে পুরুষরাই সাধারনত পরিবার প্রধান হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে একক ভূমিকা পালন করেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হওয়ার কারনে চাকমা সমাজেও পুরুষ পরিবার প্রধান হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট করে বললে স্বামী সাধারনত পরিবারের কর্তা ব্যক্তি হয়ে থাকেন। সারণী ৫.২ তেও সেটি দেখা যাচ্ছে। নারীরা পারিবারিক পরিমণ্ডলে ভূমিকা রাখেন না তা বলা কঠিন। কিন্তু তাদের কাজের স্বীকৃতি নেই বলে তাদের পরিবার প্রধান বলে গন্য করা হয়না। চাকমা সমাজ এর ব্যতিক্রম নয় যা বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অনুরূপ।

সারণী ৫.২ঃ চাকমা পরিবার প্রধান

পরিবার প্রধান		
প্রধান	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২৮	৯৩.৩
স্ত্রী	২	৬.৬
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

একইভাবে দেখা যায় অতীত প্রথার সাথে বর্তমান প্রথার সামান্য পার্থক্য পাওয়া যায় বিশেষত পারিবারিক পরিমণ্ডলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। অতীতে যেখানে চাকমা পুরুষরা গৃহের সব কাজে একক সিদ্ধান্ত নিতেন বর্তমানে সে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হচ্ছে (সারণী ৫.৩)। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া খুবই ধীর প্রকৃতির। প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে বের হয়ে নারীকে পারিবারিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতা চর্চা করার রীতি এখনো চাকমা সমাজে সেভাবে লক্ষণীয় নয়। তবে পরিবর্তনের চলকসমূহের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, কারণ চাকমা সমাজের পেশা ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি হস্তক্ষেপে এই ঐতিহ্যগত সমাজে পরবর্তন দেখা যাচ্ছে।

সারণী ৫.৩ঃ পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

উত্তরদাতার পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ			উত্তরদাতার পিতা-মাতার পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
গ্রহণকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২৮	৯৩.৩	৩০	১০০
স্ত্রী	২	৬.৬	-	-
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

একইভাবে দেখা যায় চাকমা পরিবারে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত নেয় সাধারনত স্বামী। তবে উল্লেখযোগ্য চাকমা পরিবারে দিন দিন সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। তাই দেখা যায়- ৩০ শতাংশ পরিবারে মহিলা সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে। সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহনে অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।

সারণী ৫.৪ঃ চাকমা পরিবারে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী

সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী		
গ্রহণকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২১	৭০.০
স্ত্রী	৯	৩০.০
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৫.২.৪ পরিবার প্রথা

চাকমাদের মধ্যে একগামীতা চর্চা বেশি লক্ষণীয়। অর্থাৎ এ সমাজে একই সমাজে একজন পুরুষ বা নারী একটি মাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে। এ সমাজ একই সময়ে একের অধিক স্বামী বা স্ত্রী থাকা সমর্থন

করেনা। তবে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে বা কারো স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে তখন পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করতে পারে। ঐতিহ্যগতভাবে একই সময়ে একের অধিক স্বামী বা স্ত্রী থাকার নিয়ম নেই।

৫.২.৫ পরিবারের ধরণ

তিনটি মৌলিক পরিবারের ধরণের মধ্যে চাকমাদের মাঝে একক পরিবার, যৌথ পরিবার ও বর্ধিত পরিবার বিষয়ে তথ্য জানার চেষ্টা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় বর্তমান পরিস্থিতি ও অতীতের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন লক্ষ করা যায় যৌথ পরিবার ও একক পরিবারের মধ্যে। এদের একটি অন্যটিকে স্থান করে দিচ্ছে। নৃবৈজ্ঞানিকভাবে বললে যৌথ পরিবারের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দিন দিন একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণী ৫.৫)। বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা যেখানে ৯৩.৩ শতাংশ সেখানে অতীতে ছিল ১০ শতাংশ। অর্থাৎ এখন যারা একক পরিবারের বসবাস করে তারা আগে যৌথ পরিবারে বাস করত।

সারণী ৫.৫ঃ চাকমা পরিবারের ধরণ

বর্তমান চাকমা পরিবারের ধরণ			অতীত চাকমা পরিবারের ধরণ	
ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
একক পরিবার	২৮	৯৩.৩	৩	১০.০
বর্ধিত পরিবার	১	৩.৩	৫	১৬.৬
যৌথ পরিবার	১	৩.৩	২২	৭৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

অতীতে যৌথ পরিবারে বসবাসের পরিমাণ ছিল ৭৩.৩ শতাংশ আর বর্ধিত পরিবারের হার ছিল ১৬.৬ শতাংশ। তবে পরিবারের ধরণে এ পরিবর্তন শুধুমাত্র পারিবারিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, জ্ঞাতিত্বের বন্ধন, যোগাযোগ, ইত্যাদি বিষয়কে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে। ফলে ঐতিহ্যগত সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে পরিবারের ধরণে পরিবর্তন কিছু বহিঃ চলকের প্রভাবের কথা ইঙ্গিত করে। অতীত ও বর্তমান পরিবারের তুলনামূলকভাবে নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করলে বলা যাবে যে- চাকমা সমাজে পরিবারের

ধরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত আরো আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই অধ্যায়ের শেষে।

৫.২.৬ বাসস্থান প্রথা

চাকমা সমাজে বাসস্থান কেন্দ্রিক পিতৃসূত্রীয় পরিবার গঠিত হয়। এখানে বিবাহের পরে নব-দম্পতি স্বামীর পিতার বাসস্থানে এসে পরিবার গঠন করে। এ সমাজে মাতৃসূত্রীয় পরিবারের অস্তিত্ব নেই। তবে ইদানিংকালে কিছু কিছু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী স্ত্রীর পিতামাতার পরিবারে বসবাস করে। যেমন বিবাহপূর্ব প্রণয়ের মাধ্যমে ছেলে মেয়ে বিবাহ করলে ছেলের পরিবার মেয়েকে পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করলে তখন মেয়ের পরিবার ইচ্ছা করলে মেয়ের স্বামীকে তাদের কাছে রাখতে পারে। এরকম ঘটনা খুবই কম। তবে একেবারেই যে নেই তা বলা যাবেনা। বর্তমান অধ্যয়নটি এমন একটি পরিবার খুঁজে পেয়েছে যেখানে চাকুরির কারণে মেয়ের স্বামীকে পিতামাতা তাদের সাথে রেখে দিছেন। এক্ষেত্রে ছেলের বাবা মায়ের সম্মতির প্রয়োজন।

৫.২.৭ বিবাহের রীতিনীতি

চাকমাদের বিয়ে এখনো নির্দিষ্ট ঐতিহ্যগত প্রথার মধ্যে আবর্তিত। এ প্রথার পদে পদে রয়েছে বৈচিত্রতা এবং চাকমাদের নিজস্বতা, তা অন্যদের জন্য উপভোগের এবং কৌতূহল নিবারণের খোরাক। বিয়ের ব্যাপারে মাতা-পিতার সম্মতির দরকার হয় তবুও মাতা-পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলেমেয়ে গোপনে বিয়ে করতে পারে। এক সময় সমাজ তা মেনে নেয়। বিবাহযোগ্য চাকমা ছেলে-মেয়ের জন্য অভিভাবক নিজে এবং নিকটাত্মীয় মারফত পছন্দনীয় পাত্রীর বাড়িতে প্রথমে প্রস্তাব পাঠাতে হয়। চাকমা ভাষায় এ প্রস্তাব পাঠানোকে বলা হয় "উদা লনা"। পান-সুপারি,নারিকেল,রকমারি পিঠা, পানীয় নিয়ে কনের বাড়ি গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিতে হয় বরপক্ষকে। পাত্রীপক্ষের জবাব ইতিবাচক হলে শুরু হয় পরবর্তী পর্ব। বিয়ের ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মতি দেওয়ার পর বিবাহের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তখন কোনোপক্ষই প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে পারেনা। কোনো পক্ষ বিয়েতে অসম্মত হলে সমাজে অপর পক্ষের মানহানি ঘটে। যে পক্ষের মানহানি ঘটবে সে পক্ষকে অপর পক্ষ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। চাকমা ভাষায় এ ক্ষতিপূরণকে বলে *"লাজভার"*। এ ছাড়া দু'পক্ষের বিয়ে করতে সেই পাত্রীকে আর কেউ প্রস্তাব দিতে পারবেনা। কেউ তা জেনেও বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

চাকমা কনে দেখাকে বলে *'বউ চা যানা'*। কনে পক্ষের ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর দু'পক্ষ নির্ধারিত একটি দিনে আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে আপ্যায়নে বসে। বিয়ের শুভ দিনক্ষণে রয়েছে পাত্রীপক্ষের *"দাভা"* নির্ধারণ। দাভা অর্থ

পণ। *দাভা* হিসেবে সাধারণত টাকা, চাল, দ্রব্যসামগ্রী, হাঁস-মুরগী, ছাগল, মাছ, মাংস ইত্যাদি দাবি করা হয়। চাকমা সমাজের বরপক্ষ কনেপক্ষকে পণ দেয়। এটি বরপক্ষের অতিরিক্ত খরচ। চাকমা ভাষায় একে বলে 'উবোর খজ্জি'। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য দ্বিতীয়বার কনেপক্ষের বাড়ি যাওয়াকে বলে 'দ্বিপুর'। এর অর্থ দ্বিতীয়বার সফর। দ্বিপুর পাত্রীপক্ষের বিয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণ সম্ভব না হলে তৃতীয়বার যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তৃতীয়বার পাত্রীপক্ষের বাড়ি যাওয়াকে বলে *'মদ পিলাং'*। পাত্রীপক্ষকে পাত্রপক্ষের দেওয়া মালামাল ও অলঙ্কার দ্রব্যকে বলা হয় "বোয়ালি"। উভয় পক্ষের মতামত সাপেক্ষে বিয়ের তারিখ ঠিক করাকে বলে *'থক দরা যানা'*। তবে আধুনিক চাকমা সমাজে বিয়ের প্রথাসমূহের মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে।

চাকমা বিবাহ অনুষ্ঠানে রয়েছে কয়েকটি পর্ব। বউ আনতে যাওয়া বরযাত্রীকে "বউ হজা যেয়ে' (বউ আনার দল) আর বউকে বাড়ি পৌঁছানোর দলকে বলা হয় "*বউ বারে দিয়ে*"। বরপক্ষ থেকে "*বউ হজা যেয়ে* "দল বেজোড় সংখ্যক বউ আনার জন্য যায়। "বউ হজা যেয়ে ও বউ বারে দিয়ে দলের সদস্যদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি থাকে যুবক-যুবতী। বরপক্ষের কয়েকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সদস্য থাকেন যেমন-*সাবালা, বউ আদানি* (কনের পথ প্রদর্শক) ও ফুল *বারেং বুগনি* (কনের সাজানো পোশাক ও অলঙ্কারদ্রব্য বহনকারী)। *বউ আদানি* হলেন ঠাট্টা সম্পর্কীয় নানি বা বর দাদি এ ধরনের একজন প্রৌঢ়া। *সাবালা* হলেন বরের ঠাট্টা সম্পর্কীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, আপন অথবা কাকাতো, জেঠাতো, ভগ্নীপতি বরের বাড়িতে আনার দায়িত্ব পালন করেন। বরের বাড়িতে আনার অনুমতি পাওয়ার পর ছোটভাই বা ছোটবোন বা বরের নিকট আত্মীয় একজন ছেলে বা মেয়ে বাড়ির মূল প্রবেশপথে পিঁড়ি পেতে কনের পা ধুইয়ে দেয়। এরপর বরের মা (যদি সধবা হন) অথবা অন্য একজন সধবা প্রবেশপথের দু পাশে রাখা দুটি কলসির গলায় বাঁধা সাত প্রস্থ সুতা কেটে কনের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে বেঁধে দেন। এরপর বউকে নিয়ে যাওয়া হয় ফুলঘরে। বধুবরণ অনুষ্ঠানে বাড়ির সদর দরজায় যে দুটা পানিভর্তি কলস রাখা হয় সেগুলোর নাম "মঙ্গল কলসি"। সেই মঙ্গল কলসির ঢাকনার উপর মোমবাতি বা সলাতে জ্বালানো হয়। কলসির গলায় বাঁধা সুতা কেটে দেওয়ার পর অন্যান্য আনুষ্ঠানিক অনুসরণ করে কনেকে বিয়েতে তোলা হয়। মঙ্গল কলসির ঢাকনার ওপর রাখা হয় আগুন যাতে বিপত্তি না ঘটায় সেভাবে সতর্ক থেকে কনেকে সাতনাল সুতার ওপর দিয়ে হেটে বাড়িতে প্রবেশের এ রীতি আছে।

চাকমাদের বিবাহের মূল অনুষ্ঠান হলো "*চুমুলাঙ পূজা*"। চুমুলাঙ পূজা অনুষ্ঠানে একজন ওঝা বা পুরোহিত থাকেন। তাকে হতে হয় বর-কনের উপরিস্থ *"খেইল্যা কুদুম"*বা বাইরের আত্মীয় (গুরুজন সম্পর্কীয়)। *চুমুলাঙে* একটি বেদিতে দুটো পূজার ঘট বসানো হয়। সেখানে বরের জন্য চাল ও কনের জন্য ধান দেওয়া হয়। 'সামমুয়া

হলো বাঁশ বেতের তৈরী ঢাকনাযুক্ত পাত্র। *চুমুলাঙে* একটি মালা, তিনটি মুরগি ও মদ উৎসর্গ করা হয়। চাকমা ভাষায় *চুমুলাঙেরর* দেবী হলেন পরমেশ্বরী। *চুমুলাং ও জারগেট* (বিবাহ গিট) বিয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চাকমাদের বিয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের নাম "*জদন বানাহ*"। জদন বানাহ অর্থ বর-কনের জোড়া বন্ধন। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনে সমাজের স্বীকৃতি লাভ করে। বরের বড় ভগ্নীপতি সম্পর্কীয় একজন 'সাবালা' এসে নবদম্পতির জন্য সাজানো একটি কক্ষে বরের বামে বসান কনেকে। প্রথমে জারগেট বন্ধন দেওয়া হয়। ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে এমন সম্পর্কের ১ জন পুরুষ ও ১ জন স্ত্রী লোক এসে তাদের (বর ও কনে) কোমরে একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়। এটাকেই বিবাহ গিট বলে। বিবাহ গিট দেওয়ার পূর্বে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়। এই প্রথা স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে। এর তাৎপর্য এইরূপ সমাজের সদস্য হিসাবে উপস্থিত ব্যক্তিদের অনুমিত দেয়া। এ বিয়েতে কারও আপত্তি থাকলে, সেটা বলার সুযোগ দেওয়া। কথিত আছে যে, বিবাহ গিট দেওয়ার পর যে আগে উঠে দাঁড়বে সে অপরের উপর কর্তৃত্ব করবে তিনি উচ্চেস্বরে বিয়েতে উপস্থিত জনমন্ডলীর মতামত কামনা করে বলে ওঠেন 'অমুক আর তমুকের জদন বানাহু দিবার উঘুম আগেনে নেই' বলে। সবাই উচ্চেস্বরে আছে-আছে বলে স্বীকৃতি জানায়। তারপর সাবালা সাত হাত লম্বা এক টুকরা কাপড় দিয়ে বর-কনের উপরের কোমরে জড়িয়ে বেঁধে দেন। আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। উপবিষ্ঠ বর আর কনে তখন যার যার আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়। সমাজের বিশ্বাস, আসন থেকে যে আগে উঠতে পারে সেই সারাজীবন অপরজনের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে।

চাকমা বিয়ের আরেকটি পর্ব "*খানা সিরেদেনা*"। এর অর্থ হলো সমাজের দায় শোধকরা। বিয়েতে সমাজের স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে বর সমাজের কাছে ঋণী। এই ঋণ বা দায় শোধ করতে সে বাধ্য। খানা সিরানার মাধ্যমে সমাজের কাছে তার এ দায় শোধ হয়। বিয়ের সামর্থ অনুসারে একটি সামাজিক খানা দেওয়া এক প্রকার বাধ্যতামূলক। এর ব্যত্যয় ঘটলে সামাজিক দন্ডের বিধান আছে। বিয়ের খানায় টক জাতীয় একটি তরকারি থাকে, যাকে চাকমা ভাষায় "*খাদা*" বলে। এ খাদা না হলে খানা সিরানার ব্যাপারটিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেখানে পানীয় এর সাথে রান্না করা মাংস একটি *মেজাংঙের* উপর ঢাকনা দিয়ে সাজিয়ে বৃত্তাকারে রেখে সবাইকে প্রনাম করে আর্শিবাদ নিয়ে বর-কনেকে পরিবেশন করতে হয়। চাকমা সমাজে এরূপ অনুষ্ঠানকে বলে "*গোজে দেনা*"। এই খানা সিরানা বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ। এ বিবাহের সম্পর্কে সমাজের আর কোনো প্রকার আপত্তি বা দাবি থাকেনা। যারা বিয়ের খানা সিরানা পর্ব সমাপ্ত করেনা তাদের মৃত্যু হলে সমাজের লোকেরা তাদের শ্বশানে নেওয়ার সময় কাঁধের নিচে করে নেওয়া হয়। কাঁধে তুলে নেয়না। বিয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরের দিন অথবা

দ্বিতীয় দিন বর ও নববধূকে কনের পিতার বাড়ি যেতে হয়। এ যাওয়ার নাম "*বিঝু ভাঙ্গা*"। বিঝু ভাঙ্গা সম্পন্ন করা বিধেয়। কোন কারণে কনের বাড়ি বিঝু ভাঙ্গা করতে না পারলে নিকটাত্মীয় কারও বাড়ি গিয়ে হলেও করতে কয়। তাও সম্ভব না হলে চির সবুজ ছায়াযুক্ত গাছের নিচে বসে বেষুত ভাঙ্গার কাজ সম্পন্ন করার বিধি রয়েছে। যথাসময়ে বিঝু ভাঙ্গার কাজ সম্পন্নের পর বরের বাড়ি গিয়ে "*বুরপারার* "কাজ সম্পন্ন করতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে শুশুরালয়ে গমনের রীতি অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে।

ঘরজামাই প্রথাও প্রচলিত আছে চাকমা সমাজে। তবে এ ধরনের বিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ হয় না এবং পাত্রের কাছে পাত্রীর কোনোধরনের কোনো কিছু দাবি থাকেনা। পুত্রসন্তানের অবর্তমানে পাত্রপক্ষেরর আর্থিক অসামর্থ্যের বা উপযুক্ত অভিভাবক না থাকার কারণে ঘরজামাই তোলা হয়।চাকমা সমাজে নানা কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। যেমন - স্ত্রীর ব্যভিচার, সংসার কর্মে অবহেলা, সংক্রামক রোগ প্রভৃতির কারণে স্বামী এবং স্বামীর নিষ্ঠুরতা, সংক্রমণ ও অনারোগ্য ব্যাধি, পুরুষত্বহীনতা প্রবৃত্তির কারণে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

৫.৩ মারমা

৫.৩.১ পরিবার ব্যবস্থা

মারমা সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা রয়েছে। পিতার পরিচয়ে সন্তানেরা পরিচিত হয়। উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির মালিকানা পিতার বংশ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। মারমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার ফলে বংশের পরিজনরা পিতা থেকে পুত্র ক্রমিকতায় অর্থাৎ পুরুষ পরম্পরার নিম্নগামী ধারায় সংজ্ঞায়িত ও পরিচিত। পিতৃতান্ত্রিক সূত্র নববিবাহিত দম্পতিকে স্বামীর ঘরে ও সংসারে বসবাসের প্রথার সঙ্গে যুক্ত করে। মারমা সমাজ সদস্যদের খুঁজে নেওয়া যায় কয়েকটি সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশ-পরম্পরায়। উত্তরাধিকারসূত্রে বড় ছেলে সম্পত্তির মালিকানা পেয়ে থাকলেও পিতা ইচ্ছা করলে ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে দিতে পারেন। এতে বড় ছেলে পায় সম্পত্তির অর্ধেক, মেজো ছেলে সিকি ভাগ বা এক চতুর্থাংশ এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ছেলেদের মধ্যে বন্টন করা হয়। কিন্তু ছেলে সন্তান না থাকলে সেই ক্ষেত্রে মেয়েরাই সম্পত্তির মালিকানা ভোগ ও বন্টন করে নেয়।

৫.৩.২ পরিবারের আকার

মারমা সমাজে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সমাজের সদস্যরা যুথবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে শতাব্দি ধরে। নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে বসবাস করে মারমা সম্প্রদায়। কিন্তু এদের পরিবারের আকার তুলনামূলক ছোট বলা যায়। একেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার যার আকার ছোট। মারমা পরিবারের আকার ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসছে। বর্তমান গবেষণার উত্তরদাতাদের বাবা মায়ের পরিবার বা অতীতে তারা যে পরিবারে ছিল তা কেমন ছিল জানতে গিয়ে দেখা যায় পূর্বের পরিবারের আকার বর্তমান পরিবারের চেয়ে বড় ছিল (সারণী ৫.৬)। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে এটা সমঞ্জস্যপূর্ণ যে পরিবারের আকার দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। দম্পতিদের মাঝে সরকারি-বেসরকারিভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্যাপক পরিসরে প্রচারণা চালানো হয় ৮০র দশক থেকে। ফলে দেখা যায় বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার কমে গেছে। এক্ষেত্রে মারমারা ব্যতিক্রম নয়। পূর্বে দেখা যেত একক পরিবারেই অনেক সদস্য বাস করেন। কিন্তু বর্তমানে একক পরিবারের আকার আগের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে যা ইঙ্গিত করে সন্তান জন্মদানের হার কমছে।

সারণী ৫.৬ঃ মারমা পরিবারের আকার

মারমা পরিবারের বর্তমান আকার			মারমা পরিবারের অতীত আকার	
আকার	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
১-২ জন	৩	১০.০	-	-
৩-৪ জন	১১	৩৬.৬	৭	২৩.৩
৫-৬ জন	৯	৩০	১৩	৪৩.৩
৭-৮ জন	৪	১৩.৩	৮	২৬.৬
৮ জন থেকে বেশি	৩	১০.০	২	৬.৬
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

পরিবারের গড় আকার হল ৫ জন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রতিটি পরিবারে গড়ে পাঁচজন সদস্য রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানরা থাকে। অতীতে মারমা পরিবার ছিল মাঝারি আকারের যা দিনদিন ক্ষুদ্র আকার ধারণ করছে।

৫.৩.৩ পরিবার প্রধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

মারমা পরিবার প্রধান সাধারণত পুরুষ সদস্যরাই হয়ে থাকেন। স্বামী, স্বামীর অবর্তমানে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে পরিবারে প্রধানের ভূমিকা রাখেন। মারমা সমাজের ঐতিহ্যগত পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে এ সমাজ বের হয়ে আসতে পারেনি। সমাজের ক্ষুদ্র একক হিসাবে পরিবারে পুরুষরা কর্তৃত্বপরায়ন হয়ে থাকে। পিতার অবর্তমানে বড় সন্তান পরিবারের প্রধানের ভূমিকা পালন করেন। তবে পারস্পরিক সুস্পর্কের ভিত্তিতে পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্ত্রীও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন। যেমন- সন্তানদের লেখাপড়া করার সিদ্ধান্ত, বিবাহ দেয়ার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। তবে স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রী নিজে একা কোন সিদ্ধান্ত সাধারণত নিতে পারেন না।

সারণী ৫.৭ঃ মারমা পরিবার প্রধান

পরিবার প্রধান		
প্রধান	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২৪	৮০.০
স্ত্রী	৬	২০.০
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সমাজের ক্ষমতা চর্চার ক্ষুদ্র একক হিসাবে পরিবারে মারমা মহিলারা ইদানিং ক্ষুদ্র পরিসরে কর্তৃত্ব চর্চা করেন (সারণী ৫.৮)। তাদের কর্তৃত্বের কিছু নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল আছে। যেমন একান্ত খানা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের ভূমিকা ও মতামত গণ্য করা হয়। কিন্তু পরিবারের বড়বড় সিদ্ধান্তের বেলায় পুরুষরা ক্ষমতাবান। অনেক পুরুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্ত্রীর মতামত নিয়ে থাকেন। পরিবারে প্রাধান্য বিস্তারে দম্পতিদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বোঝাপড়ার বিষয় জড়িত থাকে।

সারণী ৫.৮ঃ মারমা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহন

উত্তরদাতার পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ			উত্তরদাতার পিতা-মাতার পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
গ্রহণকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২৭	৯০.০	৩০	১০০
স্ত্রী	৩	১০.০	-	-
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

অন্যান্য পুরুষ শাসিত সমাজে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে অনেকাংশে পুরুষরা একক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে স্বামী সিদ্ধান্ত নিলে স্ত্রী তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রীদের সম্মতি না থাকলে তারা তা প্রকাশ না করে চুপ থাকেন। অর্থাৎ স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। কিন্তু মারমা সমাজে এ প্রেক্ষিত কিছুটা ভিন্ন। নিবিড় সাক্ষাৎকারে

মারমা স্ত্রীরা বলেন যে তাদের স্বামী সন্তান জন্মদানের বিষয়ে তাদের সাথে কখনো কখনো পরামর্শ করেন। আবার দেখা যায় সন্তান জন্মদানের বেলায় মহিলারায় একক সিদ্ধান্ত নেয় (সারণী ৫.৯)।

সারণী ৫.৯ঃ মারমা পরিবারে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী		
গ্রহণকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২৩	৭৬.৬
স্ত্রী	৭	২৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৫.৩.৪ পরিবার প্রথা

মারমা সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে এক পত্নী বিবাহ বিশিষ্ট পরিবারে গুরুত্বারোপ করে। কিছু ক্ষেত্রে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ করার রীতি রয়েছে। যেমন স্ত্রী সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে, শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ্য হলে। এক্ষেত্রে কারবারি বা সমাজের গণ্যমান্যদের অনুমতি লাগে। যদি কোন পুরুষ কাউকে না জানিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তবে সমাজ তাকে ভৎসনা করে। অন্যদিকে একজন নারী একই সময়ে একের অধিক স্বামী গ্রহন করতে পারেননা। তবে কিছু প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে নারীরা স্বামীকে ত্যাগ করতে পারেন। যেমন যৌন মিলনে অক্ষম হলে, শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ্য হলে, মাদকাসক্ত হলে। এই সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট হল একক পতী ও পত্নী বিশিষ্ট পরিবার প্রথা যা যুগযুগ ধরে চলে আসছে।

৫.৩.৫ পরিবারের ধরণ

মারমা সমাজের পরিবারে ধরণে নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। একক পরিবারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথাগত পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে। সারণী ৫.১০ তে দেখা যায় গবেষিত জনগোষ্ঠী পূর্বে যেখানে যৌথ পরিবারে বসবাস করত এখন সেখানে একক পরিবারে বেশি সংখ্যক বসবাস করছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৩.৩ শতাংশ মতামত দেয় যে তারা পূর্বে যৌথ পরিবারে বসবাস করত কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষপটের সাথে বিবেচনায় দেখা

যায় মাত্র ১৩.৩ শতাংশ যৌথ পরিবারে বাস করছে। সময়ের ব্যবধানে এরা একক পরিবারের দিকে ঝুঁকছে। আগে ৩৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা একক পরিবারে বসবাস করলেও বর্তমানে তা দাঁড়ায় ৮৩.৩ শতাংশে।

সারণী ৫.১০ঃ মারমা পরিবারের ধরণ

মারমা পরিবারের বর্তমান ধরণ			মারমা পরিবারের অতীত ধরণ	
ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
একক পরিবার	২৫	৮৩.৩	১০	৩৩.৩
বর্ধিত পরিবার	১	৩.৩	১	৩.৩
যৌথ পরিবার	৪	১৩.৩	১৯	৬৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

মারমাদের বর্ধিত পরিবারের মধ্যে লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা আগেও কম ছিল এখনও কম আছে। বর্ধিত পরিবার একই থাকার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এর উপকারিতা বা অপকারিতা কোনটিই মারমাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। কেবলমাত্র যৌথ পরিবার ও একক পরিবারের বেলায় পরিবর্তনটা বেশি হচ্ছে। শান্তি প্রিয় মারমারা কেন একক পরিবারের দিকে ঝুঁকছে এবং এক্ষেত্রে কোন প্রভাবক ভূমিকা রাখছে তা এ অধ্যায়ের শেষে আলোচিত হয়েছে।

৫.৩.৬ বাসস্থান প্রথা

মারমা সমাজ যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক তাই এখানে পিতৃসূত্রীয় পরিবার প্রথা প্রচলিত। বিবাহের পরে নব দম্পতি স্বামীর পিতার বাসস্থানে বসবাস করে। মারমাদের মধ্যে বিবাহের পরে স্বামী স্ত্রীর পিতার বাড়িতে বসবাস করার রীতিও দেখা গেছে। অধ্যয়নের মাঠকর্মের সময়ে অন্তত ২টি পরিবার পাওয়া গেছে যেখানে স্বামী স্ত্রীর পিতার পরিবারে স্থায়ী বসবাস করেছে। কিছু পারিপার্শ্বিক কারণে এমন ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। যেমন কোন দম্পতির ছেলে সন্তান না থাকলে তারা তাদের যে কোন একটি মেয়ের স্বামীকে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। প্রণয়ঘটিত কারণে ও জীবিকার তাগিদেও অনেকে স্ত্রীর পিতার বাড়িতে থাকেন।

৫.৩.৭ বিবাহের রীতিনীতি

মারমা সমাজে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মারমা সমাজে বিবাহ প্রথম পর্ব হলো *"লাকপাই-পোই"* বা প্রস্তুতি মূলক অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠানটি মূলত আয়োজন করা হয় আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের জানানোর জন্য। উভয় পক্ষের সম্মতিতে ও সামাজিক রীতি অনুসারে পাত্রের পিতা-মাতা বা বন্ধু-বান্ধব কয়েকজন বয়বৃদ্ধ প্রথাগতভাবে ব্যবহার্য উপকরণ, যেমন- ১ বোতল মদ, ২৫টি সুপারী, ১ বিড়া পান, বিন্নি ভাত, মিষ্টি, আঁখ ও ১ জোড়া নারিকেল নিয়ে কনের বাড়িতে যেতে হয়। এসব উপকরণ কনের মা-বাবাকে প্রদান করে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং মা-বাবার সম্মতির পর মেয়ের মতামত নেয়া হয়। মেয়ের মতামত পাওয়ার পর পাত্রীপক্ষ অনুরূপ আর এক বোতল মদ পাত্র পক্ষকে প্রদান করে। সবকিছু শুভ লক্ষণযুক্ত হলে পাত্রপক্ষ একটি *থামী* (মেয়েদের পরিধেয় কাপড়) রূপা বা স্বর্ণের একটি আংটি দিয়ে পাত্রীকে আশীর্বাদ করেন। মেয়ের সম্মতি পাওয়া গেলে পাত্রপক্ষের দেয়া মদের বোতল পাত্রীপক্ষ গ্রহন করে অনুরুপ আর এক বোতল মদ পাত্রীর পরিবার থেকে পাত্রপক্ষকে দেয়া হয়। এসময় উভয়পক্ষের হাসি-ঠাট্টায় মদপানসহ বিয়ের কথাবার্তা পাকা করা হয়। এ পর্যায়ে একজন জ্যোতিষি এনে পাত্র-পাত্রীর রাশি গণণা ও বিয়ের শুভলগ্ন দেখা হয়। সবকিছু শুভ লক্ষণযুক্ত হলে পাত্রী পাত্রপক্ষের গুরুজনদের প্রণাম করে আর্শীবাদ গ্রহণ করে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের দুদিন আগে পাত্রের বাবা নিজ বাড়িতে গৃহ দেবতার উদ্দেশ্যে *চুং মং-লে* পূজার আয়োজন করে। এ পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে একটি শুকর ও পাঁচটি মুরগি বলি দেয়া হয়। বিয়ের নির্ধারিত দিনে পাত্রীর বাড়ির প্রবেশ দ্বারে কলাগাছের দুটি কচি চারা বসিয়ে তার পাশে *রিজারও* (সাদা সূতো দিয়ে পেচানো দুটো পানি পূর্ণ কলস) এবং *সিফাইকও* (বিভিন্ন চাউল থেকে তৈরি পানীয়) রাখা হয়। বউ আনতে যাবার দিন একটি সেদ্ধ মোরগ, চিংরে (মদ তৈরি হবার পূর্বে ভাত, পানি ও মুলির সংমিশ্রন) এক বোতল, এক বোতল মদ, একটি *থবিং* (মারমা মেয়েদের পরিধেয় কাপড়), একটি *বেদাই আংগি* (উর্ধাঙ্গের পোশাক), একটি *রাংগাই আংগি* (বক্ষবন্ধনী), এক জোড়া *কাখ্যাং* (পায়ের খারু), একটি *গবং* (মাথার বন্ধনী), নিয়ে পাত্রের মা-বাবা , বন্ধু-বান্ধবসহ বাদ্য-বাজনা সহকারে কনের পিত্রালয়ে যান। তবে বিবাহের মূল অনুষ্ঠানটি *উবদিদাই বা মতে ছরা* (বিবাহের মন্ত্র জানা ব্যাক্তি) দ্বারা বরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে মন্ত্রপুত জলপূর্ণ পাত্রে একগুচ্ছ জামের কচি পাতা ডুবিয়ে তা দিয়ে বর ও কনের মাথায় পাঁচ-সাতবার পবিত্র জল ছিঁটিয়ে দেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের মূল পর্বে কনের ডানহাতের কনিষ্ঠ আঙুলের সঙ্গে বরের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি যুক্ত করে তাতে পবিত্র জল ছিটিয়ে দেয়া হয়।

এ অনুষ্ঠানকে মারমা ভাষায় *লাক থেক পোই* বলে। *লাক থেক পোই* অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহকে সমাজসিদ্ধ করা হয়।

বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী *উবদিদাই* এমন একজন ব্যাক্তিকে হতে হবে যিনি বিপত্নীক বা বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নন। বিয়ের মুল অনুষ্ঠনে আর্শীবাদ এর সময় *উবদিদাই* তার হাতে থাকা একটি তলোয়ার এর মধ্যে পাঁচ প্যাঁচে পেঁচানো সুতার কুণ্ডলী তলোয়ার থেকে ব্যবধান না রেখে কনের মনিবন্ধে পরিয়ে দেয়। কনে বরকে প্রণাম করে তা গ্রহণ করে। একটি মোরগ বধ করে আস্ত সিদ্ধ করার পর *উবদিদাই* বা *মতে ছরা* সেই মোরগের জিহবার অংশ টেনে প্রথমে বর ও কনের মা-বাবাকে এরপর ক্রমান্বয়ে উপস্থিত সকলকে দেখান। *চাইংগা* বা জিহবা যদি বাম দিকে হেলে থাকে তাহলে মনে করা হয় যে, বর যদি কনের আত্নীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলেমিশে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে সর্বাধিক উন্নতি করবে এবং ডানদিকে হেলে থাকলে মনে করা হয় এর উল্টো ফল হবে। এবার সিদ্ধ মোরগটিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ মিশিয়ে খাওয়ার উপযোগী করে বর-কনের জন্য একটি পাত্রে পরিবেশন করা হয়। বর ও কনে একত্রে এক পাত্রে খাওয়ায় এই অনুষ্ঠানকে *লাক ছং চা-চ* বলা হয়। মারমা সমাজসিদ্ধ বিবাহে *লাক ছং চা-চ* অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা অপরিহার্য। এ অনুষ্ঠানের পর থেকে তারা দুজনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। বিয়ের এই সামাজিক আনুষ্ঠানিকতাকে *মেয়াপোই* বলে। বিবাহ অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা পঞ্চশীল গ্রহন এবং মঙ্গল সূত্র পাঠসহ পিন্ড দান ইত্যাদি ধর্মীয় আচার পালনের রীতি সম্প্রতি মারমা সমাজে প্রসার লাভ করেছে। এ ধরনের অনুষ্ঠানাদিতে মদ পরিবেশন, *চাইংগা, চুংমংলে* এসব আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করা হয়। এসবের পরিবর্তে ফুল, খৈ, মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্যাদি দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

৫.৪ ত্রিপুরা

৫.৪.১ পরিবার ব্যবস্থা

ত্রিপুরা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক যেখানে পুরুষেরা প্রাথমিক ক্ষমতা ধারণ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নৈতিক কর্তৃত্ব, সামাজিক সুবিধা ও সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করে, পরিবারের ক্ষেত্রে পিতা ও পিতৃতুল্যগণ নারী ও শিশুর উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। ত্রিপুরা সমাজ পিতৃগোত্রজ, যার অর্থ হচ্ছে এ সমাজে সম্পত্তি ও পদবী পুরুষের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বাহিত হয়। পিতা থেকে তাহাদের গোষ্ঠী বা গোত্রের উৎপত্তি। এ সমাজব্যবস্থায় মেয়ে ও স্ত্রীদের তেমনকোন আধিপত্য নেই। পরিবার পরিচালনা পদ্ধতিতে কতৃত্বের ব্যাপারে পিতার পরবতীর্তে মাতার স্থান। অতপর জৈষ্ঠ্যপুত্রের স্থান হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে একজন পুত্র তাহার পিতার দফা ও গোষ্ঠীর অধিকারী হয়। আর কন্যা তাহার মাতার দফা ও গোষ্ঠীর অধিকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যে গোত্রে ছেলেরা পিতার বংশ এবং মেয়েরা মাতার বংশ অনুসরণ করে সেখানে ছেলেরা পায় পিতার সম্পত্তি, মেয়েরা পায় মাতার সম্পত্তি (ত্রিপুরা ২০১৬)। পিতা ও মাতার বংশানুযায়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ের ফলে পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মিশ্রণ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও ত্রিপুরা সমাজ সম্পূর্ণরূপে একটি পিত্রৃতান্ত্রিক সমাজ যা তার গঠন, কাঠামো, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চায় পিতৃতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

৫.৪.২ পরিবারের আকার

ত্রিপুরা সমাজ কৃষি নির্ভর হওয়াতে তুলনামূলকভাবে এ সমাজে পরিবারের আকার বড় হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যায় ত্রিপুরা পরিবারের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অন্যতম দারিদ্র পীড়িত হলেও তাদের মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার কম। ত্রিপুরারা ঐতিহ্যগতভাবে কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠী হলেও দিন দিন কৃষি কাজের পরিমান হ্রাস পাচ্ছে এবং এর ফলে পরিবারের আকারও ছোট হয়ে যাচ্ছে। সরকার কর্তৃক জুম চাষ নিষিদ্ধ করার কারণে কৃষি কাজের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে দিন মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী ৫.১১ঃ ত্রিপুরা পরিবারের আকার

ত্রিপুরা পরিবারের বর্তমান আকার			ত্রিপুরা পরিবারের অতীত আকার	
আকার	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
১-২ জন	২	৬.৬	-	-
৩-৪ জন	১৩	৪৩.৩	৭	২৩.৩
৫-৬ জন	৯	৩০	১১	৩৬.৬
৭-৮ জন	৫	১৬.৬	৮	২৬.৬
৮ জন থেকে বেশি	১	৩.৩	৪	১৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

এর ফলে দেখা যায় কিছু অন্ত ও বহিঃ চলক পরিবারের আকারকে প্রভাবিত করছে। তবে ত্রিপুরা জপনগোষ্ঠীর মাঝে জন্ম নিয়ন্ত্রনের গুরুত্ত্ব বেশ লক্ষণীয় এবং দম্পতিরা এ বিষয়ে সচেতন। তাই দেখা যায় পূর্বের আর বর্তমানের পরিবারের আকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। ৫.১১ নং সারণীতে দেখা যায় ত্রিপুরা পরিবারের আকারের মধ্যে ধারাবাহিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। অর্থাৎ পরিবারের আকার ক্রমাগতভাবে ছোট হচ্ছে। যেমন- বর্তমানে ৪৩.৩ শতাংশ মানুষ এমন পরিবারে বাস করেন যার আকার হল ৩-৪ জন। যেখানে অতীতে এই আকারের পরিবারে বসবাসের হার ছিল ২৩.৩ শতাংশ। একইভাবে দেখা যায় পরিবারের আকার আরো একটু বড় হলে বর্তমানে তাতে বসবাসের হার হ্রাস পাচ্ছে। যেমন ৩০ শতাংশ ত্রিপুরা ৫-৬ জন আকারের পরিবারে বাস করলেও অতীতে এই হার ছিল ৩৬.৬ শতাংশ। একইভাবে দেখা যায় পরিবারের আকার আরো বড় হয়ে ৭-৮ জন হলে তাতে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় ১০ শতাংশ। অতীতে যেখানে ৮ জনের অধিক সদস্যের পরিবারের হার ছিল ১৩.৩ শতাংশ সেখানে বর্তমানে তা ৩.৩ শতাংশ।

৫.৪.৩ পরিবার প্রধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ত্রিপুরা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে স্বামী বা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ যেমন বড় সন্তান, শ্বশুর। ত্রিপুরা সমাজ যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক তাই এখানে পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর আধিপত্য বেশি। এ সমাজ কৃষি নির্ভর। ফলে দেখা যায় কৃষি কাজে পুরুষের সমান অবদান মহিলারা রাখলেও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে পুরুষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। ৫.১২ নং সারণিতে দেখা যায় ৯০ শতাংশ ত্রিপুরা পরিবারের প্রধান হচ্ছে পুরুষ। আর ১০ শতাংশ পরিবারের প্রধান মহিলা। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহিলারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধানের ভূমিকা রাখেন। যেমন স্বামী অন্য এলাকায় থাকলে, স্বামী পরিত্যাক্তা হলে, বিধবা হলে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক কোন ছেলে না থাকলে, অথবা ছেলে সুস্থ না থাকলে, স্বামী সুস্থ না থাকলে ইত্যাদি।

সারণী ৫.১২ঃ ত্রিপুরা পরিবার প্রধান

পরিবার প্রধান		
প্রধান	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২৭	৯০.০
স্ত্রী	৩	১০
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৫.১৩ তে বর্তমান ও পূর্বের ত্রিপুরা পরিবারের ক্ষমতা চর্চা দেখা চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, বর্তমানে ৯৭.৮ শতাংশ পরিবারের স্বামী সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। আর ২.২ শতাংশ পরিবারের স্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। পূর্বের ও বর্তমান অবস্থার তুলনায় দেখা যায়- পূর্বে শতভাগ সিদ্ধান্ত স্বামী কর্তৃক গ্রহণ করা হত। পরিবারের ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তন তেমন লক্ষণীয় নয়।

সারণী ৫.১৩ঃ ত্রিপুরা পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহন

উত্তরদাতার বর্তমান পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ			উত্তরদাতার অতীত পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
গ্রহণকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২৫	৯৭.৮	৩০	১০০
স্ত্রী	৫	২.২	-	-
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

একইভাবে ৫.১৪ সারণিতে দেখা যায় ত্রিপুরা পরিবারে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্তও স্বামী গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে স্ত্রী সহায়ক ভূমিকা রাখেন। স্ত্রীর মতামতকে প্রাধানয় দেয়ার প্রবণতা স্বল্প পরিসরে লক্ষণীয় এ সমাজে। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন সন্তান জন্মদানের বিষয়ে। এটা পারিপার্শ্বিক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন স্বামীর শিক্ষা, পেশা এবং সামাজিক অবস্থান। কিছু মহিলা অধিবাসী মনে করেন তাদের স্বামীরা সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে তাদের সম্মতি নিয়ে থাকেন। আর সিংহভাগ বলেন সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে যখন তারা কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেন না তখন কারো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সন্তান জন্ম লাভ করে। এক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রনের সিদ্ধান্ত স্বামী স্ত্রী যৌথভাবে নিয়ে থাকেন।

সারণী ৫.১৪ঃ ত্রিপুরা পরিবারে সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন

সন্তান জন্মদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী		
গ্রহণকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ
স্বামী	২৬	৮৬.৬
স্ত্রী	৪	১৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

৫.৪.৪ পরিবার প্রথা

ত্রিপুরা সমাজ একগামী বিবাহকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন নেই। তবে একবারেই যে হয়না তা দাবি করা যাবেনা। বহুবিবাহের অনৈতিক সুবিধা সাধারণত পুরুষরা নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সমাজ তাকে তিরস্কার করে। নারীরা একই সময়ে একজন স্বামী গ্রহন করেন। এ সমাজে বিধাব বিবাহ প্রথা আছে। তবে রীতিসিদ্ধভাবে একজন পুরুষ তার স্ত্রী বর্তমান থাকার পরও আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন কয়েক কারণে- ক) স্ত্রী শারীরিকভাবে অক্ষম হলে, খ) স্ত্রী মানসিক রোগি হলে, গ) স্ত্রী সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে, ঘ) স্ত্রী ব্যবিচারী হলে, ঙ) নেশাগ্রস্ত হলে। আবার কিছু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন- ক) স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম হলে, খ) স্বামী মানসিক রোগি হলে, গ) অত্যাচারি হলে, ঘ) পরনারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ালে, ঙ) মাদকাশক্ত হলে। ত্রিপুরা সমাজ একক পরিবারে যেমন গুরুত্ব দেয় তেমনি পরিবার ভাঙ্গনে উৎসাহিত করেনা। তাই দেখা যায় যখন পরিবার ভাঙ্গার উপক্রম হয় তখন কারবারি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মধ্যস্থ্যতা করে তাদের ঐতিহ্যগত পরিবার না ভাঙ্গার জন্য।

৫.৪.৫ পরিবারের ধরণ

ত্রিপুরা ঐতিহ্যগত সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার প্রথার গুরুত্ব অপরিসীম। এ সমাজের পরিবারসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা কম বিধায় একসাথে যুথবদ্ধভাবে বসবাসের প্রবণতা বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়- ত্রিপুরা সমাজে দিন দিন যোথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবার স্থান করে নিচ্ছে। আর বর্ধিত পরিবারের অস্তিত্ব খুবই সীমিত আকারে আছে। সারণী ৫.১৫ তে দেখা যায় ত্রিপুরা সমাজে একক পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে একক পরিবারের সংখ্যা যেখানে ছিল ২০ শতাংশ বর্তমানে তা দেখা যায় ৬৬.৬ শতাংশ। একক পরিবার বৃদ্ধির সাথে পরিবারের আকার ছোট হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। অতীতে যৌথ পরিবার প্রথা ত্রিপুরা পরিবারিক বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক ছিল। কিন্তু বর্তমানে একক পরিবার ত্রিপুরা সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই দেখা যায় অতীতে যেখানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা ছিল ৫৬.৬ শতাংশ বর্তমানে তা কমে ৩০ শতাংশে পৌছে।

সারণী ৫.১৫ঃ ত্রিপুরা অতীত ও বর্তমান পরিবারের ধরণ

বর্তমান ত্রিপুরা পরিবারের ধরণ			অতীত পরিবারের ধরণ	
ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
একক পরিবার	২০	৬৬.৬	৬	২০.০
বর্ধিত পরিবার	১	৩.৩	৭	২৩.৩
যৌথ পরিবার	৯	৩০.০	১৭	৫৬.৬
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৫.৪.৬ বাসস্থান প্রথা

ত্রিপুরা সমাজে বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীর পিতার বাসস্থানে বসবাস করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী নব বাসস্থানে বসবাসের মাধ্যমে পরিবার গঠন করে। ঐতিহ্যগতভাবে ত্রিপুরা সমাজে স্ত্রীর পিতার বাড়িতে বসবাসের রীতি নেই। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বামী স্ত্রীর পিতার বাড়িতে বসবাস করতে পারেন। ত্রিপুরা সমাজের বিবাহ ব্যবস্থার ন্যায় পরিবার ব্যবস্থাও ঐতিহ্যময়। বিবাহের পরে স্ত্রীকে স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করতে হয়। একটা সময়ে পিতামাতা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার রীতি ইদানিং চালু হয়েছে। যদি ত্রিপুরা ব্যতিত অন্য সম্প্রদায়ের কোন মেয়েকে ত্রিপুরা ছেলে বিবাহ করে তবে সেক্ষেত্রে বউ নিয়ে ত্রিপুরা সমাজে বা পরিবারে থাকতে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ছেলে স্ত্রীর সম্প্রদায়ে গিয়ে ঘর জামাই হিসাবে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে ত্রিপুরাদের ধর্ম হিন্দু হওয়ায় হিন্দু ধর্মালম্বি বাঙ্গালীদের সাথে ত্রিপুরাদের বিবাহ বৈধ ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু মেয়েকে ঘরের বউ করে নিতে পিতামাতার আপত্তি থাকেনা।

৫.৪.৭ বিবাহের রীতিনীতি

ত্রিপুরা সমাজব্যবস্থায় চার ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল *১) হামজাক-লাই লামা, ২) খকয়ৈই লামা, ৩) ফারান খৌলায়ৈ লামা, ৪) চামিরি কামা*। ত্রিপুরা সমাজে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন আছে। ত্রিপুরা সমাজে বহু বিবাহ সিদ্ধ; তবে তা অতীতকাল থেকে এ রীতি সমাজে নিন্দনীয় ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত।

ত্রিপুরাদের বিয়ে রীতি সাধারণত তিন ধরনের: (১) *কাইজারাই কৌচাং* বা প্রজাপত্য বিয়ে (২) *কাইজালাই বচং* বা গন্ধর্ব বিয়ে এবং (৩) *কাইজালাই কুসুর* বা অসুর বিয়ে। ত্রিপুরা জনজীবনে দুই পদ্ধতিতে বিয়ের অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করা হয়ে থাকে: তান্ত্রিক পদ্ধতি, বৈদিক পদ্ধতি। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিয়ে উপলক্ষে দুটি পূজানুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এ দুটি পূজানুষ্ঠানের নাম *চুমলাই* পূজা ও *কাথারক* পূজা। ত্রিপুরা সমাজে সকল গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সিদ্ধ। তবে রক্ত সম্পর্কীয় তিন পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ। বৈদিক পদ্ধতিতে পুরোহিত সমগ্র বিয়ে কার্যাদি পরিচালনা করে থাকেন। এ পূজানুষ্ঠানের অধিদেবতার নাম প্রজাপতি আর এ কারণে ত্রিপুরীদের বিয়ে সম্পর্কিত নিমন্ত্রণ পত্রের উপরে শ্রী শ্রী প্রজাপত্রয়ে নম: এই বাক্যটি উৎকীর্ণ থাকে।

বিয়ের নানা আনুষ্ঠানিকতা, প্রীতিভোজ, পূজা ও নৃত্যগান শেষে বাড়ির মা ও খালারা বরণ ডালায় ধান, দূর্বা ঘাস দিয়ে মাঙ্গলিক আচার করে নববধূকে বরণ করে নেন। এ সময় ত্রিপুরা গান গায়-

নোকখুং নোক লক্ষি হামজুকয়া সাজুকসে (নোকখুংনি মালিক) নকসে
(মাইরাংনি মালিক নকসে)
অতিগর্বা ফায়ীইবো হায়া চায়া
অংগীইবো
গালনি কাচার অংগীইবো
ঘরনি কাচার ফায়ীউবো নোকাখুং নোক লক্ষি নকস্তে
ঔগো মাইক্রৗই মাই রনাই
খা তৗই ক্রৗই তৗই রনাই
জগত সংসারনী পালি নাই
ঘায়া চায়ানী রুজুল নাই
নোক খুং নোক লক্ষি নকসে
(খোকন ২০১৮)

এই গানের অর্থ হল- গৃহলক্ষ্মী মা গো তুমি নাও পর কন্যা। তুমি আমাদের নন্দিনী, শান্তি প্রদায়িনী। যদি আসে অতিগর্বা, দিন দুপুরে কিংবা রাত্রের গভীরে কেউ তোমার সেবা থেকে বঞ্চিত হবে না। তুমি তৃষ্ণা নিবারনী অন্ন ধাত্রী, জগত পালিনী, বিপদ বারণী। তুমি নন্দিনী শান্তি প্রদায়িনী মা।

ত্রিপুরা সমাজে বিয়ের দুদিন পর বর ও কনের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনদের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এটাকে ত্রিপুরারা একে-বেলাও জেখমা বলে। নিয়ম অনুসারে এ অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বরকেই বহন করতে হয়। তবে বর্তমানে ত্রিপুরা সমাজে বিয়ের এই আদি রেওয়াজগুলোর অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে। আবার ত্রিপুরাদের হালাম সমাজে বিয়ে ঠিক হলে পঞ্জিকা দেখে রাশি গণনার মাধ্যমে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। এদের বিয়ের আগের দিন বরকে দলবেঁধে কনে বাড়িতে যেতে হয়। আবার বিয়ের পর দুদিন বরযাত্রীসহ কনের বাড়িতে থেকে কনেকে বরের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু আদিতে হালামদের বিয়ের আগের দিন কিছু

লোক কনেকে বরের বাড়িতে নিয়ে এলে কনেকে একটি আলাদা ঘরে রাখা হতো। তার পরের দিন বরের বাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হতো। কলই হালামদের ভাষায় ওই বিয়েকে-হামজুক কমন বলা হয়। তবে বর্তমানে হালামরা ব্রাহ্মণ দিয়েই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে।

বিয়ে উপলক্ষে ত্রিপুরারা কাথারক নামক পূজা করে থাকে। অচাই বা পুরোহিত বর-কনের কল্যাণ, শান্তি ও সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে এ পূজার আয়োজন করে। পূজার মূল উদ্দেশ্য থাকে মঙ্গল কামনা। তাই এটিকে অনেকেই মাঙ্গলিক পূজাও বলে থাকে। এই পূজার প্রধান বিষয় নৃত্য। পূজা শেষে কনে পক্ষের একজন ও বর পক্ষের একজন কেঞ্জু ও কেনা নাম ধারণ করে গলায় ফুলের মালা পড়ে, মাথায় বোতলের উপর দীপ শিখা জ্বালিয়ে ঢোলের তালে তালে নানা নান্দনিক ভঙ্গিতে নাচে। আবার বোতল মাথায় পানিপূর্ণ কলসের ওপর বসানো পিতলের থালায় ভর করেও নৃত্য করে ত্রিপুরারা। এদের কাছে এই নৃত্য আনন্দ উদযাপনের প্রতীক। নৃত্যের উপকরণগুলোও ত্রিপুরাদের কাছে নানা অর্থ বহন করে। যেমনঃ পানিপূর্ণ কলস কর্মের প্রতীক, মদের বোতল শৌর্য-বীর্য ও শক্তির প্রতীক, প্রদীপ শিখা জ্ঞানের প্রতীক, এবং ফুলের মালা ভক্তির প্রতীক।

বিয়েতে চুমলাই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরাদের ঘরের ভেতরে। লক্ষ্মী-নারায়ণ দেবতার নামে এ পূজার আয়োজন করা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ যুগলকে ত্রিপুরা ভাষায় চুমলাই বা চুমলাং বলে। অনুপক্ষী ও বরাহ বলি দিয়ে এই পূজা শুরু করতে হয়। উপকরণ হিসেবে প্রয়োজন পড়ে তুলা দিয়ে তৈরি একটি ফুলের মালা, একটি বানা (পতাকা), এক সের আতপ চাল, এক সের ধান, খই, বাস্পে সিদ্ধ করা কলা পাতার পিঠা, এক বোতল মদ, পাঁচ খণ্ড কাঁচা হলুদ, উথপ, মারাই, দিক, পিড়া, একখানা বস্ত্র ও বলির জন্য এক জোড়া অনুপক্ষী ও একটি বরাহ। ত্রিপুরাদের সনাতন রীতি অনুসারে বিয়েতে বরপক্ষ কনেপক্ষকে দাফা বা নগদ অর্থ দিতে হয়। মা-বাবা কন্যাসন্তানকে অনেক কষ্ট করে ছোট থেকে বড় করেছেন। কন্যার পরিবারের আয়-উৎপাদনে সহযোগিতার উপযুক্ত সময় এখন। এ সময়ে তাকে বিয়ে দিতে হচ্ছে। তাই যে বরপক্ষ কনেপক্ষের পরিবারের কন্যাসন্তানকে বউ করে নিয়ে যাচ্ছে সেই কন্যার শিশু অবস্থা থেকে বর্তমান অবধি যে সব খরচ হয়েছে সে খরচ বর পক্ষকে দিয়ে যেতে হবে। এ হলো দফা রীতির মূল কথা। এ রীতি ত্রিপুরা সমাজে অনেক প্রাচীন। তবে বর্তমানে নানা সামাজিক পটপরিবর্তনের ফলে এ রীতির প্রচলন হ্রাস পেয়েছে।

এ সমাজে বিধবা নারী যদি আর্থিকভাবে অক্ষম হন এবং তাকে যদি কোনো পুরুষ বিয়ে করতে রাজি হয়, তবে বিধবা বিয়ে হয়ে থাকে। স্বামী পরিত্যক্ত নারীও বিধবার ন্যায় এ রকম বিয়ে করতে পারেন। শুধু পুরোহিত বা অচাইয়ের মন্ত্রপাঠের মাধ্যমেই এ বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা হয়। বিয়ের পর সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য ভোজেরও ব্যবস্থা থাকে। তবে সাক্ষী রেখে গন্ধর্ব বিয়ের মতো এ বিয়ে হয় না। ত্রিপুরা সমাজে বহু বিবাহ তেমন

দেখা যায় না। ত্রিপুরাদের গ্রামীণ সমাজে সালিশি বা গ্রাম্য বিচারকের মাধ্যমে বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বামী শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করলে, রীতিমতো ভরণপোষণ না দিলে, অন্য মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়লে, স্বামী নেশাগ্রস্ত প্রভৃতি কারণে বিয়ের বিচ্ছেদের জন্য গ্রাম্য বিচারককে জানাতে পারেন। তিনি অত্যন্ত দুইবার স্বামীর অঙ্গীকার নিয়ে বিষয়গুলো বুঝিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাতেও স্বামী সংশোধিত না হলে তিনি তার কাছ থেকে নির্দিষ্ঠ সময়ের জন্য নির্দিষ্ঠ পরিমাণ ভরণপোষণ আদায় করে বিয়ে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে থাকেন। স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি ভালো আচরণ না করে, অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে যদি গোপন সম্পর্ক গড়েন, কিছু লোকাচার যেমন- সন্ধ্যায় বাইরে যাওয়া, রাস্তায় চুল খুলে বসে থাকা প্রভৃতি কারণে বিয়ের বিচ্ছেদ চাইতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও স্ত্রীকে দুইবার সর্তক করে শেষবার বিচ্ছেদ ঘটানো হয়।

ত্রিপুরা সমাজে অবৈধ যৌন মিলনের মতো অপরাধে পাড়া প্রধান, মাতব্বর ও মুরব্বিগণ সালিশির মাধ্যমে সামাজিকভাবে নিস্পত্তি করে থাকেন। সাধারণত অবৈধ যৌনাচারের জন্য সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও নারীকে আর্থিক দণ্ড দিতে হয় এবং শূকর জবাই করে পাড়ার মুরব্বি ও লোকজনদের খাওয়াতে হয়। কিন্তু ধর্ষণের ক্ষেত্রে আর্থিক দণ্ড ও ভোজ ছাড়াও ধর্ষণকারীকে বেত্রাঘাত করে গলায় জুতার মালা ও শূকরের নাড়িভুঁড়ি পরিয়ে পাড়ায় হাঁটানো হয়। আবার অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত কোনো অবিবাহিতা মেয়ে যদি গর্ভধারণ করে তাহলে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে পাড়ার লোকদের ভোজ খাইয়ে সামাজিক স্বীকৃতি নিতে হয়। এ ছাড়া বিবাহিত নারী গর্ভবতী হলে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যার সঙ্গে সে যৌনাচারে লিপ্ত হয়েছে তাকে পাড়ায় ভোজের ব্যবস্থা করে পিতৃত্ব স্বীকার করে নিতে হয় এবং সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

বিয়ে নিয়ে ত্রিপুরা সমাজে বেশ কিছু লোকবিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। এরা বিয়েতে নবদম্পতির ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হবে এর জন্য চমৎকার এক পরীক্ষা করে থাকে। এই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় কাঠাল ও বাঁশপাতার। পুরোহিত ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা আঙুলের মাঝখানে দুটো পাতা রেখে হঠাৎ মাটিতে নিক্ষেপ করে। যদি পাতা দুটো একত্রে চিত হয়ে পড়ে তবে তাদের দাম্পত্যজীবন খুব সুখের হবে। আর যদি পাতা দুটো উল্টো হয়ে পড়ে তবে তাদের মধ্যে অমিল দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ত্রিপুরারা বিশ্বাস করে। ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীরা বিশ্বাস করে, বিয়ের মাধ্যমে একটি সুখী পরিবারের সৃষ্টি হয়। তাই সৃষ্টিকর্তার কৃপা লাভের আশায় এরা বিয়ের আচারগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে থাকে। মূলত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমেই ফুটে ওঠে ত্রিপুরাদের সংস্কৃতি। নৃবৈজ্ঞানিকভাবে দেখা যায় যে ত্রিপুরারা এখনো তাদের ঐতিহ্যগত আচার বিশ্বাস ও ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে যা তাদেরকে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীদের থেকে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র করে।

৫.৫ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৫.৫.১ পরিবারের বর্তমান অবস্থা ও পরিবর্তনের কারণসমূহ

বর্তমান অধ্যয়নটিতে আমরা দেখেছি ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ব্যবস্থায় ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। কিছু অন্ত ও বহিঃ চলকের ফলে পরিবর্তন হচ্ছে যা অধ্যয়নটি বিশ্লেষণ করে। পারিবারিক কাঠামোতে এই পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে দায়ী করা যায় সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনকে। আধুনিকায়ন ও নগরায়নের পরপরই মূলত এই পরিবর্তনগুলো আসতে শুরু করে। দেখা যায় যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়াও পরিবর্তন এসেছে পরিবারের কর্তৃত্বে, পরিবারে নারীর অবস্থানে, সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচনে এসেছে সদস্যদের স্বাধীনতা, এবং এসব বিষয়ের সাথে মানিয়ে নিতে পরিবারের দায়-দায়িত্বও কমেছে অনেকটা।

৫.৫.১.১ উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন

নৃগোষ্ঠীসমূহের আগেকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক। যেখানে জুম ছিল প্রধান উৎপাদন উপায়। পুরো পরিবার একইসাথে কাজ করে নিজেদের জীবিকার যোগান দিতো। জুমের মালিকানা থাকতো পরিবারের সকলের, তাই দেখা যেত চাচাতো ভাইয়েরা একসাথে একই ক্ষেতে কাজ করছেন। পরিবারের একেকজনকে একেক কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হতো, যার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হতো তাকে তা-ই করতে হতো। পরিবারের অন্যান্য দায়িত্বও আরো বেশি ছিল তখন। নৃগোষ্ঠীসমূহের মাঝে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার তেমন একটা প্রচলন ছিলো না, পরিবারের হাতেই ছিল শিক্ষা ও কাজের জন্য প্রশিক্ষণের ভার। কারো অসুখ হলে সেবাদান, শিশুদের লালন পালন, বৃদ্ধদের যত্ন- এসব দায়িত্বই পালন করতে হতো পরিবারকে। আধুনিকায়নের ফলে আয়ের প্রধান উৎস হয়ে উঠলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। জমির উপর নির্ভর করে সবাই একসাথে থাকার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এর ফলে। কাজের সন্ধানে সম্প্রদায় ছেড়ে অন্য স্থানে মানুষ গমন শুরু করে। এক্ষেত্রে বিশাল পরিবারের চেয়ে একক পরিবারেই সুবিধা বেশি। এখন কাজ আর কারো ওপর অর্পিত হয় না, যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করে নিতে হয়। যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে আসলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা। পরিবার মুক্তি পেল শিক্ষা দান ও কাজের প্রশিক্ষণ দেয়ার ভার থেকে। খাদ্য উৎপাদনের সম্পূর্ণ ভারও পরিবারের কাঁধে আর নেই, এর জন্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু এখনো সন্তানদের জন্মদান ও লালন-পালন পরিবারেই হচ্ছে। কিন্তু এর আকার ও ধরণে আমুল পরিবর্তন আসছে। নৃগোষ্ঠীসমূহের মাঝে পূর্বে শল্য চিকিৎসা গ্রহনের হার ছিল কম। কেউ অসুস্থ হলে পরিবারের অন্যরা

সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলত। কিন্তু বর্তমানে অসুস্থদের সেবার জন্যে গড়ে উঠেছে প্রচুর হাসপাতাল। আগে এসব কারণে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য। এখন সেই প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে। তাই পরিবার প্রথার ভাঙ্গনও ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে এর মানে এই নয় যে পরিবারগুলোর মধ্যে বন্ধন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে। পরিবারগুলো ভিন্ন হয়ে ঘর বাঁধলেও বন্ধন সম্পূর্ণ মুছে যায়নি, তবে আগের চেয়ে যে কমেছে এটি সত্যি। আধুনিকতার সাথে গা ভাসিয়ে দিয়ে অনেক পরিবারের বন্ধন হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়েছে। একটা সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নতির বিনিময়ে ঐতিহ্যগত পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন কৃষি নির্ভরতা কাটিয়ে আধুনিক চাকুরি করছে অনেকে। কিন্তু এর ফলে বন্ধন ও যোগাযোগ কমে গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। ফলে পরিবারগুলোতে কাঠামোগত শিথিলতা ও রূপান্তর পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৫.৫.১.২ ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তন

নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবারে কর্তৃত্বের পরিবর্তন এসেছে। আগেকার পরিবার প্রথায় সিদ্ধান্ত নেয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল বয়োবৃদ্ধদের হাতে। কাজ এবং জীবন সম্পর্কে যেকোনো পরামর্শ নেয়ার জন্য সবাই তাদের দ্বারস্থ হতো। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা উপদেশ দিতেন। কিন্তু আধুনিক সুযোগ সুবিধার ফলে এ চিত্র বদলে গেছে। এখন পরামর্শের জন্য কেউ বয়স্কদের ওপর ভরসা করতে পারেন না। অনেকে ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে (Indigenous Knowledge) সেকেলে ভেবে থাকেন। বয়স্কদের অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞান আধুনিক জ্ঞানের কাছে স্থান ছেড়ে দিয়েছে অনেকাংশে। ফলে দেখা যায় নতুন প্রজন্মের চাকরির জন্য বা বাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য পরামর্শ দেয়ার ক্ষমতাও বয়স্করা রাখেন না। এসকল কারণেই বয়স্কদের হাত থেকে সংসারের কর্তৃত্ব চলে গেছে। বিবাহ ও যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। আগেকার সময়ে বিবাহ ছিল এক ধরনের অর্থনৈতিক চুক্তির মতো। দুই পরিবার তাদের সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী সন্তানদের বিবাহ ঠিক করতো। পাত্র-পাত্রীর প্রেম ভালোবাসা নয়, দুই পক্ষের সম্পদ ও মর্যাদাই সেখানে মূখ্য বিবেচ্য বিষয় হতো। তবে এ চিত্র বদলে গেছে প্রায়, বিবাহের ক্ষেত্রে এখন আর পারিবারিক পছন্দ মেনে নিতে তরুণ-তরুণীরা আগ্রহী নয়। পরিবারের সিদ্ধান্তের চেয়েও তাদের কাছে গুরুত্ব বাড়ছে নিজেদের পছন্দ ও অনুভূতির।

৫.৫.১.৩ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের উদ্ভব

সমাজ পরিবর্তনের সাথে নৃগোষ্ঠীসমূহের আদর্শ ও চিন্তাধারাতে পরিবর্তন এসেছে। আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন ও অভিগমনের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের উদ্ভব ঘটেছে। পরিবারের পছন্দের বাহিরে গিয়ে ব্যক্তি নিজের

পছন্দকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া এখন বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী তাদের আগের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের ভিন্ন বাসস্থানে বসবাস করছে, তারা নিজেদের সংসার সম্পূর্ণ নিজেদের মতো করে সাজাতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উদ্ভবের কারণে সম্প্রদায়গত বিশুদ্ধতা রক্ষাও কঠিন হয়ে উঠছে। ব্যক্তি যৌথ পরিবারে থাকার পরিবর্তে একক পরিবারের নিজের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করছে। পাশাপাশি নৃগোষ্ঠীসমূহের ঐতিহ্যগত ধর্মের প্রতি ও বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণেও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত জীবন যাপন পেয়ে ব্যক্তি হয়ে উঠছে আরো আত্মকেন্দ্রিক এবং ভোগবিলাসী। এসব কিছু পরিবার এবং বিবাহ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনছে। নতুন দম্পতি সন্তান হলেই তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে নতুন একটি ছোট্ট একক পরিবারের স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। পরিবারে সামষ্টিক চিন্তা করা পরিবর্তে ব্যক্তি নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা চরম আকার ধারণ করে। যৌথ পরিবারের স্থলে স্থান পায় একক পরিবার। নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজে এক সময় যৌথ পরিবার প্রথাই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একেকটি পরিবারে অনেকজন পর্যন্ত সদস্য ছিল। এই পরিবারে সাধারণত একজন কর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। আর সবাই বিনা বাক্য ব্যয়ে তা মেনে নিত। কালের পরিক্রমায় যৌথ পরিবার প্রথা নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে। এখন তিন চার সদস্য নিয়ে একক পরিবার গড়ে উঠছে। পরিবারে সবাই নিজের মতো স্বাধীন ভাবে জীবন পরিচালনা করতে চায়। সন্তানদের অতিমাত্রায় স্বাধীনচেতা মনোভাব বাবা মার সাথে যৌথ পরিবারে থাকতে বাঁধার সৃষ্টি করে। মং মারমা (৫২) বলেন-

আমরা চার ভাই বাবা মায়ের সাথেই ছিলাম। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর আমরা আলাদা হয়। তবে ইচ্ছা করে আলাদা হয়নি আমরা, ঘরের সংকুলান না হওয়ার কারণে আমরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তবে আমরা অনেক কষ্টে আলাদা হয়েছি। কারণ আমরা চাইছিলাম না আলাদা হতে। কিন্তু আমার ছেলেদের বেলায় দেখা যায় বড়জন বিবাহ করে বউ নিয়ে বান্দরবান থাকে, আর মেজজন আমার পাশেই আলাদা সংসারে থাকে। বিবাহের পরে দুই বছর আমার সাথে ছিল, কিন্তু এর পরে ছোটখাট বিষয় নিয়ে বিবাদ করে। তাই আমি আলাদা করে দিয়েছি। আর ছোটজন এখনো বিবাহ করেনি। আমার সাথেই আছে। কে জানে বিবাহের পরে ছোটজন আমার সাথে থাকতে চাইবে কিনা!

৫.৫.১.৪ যৌথ পরিবারের অসুবিধা

যৌথ পরিবার ভাঙ্গনের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা। যৌথ পরিবারে যে কেবল সুবিধাই ছিল তা নয়। একটা বিশাল পরিবারে ছেলে-মেয়েদের নিজেদের স্বাধীনতা, গোপনীয়তা খুব

কমই থাকতো। অধিকাংশ সময়ই দেখা যেত বয়স্কদের অযৌক্তিক মতামত চাপিয়ে দেয়া হতো তাদের ওপর। আর এতজন একসাথে থাকার ফলে ঝগড়া-বিবাদও খুব দুর্লভ কিছু ছিলো না। নরেশ ত্রিপুরা (৩৫) বলেন-

আমরা তিন ভাই একসাথে ছিলাম। আমি মেঝো। আমার অন্য দুই ভাই ভাল উপার্জন করত। আমার আয় তুলনায় তাদের চেয়ে কম ছিল। তাছাড়া তাদের চেয়ে আমার সন্তান সংখ্যা বেশি। এটা নিয়ে আলোচনা হত যে আমি আয় করি কম কিন্তু আমার পরিবারের পিছনে খরচ হয় বেশি। আমি আয় বৃদ্ধি করতে চাইলাম। কিন্তু কোন উপায় পেলাম না। অপরদিকে আমার ভাইয়ের সন্তানরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পায় তুলনায় আমার সন্তানরা কম পাচ্ছিল। এছাড়া বড় ভাইয়ের বড় ছেলেও উপার্জন করত যা নিয়ে বড় ভাবী আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতো যে আমরা তাদের উপার্জন খায়। পরে সব দিক বিবেচনা করে আমি আর আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলাম আলাদা থাকার। কষ্ট করে থাকলেও অন্যের কথা যাতে শুনতে না হয়।

প্রায়ই দেখা যেত, একজন অন্যজনের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও অনধিকার চর্চা করছে। এসব বিষয় থেকেও মানুষ মুক্তি চাইতো। এগুলোও যৌথ-পরিবার প্রথা ভাঙ্গার একটা বড় কারণ। দিন দিন মানুষের একা হয়ে যাওয়া, বন্ধন কমে আসা এগুলো নেতিবাচক সন্দেহ নেই, তবে ইতিবাচক কিছু বিষয়ও আছে। আগের মতো বস্তুগত নির্ভরশীলতা কমে যাওয়ায় এখনকার আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে অনেকটাই বিশুদ্ধ অনুভূতির সম্পর্ক বলা যায়, যেগুলো কেবলমাত্র স্বার্থের জন্য রক্ষিত নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে মানুষ নিজের মতো করে নিজের জীবনকে সাজিয়ে নেয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছে। বাড়ছে প্রত্যেকের নিজের পছন্দ, মতামত ও চাহিদার মূল্য। এর ফলে ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষমতার চর্চা বাড়ছে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পরিবর্তে বিস্তৃত ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এসব পরিবর্তন এসেছে সমাজের অন্য পরিবর্তনগুলোর সাথে নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে। আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, ও নগরায়নের সাথে খাপ খাইয়ে নিতেই পরিবার কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে পরিবার ও বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান বদলে যাবে আরো (আহমেদ ২০১৮)। ফলে নৃগোষ্ঠীসমূহের ঐতিহ্যগত পরিবার ও বিবাহ প্রথাসমূহ আধুনিকতার ভাবধারায় পরিবর্তন হয়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজের সাথে সংমিশ্রিত হচ্ছে।

৫.৫.১.৫ স্বনির্ভরতা

ঐতিহ্যগত সমাজের স্থলে নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থার প্রসার, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং সংখ্যানুপাতিক হারে জীবিকার তারতম্য ঘটতে থাকায় যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে। জীবন ও জীবিকার তাগিদেই আগের মতো ভাই-ভাই এক সঙ্গে বসবাস করেন না। অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার পাশাপাশি অনেকে বহিঃবিশ্বের অনেক দেশে অভিগমন করেছে।

এরফলে বাবা-মার সাথে গ্রামে বসবাস করতে পারছে না পরিবারের সদস্যরা। স্থানীক দূরত্বের সাথে যোগ হয় মানসিক দূরত্ব। ফলে সামাজিক রীতির আদান প্রদান হয় খুবই কম। কারণ সবাই জীবিকার তাগিদে চাকুরী ও পেশা নিয়ে এতো ব্যস্ত যে নিজের সম্প্রদায়ের সাথে মিথস্ক্রিয়ার করার সময় পায় কম। আগে নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবারের প্রত্যেকে কোন না কোনভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন সেই নির্ভরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারে ছেলে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কিছু না কিছু একটা করছে। আবার ছেলের বউও কোন না কোন পেশায় যুক্ত থাকছে কিংবা ছেলের বউ যুক্ত না থাকলেও আগের যুগের মতো নির্ভরশীল নয়। স্বনির্ভরতা ও আত্মনির্ভরশীলতা নৃগোষ্ঠীসমূহকে যেমন স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করে তুলছে অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধন নষ্ট করে দিচ্ছে যা ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর হয়ে নতুন উপরিকাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছে।

৫.৫.১.৬ প্রজন্মগত দূরত্ব

বাবা মায়ের সাথে প্রজন্মগত দূরত্বের কারণে মতের বা চিন্তাধারার মিল না হওয়ায় অনেক সময় সামাজিক সমস্যা দেখা দেয় । বাবা-মার কাছে যা সঠিক মনে হয় ছেলে বা ছেলের বউয়ের কাছে তা সঠিক মনে নাও হতে পারে। বর্তমান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাবা মায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানমূলক উপদেশ অনেক ক্ষেত্রে ছেলে বা তার বউ নিতে পারেনা। আধুনিক শিক্ষিত চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যে এ প্রবণতা আছে। যেমন নাতী জন্মের পরে দাদী ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান ও চিকিৎসার প্রতি জোর দিলেও পুত্রবধুকে আধুনিক চিকিৎসার উপর জোর দিতে দেখা যায়। প্রজন্মগত দূরত্বের কারণে এরকম ছোট খাট নানা বিষয়ে মতের অমিলের কারণে সন্তানেরা বাবা-মার সাথে থাকতে আগ্রহী হয় না । এ ছাড়াও দেখা যায় যে সন্তানদের মাঝে সহনশীলতার বেশ অভাব । যার কারণে বাবা মার সাথে না থেকে একক পরিবার গড়ে তোলে (আকতার ২০১৭)।

যাহোক, চার্ট ৫.১ এ দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন একক পরিবারের সুবিধা বেশি থাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সদস্যরা দিন দিন একক পরিবারের দিকে ঝুঁকছেন। পাশাপাশি অনেক মনে করেন যৌথ পরিবার ও বর্ধিত পরিবার ভাঙ্গার পিছনে একটি অন্যতম কারণ হল এর অসুবিধা। কিন্তু কিছু সংখ্যক সদস্য মনে করেন নৃগোষ্ঠীসমূহের যৌথ পরিবার ভাঙ্গার পিছনে রয়েছে অন্যন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রভাব। অর্থাৎ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে এই তিন নৃগোষ্ঠীর পরিবার প্রথা প্রভাবিত হয়েছে। অন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দেখাদেখি এদের মধ্যে একক পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু উত্তরদাতা মনে করেন মূলধারার বাঙ্গালী সমাজ

সংস্কৃতির প্রভাবে নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং এর ফলে একক পরিবার গড়ে উঠছে।

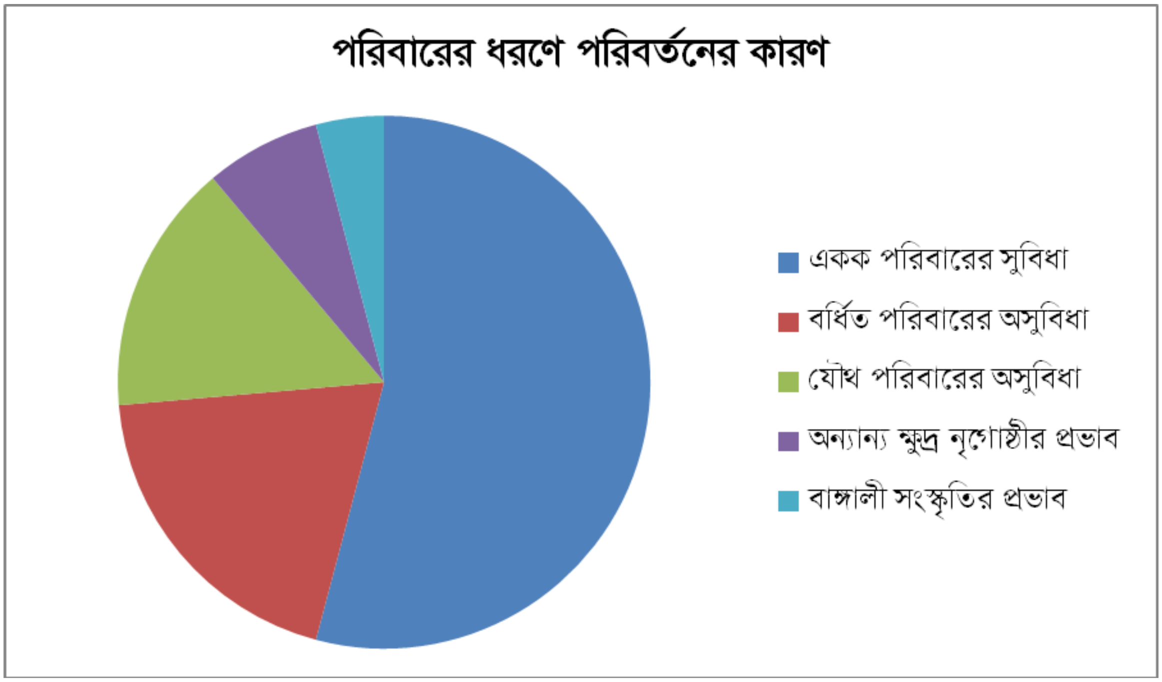

চার্ট ৫.১ঃ পরিবারের ধরণে পরিবর্তনের কারণ

৫.৫.২ বিবাহ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও পরিবর্তনের কারণসমূহ

বর্তমান অধ্যায়ের এ অংশে বিবাহের রীতিনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নৃগোষ্ঠীসমূহের বিবাহের মাঝে পরিবর্তন ঘটছে। পরিবার গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে বর্তমান অধ্যয়নে বিবাহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ বিবাহ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হলে তা কোন একসময়ে পরিবারকে প্রভাবিত করে। অধিকন্তু বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ায় সমাজ পরিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভেতর ও বাহিরে পরিবর্তনের নিগূঢ় অনুসন্ধান করা হয়েছে। আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্মিলিত উপায়ে নিচে বিবাহ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা দেখানো হল।

৫.৫.২.১ ক্রস কাজিন ও প্যারালাল কাজিন বিবাহ

চিত্রে দেখা যাচ্ছে নৃগোষ্ঠীসমূহের দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে ক্রস কাজিন বিবাহ প্রচলিত নেই। অর্থাৎ বাবার বোনের অথবা মায়ের ভাইয়ের মেয়ে বা ছেলেকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত নেই তিনটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে দুইটিতে। এই

দুইটি নৃগোষ্ঠী হল চাকমা ও ত্রিপুরা। অন্যদিকে মারমাদের মধ্যে ক্রস কাজিন বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। আর প্যারালাল কাজিন বিবাহ অর্থাৎ মায়ের বোনের অথবা বাবার ভাইয়ের মেয়ে বা ছেলেকে বিবাহ করার রীতি নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজে প্রচলিত নেই। খগেন ত্রিপুরা (৫১) বলেন-

বর্তমানে অনেক ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি যুব সমাজ মানছেনা। এর মধ্যে অন্যতম হল প্যারালাল কাজিন বিবাহ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় প্যারালাল কাজিনের আওতাভুক্ত ছেলে মেয়ে বিবাহ পূর্ব প্রেম ভালবাসা করছে। তখন সম্মতি না দিলে তারা পালিয়ে বিবাহ করবে যাতে সম্মান হানির সম্ভাবনা থাকে। তখন অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করে। এক সময় দুই পরিবার বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে নেয়।

চার্ট ৫.২ এ ক্রস কাজিন বিবাহ দেখানো হল-

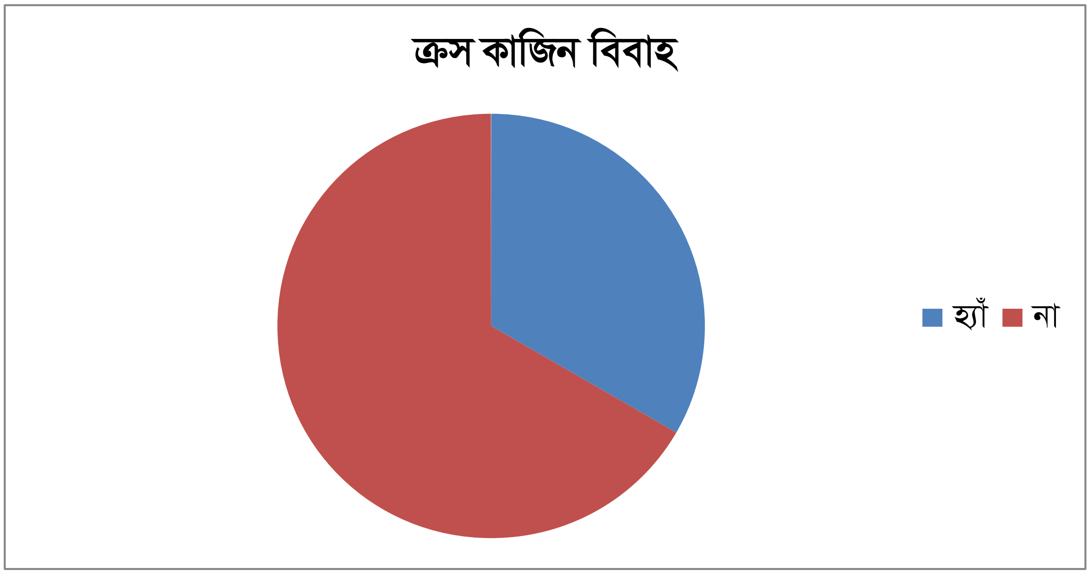

চার্ট ৫.২ঃ ক্রস কাজিন বিবাহ

৫.৫.২.২ পরিবারকর্তৃক আয়োজিত বিবাহ ও প্রণয়ঘটিত বিবাহ

চিত্রে দেখা যাচ্ছে নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বর্তমানে প্রণয়ঘটিত বিবাহের পরিমাণ বেশি অতীতের তুলনায়। অন্যদিকে অতীতে পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহের সংখ্যা বেশি হলেও বর্তমানে এ ধারা পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের মূলধারার বাঙ্গালী সমাজ থেকে নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজ সংস্কৃতি অনেক উদার। এখানে নারী পুরুষের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও ভূমিকা রয়েছে। এই সম অধিকার বিবাহপূর্ব প্রেম ভালবাসায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

এই সমাজসমূহে বিবাহপূর্ব প্রণয়ের ক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা আছে যা বর্তমান গবেষণায় যথার্থ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

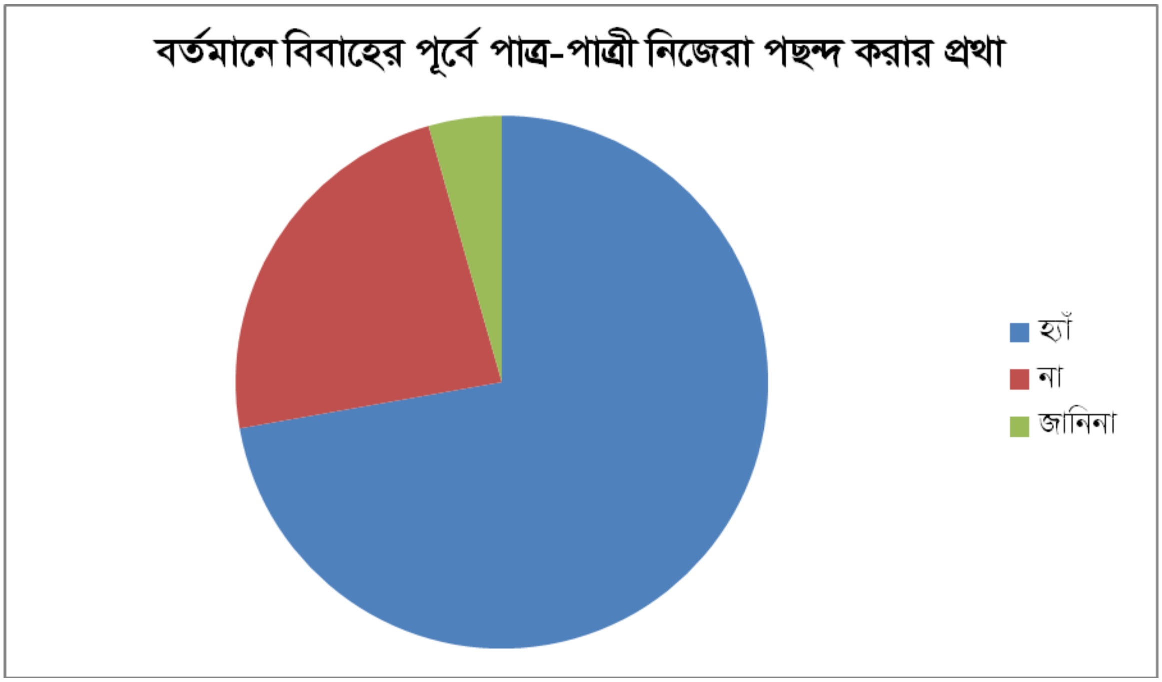

চার্ট ৫.৩ঃ বর্তমানে বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নিজেরা পছন্দ করার প্রথা

নৃগোষ্ঠীসমূহের মাঝে কিছু অন্তর্গত ও বহির্গত প্রভাবকের কারণে পরিবারের প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে, ফলে দেখা যাচ্ছে সন্তানরা নিজের পছন্দে বিবাহ করছে (চার্ট ৫.৩)। পূর্বেও বিবাহপূর্ব প্রেম ভালবাসা নৃগোষ্ঠীসমূহের মাঝে ছিল কিন্তু অনেকের সাথে আলোচনায় জানা যায়যে এ প্রবণতা খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতে প্রণয়ঘটিত বিবাহের ঘটনা ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা সমাজে যার প্রভাব ছিল কম। কিন্তু বর্তমানে প্রণয়ঘটিত বিবাহ বেশি হওয়ার ফলে সম্প্রদায়গত বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়ে বয়োজৈষ্ঠ্যরা শঙ্কিত। শঙ্কার পাশাপাশি সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং সম্প্রদায়গত বিবাদ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে যখন দুইটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ে সমাজের অনুমতি ব্যতিত প্রণয়ঘটিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর সাথে জড়িত আছে পারিবারিক বন্ধনের প্রতি উত্থানশীল হুমকি। পিতামাতা সন্তানকে নিজের মমতা ভালবাসা দিয়ে লালন পালন করে বড় করলে প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী তাদের ইচ্ছা থাকে সন্তানকে নিজের পছন্দমত বিবাহ দিবেন। কিন্তু সন্তানরা আধুনিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে পিতামাতার চাওয়াকে অবহেলা করে। এর ফলে সন্তানদের সাথে পিতামাতার দূরত্ব তৈরি হয় যা পারিবারিক বন্ধনকে হ্রাসমান করে। এছাড়া সমাজে প্রণয়ঘটিত বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন হলে অন্যরা এ থেকে

উৎসাহ পায়। এর ফলে সমাজে যুব সমাজের মাঝে প্রণয়ঘটিত বিবাহের প্রচলন বৃদ্ধি পায় ও তা সমাজের বদ্ধমূলে গ্রথিত হয়। দেওয়ান চাকমা (৪৯) বলেন-

বিবাহের পূর্বে পছন্দ করার প্রথা অতীতেও ছিল কিন্তু মাত্রা ছিল কম। তখন হাতেগোনা দুই একজন পছন্দ করে বিয়ে করত। তাছাড়া তখন ছেলে মেয়েদের মাঝে যোগাযোগ এত সহজলভ্য ছিলনা এখনকার সময়ের মত। তখন পছন্দ করে বিবাহ করলে তাকে সামাজিকভাবে অন্যভাবে দেখা হত। কিন্তু বর্তমানে পছন্দ করে বিবাহের হার খুব বেশি। এখন ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যায়, মোবাইল ব্যবহার করে, ফলে পছন্দ করার প্রবণতা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে পরিবারের অবস্থান, চাওয়া-পাওয়াকে সন্তানরা গুরুত্ব দেয়না। এজন্য পরিবারে ও সমাজে কখনো কখনো অশান্তি দেখা দেয়।

৫.৫.২.৩ বিবাহ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কারণ

বর্তমান অধ্যয়নটি বর্তমানে অধিক সংখ্যক প্রণয়ঘটিত বিবাহ হওয়ায় কারণ গভীরভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। এতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ প্রনয়ঘটিত বিবাহ হওয়ার কারণ হল আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সহজ লভ্যতা। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মোবাইল ও ইন্টারনেট। মোবাইল যোগাযোগ সহজ হওয়া কারণে অবিবাহিত ছেলে মেয়েরা বিবাহপূর্ব সময়ে খুব সহজে একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে। এর ফলে তারা যে শুধু নিজের সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ করছে তা নয়। বরং তারা মোবাইলের মাধ্যমে নিজের সম্প্রদায়ের বাহিরের ছেলে বা মেয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে সামাজিক ও পারিবারিক অঙ্গনে সমস্যার সৃষ্টি করছে। তবে নিজের সম্প্রদায়ের সাথে প্রণয় হলে পরিবার ও সমাজ তা মেনে নিচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছেলে বা মেয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে সমাজ তা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাহিরে পাত্র পাত্রী পছন্দ করলে সমাজ তা মেনে নেয়না। এর ফলে সমাজচ্যুত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। কোন নৃগোষ্ঠীর মাঝে নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে বিবাহ করাকে সামজিক স্বীকৃতি দিলে তা অন্যান্য ক্ষদ্র নৃগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ছেলে মেয়েরা নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে প্রেম ভালবাসা করার সুযোগ পায়। তাই দেখা যায় বর্তমানে অধিক প্রণয়ঘটিত বিবাহ হওয়ার কারণের মধ্যে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক সুযোগ সুবিধা পৌছে গেছে অনেক আগে। এখন ঘরে ঘরে স্যাটেলাইট সুযোগ সম্বলিত টেলিভিশন আছে।

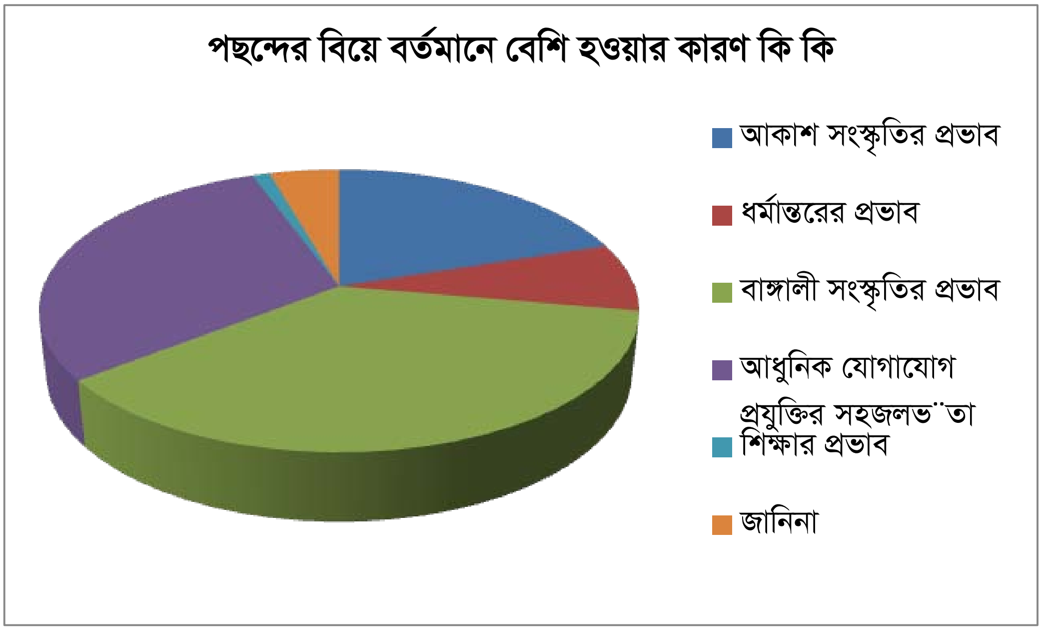

চার্ট ৫.৪ঃ পছন্দের বিবাহ বর্তমানে বেশি হওয়ার কারণ

টেলিভিশনে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা ছেলে মেয়েদেরকে প্রভাবিত করছে। ফলে বিবাহপূর্ব প্রণয়ে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। নৃগোষ্ঠীসমূহের মাঝে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে প্রথাগত মন মানসিকতার পরিবর্তে ব্যক্তি হয়ে উঠছে নিজস্ব রুচির বিষয়ে সচেতন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের চর্চা শিক্ষার হারের সাথে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে বিবাহপূর্ব প্রণয়ে ছেলে মেয়েদেরকে আকৃষ্ট করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গমনের ফলে ছেলে মেয়েদের একে অপরকে জানার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এর ফলেও বর্তমানে প্রণয়ঘটিত বিবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলে আসছে অনেক আগে থেকেই। এর ফলে ছেলে মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় বাধা আর বাধা নয়। দেখা যাচ্ছে দুইজন ভিন্ন ধর্মের ছেলে মেয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে বিবাহ করতে পারছে (চার্ট ৫.৪)। পাশাপাশি পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছে বর্তমান অধ্যয়নটি। চার্ট ৫.৫ এ দেখা যায় কিছু উত্তরদাতা মনে করেন পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহ অনেক সময়ে সমস্যা তৈরি করে বিবাহের পূর্বে ও পরে। বিবাহের পূর্বে পরিবারের পছন্দমত পাত্র পাত্রী খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য কাজ। আবার দেখা যায় বিবাহের পরে পরিবারের পছন্দের পাত্র-পাত্রীর সাথে ভাল মেলবন্ধন নেই। তখন পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়। এ জন্য পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহের পরিবর্তে প্রণয়ঘটিত বিবাহের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পাশাপাশি আধুনিকতা, শিক্ষা, এবং পারিবারিক বন্ধনের পরিবর্তে নিজের চাওয়াকে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়সমূহ জড়িত।

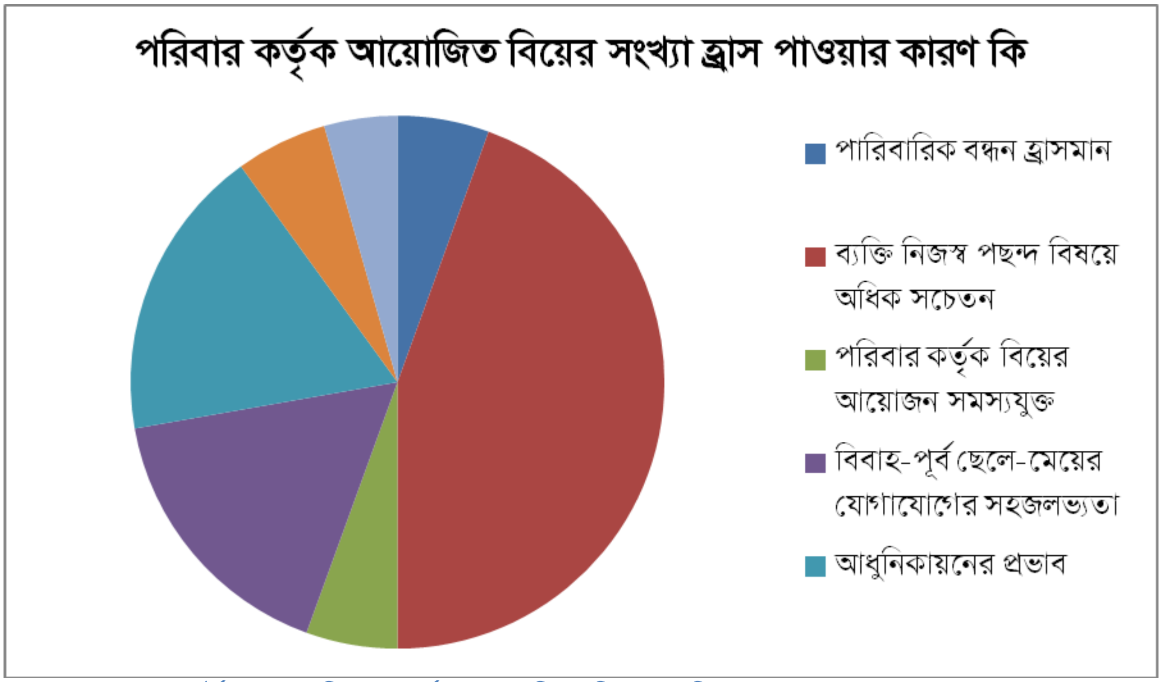

চার্ট ৫.৫ঃ পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিয়ের পরিমান হ্রাস পাওয়ার কারণ

৫.৫.২.৪ বিবাহপূর্ব প্রণয়ের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত বর্তমান গবেষণা কর্মটি বিবাহপূর্ব প্রণয়ের প্রতি নৃগোষ্ঠীসমূহের ব্যক্তিগত মতামত জানার চেষ্টা করে। আপাতদৃষ্টিতে চার্ট ৫.৬ এ দেখা যায় বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন বিবাহপূর্ব প্রেম ভালবাসা ভাল এবং সমাজ ও পরিবারের উপর এর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব নেই। আর কমভাগ মনে করেন বিবাহপূর্ব ছেলে-মেয়েদের মাঝে মেলামেশা ভাল নয়। এখানে যথার্থতা যাচাই করা দরকার যে- যেসব উত্তরদাতা বিবাহপূর্ব প্রেম ভালবাসাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন তাদের অধিকাংশই হল যুব সমাজ যাদের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে। এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিবাহপূর্ব প্রেম ভালবাসাকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করার উচ্চ মনোভাব রয়েছে। এদের অনেকেই আবার বিবাহ করেছেন নিজেদের পছন্দে। অন্যদিকে যুবক প্রজন্মের বাহিরে বয়োজৈষ্ঠ্যরা মোটামুটিভাবে বিবাহপূর্ব প্রেম ভালবাসাকে নেতিবাচকভাবে দেখেন। এ দুই ধরণের পরস্পর মুখোমুখি দৃষ্টিভঙ্গের কারণে পরিবার ও সমাজে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

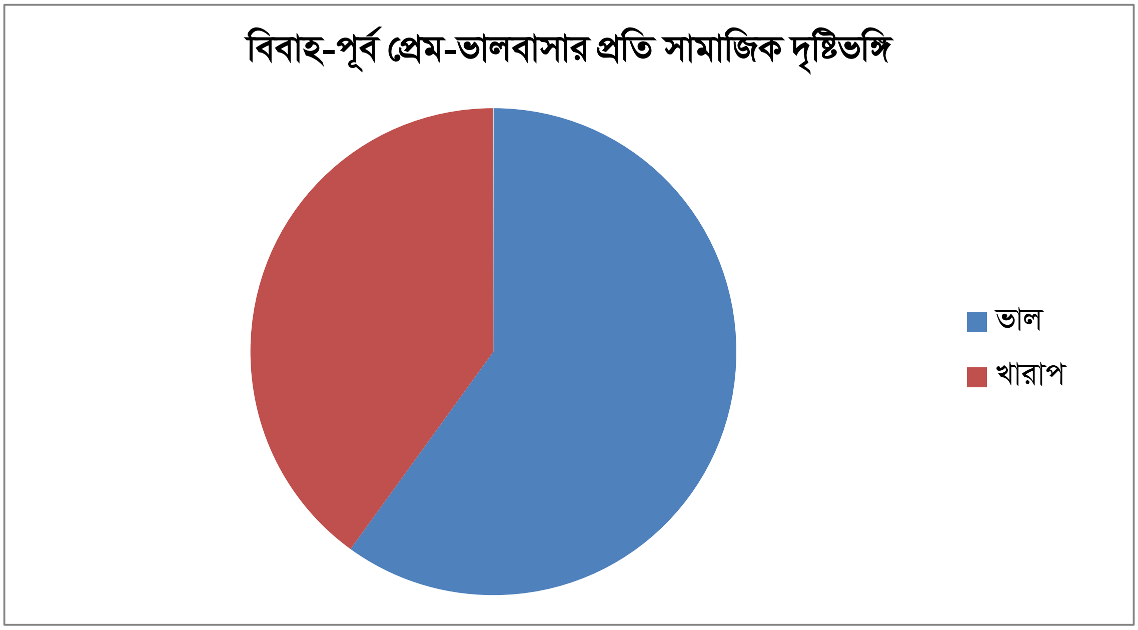

চার্ট ৫.৬: বিবাহ-পূর্ব প্রেম-ভালবাসার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

৫.৫.২.৫ বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ পক্ষকে প্রাধান্যদান

নৃগোষ্ঠীসমূহের মাঝে *দাবা* বা *দাপা* নামক একধরণের বিনিময় ব্যবস্থা আছে যেখানে বিবাহের সময় পাত্র পক্ষ কনে পক্ষকে উপহার সামগ্রী প্রদান করে। পাত্রের সামাজিক অবস্থান অনুসারে এই উপহারের পরিমাণ নির্ভর করে। পাত্র যতবেশি উপহার সামগ্রি দিতে পারবে মনে করা করা হয় কনে পক্ষকে তত সম্মান করা হল। বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণত বরপক্ষ ও কনেপক্ষ জড়িত থাকে। সামাজিক ও পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহ হল দুই পক্ষের মাঝে দরকষাকষি চলে। বাংলাদেশের মুলধারার সমাজসমূহে বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারনত পাত্রপক্ষ বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অন্যদিকে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে কনেপক্ষ বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে যা চার্ট ৫.৭ এ দেখানো হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমুহের সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল যে মেয়ের পরিবার মেয়েকে লালিত পালিত করে বরের বাড়িতে পাঠাচ্ছে তাই বিনিময় বাবদ বরপক্ষের উচিত কনেপক্ষকে কিছু উপহার সামগ্রি দেয়া। এছাড়া বিবাহের ভোজের ক্ষেত্রেও মেয়েপক্ষ বেশি প্রাধান্য পায়। ছেলেপক্ষ চেষ্টা করে মেয়েপক্ষকে ভাল করে আপ্যায়ন করতে। তবে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় *দাবা* বা *দাপায়* পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের মূলধারার সমাজ-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছেলেপক্ষের মাঝে আধিপত্যশীল মনোভাব তৈরি হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে কনেপক্ষের চেয়ে বরপক্ষ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে যা কনেপক্ষের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে।

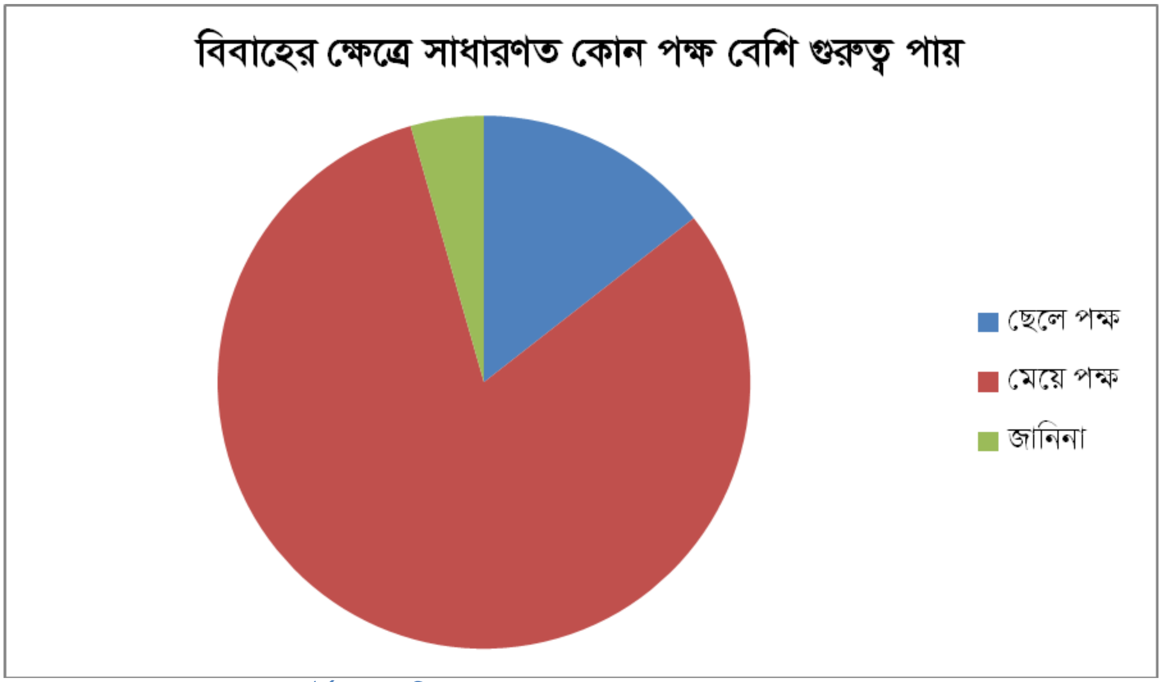

চার্ট ৫.৭ঃ বিবাহের ক্ষেত্রে কোন পক্ষকে প্রাধান্য দান

৫.৫.৩ পরিবারে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও উত্তরাধিকার

বাংলাদেশের অপরাপর সমাজব্যবস্থা থেকে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজ ব্যবস্থা কিছুটা উদার। যেমন, এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে পর্দা প্রথা নেই এবং নারীর শ্রমের উপর কোন বিধি নিষেধ নেই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে অর্থাৎ চলাফেরায় স্বাধীন, তবে অধিকার প্রশ্নে গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক ধারাই লক্ষণীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত এই তিন ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক হলেও নারীদের ভূমিকাকে মোটেও গৌণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়না। বরং সমাজ ও পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীদের অবদান সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পদের উপর এই তিন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীদের অধিকার না থাকায় পুরুষের চেয়ে নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজের প্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথায় পুত্র সন্তানই সম্পদের উপর একক ও অপ্রতিরোধ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হয়। যেমন, চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজে কন্যা সন্তানরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। কেবল দান বা উইলের মাধ্যমে নারীরা সম্পত্তির অধিকার লাভ করতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী উত্তরাধিকার লাভ করতে পারেন, তবে অপুত্রক অবস্থায় অন্য কোথাও বিয়ে হলে সে প্রয়াত স্বামীর সম্পত্তির উপর অধিকার হারায় (দেওয়ান ২০০৯)। যাহোক, বর্তমান অধ্যায়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের পারিবারিক ও বৈবাহিক বিষয়াবলীর বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। এখন আন্তঃসাংস্কৃতিক ও তুলনামূলক নৃবৈজ্ঞানিক উপায়ে নিচের সারণীতে নৃগোষ্ঠীসমূহের পারিবারিক ও বৈবাহিক বিষয়াবলী উপস্থাপন করা হল।

সারণী ৫.১৬ঃ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু	**চাকমা**	**মারমা**	**ত্রিপুরা**
পরিবার	চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে পুরুষ সদস্য যেমন স্বামী বা বড় ছেলের হাতে।	মারমা পরিবারে পুরুষ সদস্য ক্ষমতাবান। পিতার পরিচয়ে সন্তানরা পরিচয় লাভ করে।	ত্রিপুরা সমাজেও পুরুষ পারিবারিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করেন। সন্তানরা পিতার সূত্রধরে পরিচয় ও সম্পত্তির অধিকারি হয়।
পরিবারের আকার	চাকমা পরিবারের গড় আকার ৪ জন। পরিবারের আকার দিন দিন ছোট হচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠনের ফলে পরিবারের আকার ছোট হচ্ছে ক্রমাগত।	মারমা পরিবারের গড় আকার হল ৫ জন। চাকমাদের থেকে মারমাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন আপাতদৃষ্টিতে দৃঢ। এদের মধ্যে গতিশীলতা কম।	ত্রিপুরা পরিবারের গড় আকার ৫ জন। পরিবারের আকার হ্রাস পাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে কৃষি নির্ভরতা কমে যাওয়া।
পরিবার প্রধান	চাকমা পরিবারে পুরুষ পরিবারের প্রধানের ভূমিকা রাখে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষ অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখে।	মারমা সমাজেও পুরুষ পরিবার প্রধান। এ সমাজের পরিবারসমূহে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ফলে দেখা যায় নারী-পুরুষ কিছু বিষয়ে যৌথ সিদ্ধান্ত নেয়।	ত্রিপুরা সমাজে পুরুষ পরিবার প্রধান হলেও নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখনো কৃষি কাজের বেলায় নারী পুরুষ প্রায় সমান অবদান রাখে।
পরিবার প্রথা	চাকমা সমাজে একগামি বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়।	মারমা সমাজেও একগামি বিবাহ বিশিষ্ট্য পরিবার প্রথা প্রচলিত।	ত্রিপুরা সমাজে একগামি বিবাহ রীতিসিদ্ধ। বহু বিবাহ করলে সমাজ তাকে তিরস্কার করে।
পরিবারের ধরণ	ঐতিহাবাহী পরিবারের ধরণ হল যৌথ পরিবার। কিছু বর্ধিত পরিবারও প্রচলিত ছিল। কিন্তু	চাকমাদের তুলনায় মারমা সমাজে এখনো যৌথ পরিবার বেশি রয়েছে। তবে কালের	ত্রিপুরা সমাজে ইদানিংকালে একক পরিবার খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি নির্ভরতা হ্রাসের

	বর্তমানে একক পরিবার বেশি প্রচলিত।	পরিক্রমায় যৌথ পরিবারের স্থানে একক পরিবার স্থান করে নিচ্ছে।	সাথে এর সম্পর্ক আছে।
বাসস্থান প্রথা	পিতৃসূত্রীয় বাসস্থান প্রথা মেনে চলা হয়। ঘর জামাই প্রথা ব্যতিক্রম হলেও একবারেই অনুপস্থিত নয়।	মারমা সমাজেও পিতৃসূত্রীয় প্রথা বিরাজমান। তবে মাতৃসূত্রীয় পরিবারের অনেক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি রয়েছে এ সমাজে।	ত্রিপুরা সমাজেও বিবাহের পরে নবদম্পতি স্বামীর পিতার বাসস্থানে উঠে। ঘর জামাই প্রথাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়।
পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন	কিছু অন্ত ও বহি চলক যেমন শিক্ষা, আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, অভিগমন ইত্যাদি বিষয় পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করেছে।	মারমাদের ক্ষেত্রেও পারিবারিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে অন্ত ও বহি চলক যেমন শিক্ষা, আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে।	ত্রিপুরাদের ক্ষেত্রেও পরিবারে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয় প্রভাবকের ভূমিকা রাখছে যেমন আধুনিকতা, স্বনির্ভরতা, বিকল্প উৎপাদন কৌশল, দিন মজুরি, শিক্ষা ইত্যাদি।
বিবাহের রীতিনীতি	ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি মেনে বিবাহ হয়ে থাকে। বর্তমানে পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে প্রণয়ঘটিত বিবাহের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবাহের দরকষাকষির বেলায় কনেপক্ষ উপরে অবস্থান করে।	তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে মারমা বিবাহ প্রথা সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই দেখা যায় বিবাহের অনুষ্ঠানে হিন্দু গান ও নাচ চর্চা করে কেউ কেউ। মেয়েপক্ষ বেশি গুরুত্ব পায় দরকষাকষির ক্ষেত্রে।	ত্রিপুরা সমাজের ঐতিহ্যের সাথে বিবাহ প্রথা ওৎপোতভাবে জড়িত। বিবাহের বিনিময় ব্যবস্থা বা *দাবায়* এতকাল মেয়েপক্ষ গুরুত্ব পেয়ে থাকলেও মূলধারার বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ত্রিপুরাদের মধ্যে যৌতুকের চর্চা শুরু হয়েছে।

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

যাহোক, নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও বিবাহের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয় পরিলক্ষিত হয়েছে উপরের আলোচনায়। এই তিন নৃগোষ্ঠীসমূহ একে অপরের থেকে স্বাতন্ত্রের দাবীদার নিজস্ব পারিবারিক ও বৈবাহিক রীতিনীতি চর্চায়। সবার নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন আছে তেমনি পাশাপাশি বসবাসের কারণে একে অপর থেকে পারিবারিক ও বৈবাহিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও আন্তঃসাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে আলোচিত নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে উক্ত নৃগোষ্ঠীসমূহের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রথাগত ব্যবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে রূপান্তর হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্ক

৬.১ ভূমিকা

জ্ঞাতিসম্পর্ক রক্ত-সম্পর্কের সামাজিক সত্ত্বা। এটা প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাধ্যমে। বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্কও জ্ঞাতিত্বের আওতায় পড়ে। কোন ব্যক্তির কার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয়বর্গের মধ্যে সক্রিয় সদস্য হওয়ার জন্য একজনকে অবশ্যই জ্ঞাতিত্বের অবস্থানের অধিকার ও দায়িত্ব এবং জ্ঞাতিবর্গের সদস্যদের মধ্যে প্রথাগত আচরণ সম্পর্কে জানতে হয়। জ্ঞাতিসম্পর্ক, পরিবার ও অন্যান্য সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত দলের মাধ্যমেই লোকজন সাধারণত তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা করে থাকে। আত্মীয় সম্পর্কীয় দলসমূহের মধ্যে দ্বি-মুখী ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি দিলে বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সংগঠন এবং এতে বিদ্যমান সহযোগিতা ও সংঘাত অনুধাবন করা সহজ হয়। প্রতিটি পরিবারে একদল ব্যক্তিত্ব থাকে যারা সার্বক্ষণিকভাবে সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদি বিনিময় করে থাকে এবং নিজেদের লক্ষ্য ও চাহিদা পূরণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করে থাকে। জ্ঞাতিত্ব, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ব্যাপ্তি এবং সাধারণ জীবনযাপনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক একক রয়েছে। একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আত্মীয়দের অধিকার, দায়িত্ব ও আচরণ জ্ঞাতিত্ব পদ্ধতিরই অংশ।

৬.২ বর্তমান গবেষণায় জ্ঞাতিসম্পর্ক

আদি মানব সমাজ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে যে কয়টি প্রতিপাদ্য বিষয় নৃবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে জ্ঞাতিসম্পর্ক তার মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ তার আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য পরিবারের ছত্রছায়ায় সমাজে বাস করে। আর এই সমাজ গঠিত হয় জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে। ইংরেজি Kin এর আভিধানিক অর্থ কুটুম্ব, জ্ঞাতি। এই Kin থেকেই Kinship এর উৎপত্তি। আর Kinship শব্দের অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক, রক্তসম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক। রক্তের মাধ্যমে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাই হলো জ্ঞাতি সম্পর্ক। সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসন তাঁর Sociology (১৯৮৭) গ্রন্থে বলেন, "জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে ঐসব ব্যক্তির মধ্যকার এক সম্পর্কের জাল বিশেষ যাহার সাধারণ পূর্বপুরুষের উত্তরসূরী হিসেবে দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে অথবা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ"। নৃবিজ্ঞানী রিভার্স এর মতে "ব্যাপক অর্থে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে রক্ত, বিবাহ, কল্পনা, বন্ধুত্ব, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ককে বুঝায়"। মোট কথা মানুষের সাথে মানুষের জন্ম বা বংশগত বন্ধন, কাল্পনিক

অথবা পাতানো আত্মীয়তার বন্ধনকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলা হয়। অন্যান্য সমাজের মতো বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে বোঝায়:

- প্রজন্ম পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিচার (পিতা, পুত্র, দাদা-দাদি, নাতি-নাতনি প্রভৃতি)। প্রতিটি আত্মীয়পদ দ্ব্যর্থহীনভাবে আত্মীয়ের প্রজন্মকে নির্দেশ করে থাকে।
- একই প্রজন্মের মধ্যে বয়সের তারতম্য বিচার (বড় এবং ছোট ভাই-বোন, পিতার বড় ও ছোট ভাই প্রভৃতি)।
- এক বংশভুক্ত (lineal) এবং সহগামী (collateral) আত্মীয়ের পার্থক্য বিচার। একবংশ সূত্রীয় রীতি বলতে একটি রেখার মাধ্যমে চিহ্নিত সংগঠিত আত্মীয়দের বোঝায়। এ পদ্ধতিতে, শুধু পুরুষ দ্বারা পরিচিতি দেওয়া হলে তাকে পিতৃবংশ পদ্ধতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। উভয় লিঙ্গের সন্তানরা তাদের পিতার বংশের অন্তর্ভুক্ত। ওই পুরুষের সন্তান ও সন্তানের সন্তান এবং তাঁর সন্তান একই বংশের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞাতিসম্পর্ক আত্মীয়বন্ধনের মাধ্যমে নির্ণীত হয়। বাংলাদেশে আত্মীয়তা প্রধানত পুরুষের মাধ্যমে বংশধারা বন্ধনকে স্বীকার করে।
- আত্মীয়দের মধ্যে লিঙ্গের প্রভেদ (ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাতিজি ইত্যাদি)।
- সম্বোধনকারীর লিঙ্গ বিচার, (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পদ্ধতির শব্দাবলি রয়েছে)।
- যে ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাদের লিঙ্গ তারতম্য (পিতার ভাই, মাতার ভাই, পিতার বোন ইত্যাদি)। একে বলা হয় বিপরীত লিঙ্গবন্ধন (cross sex tie)।
- জন্মসূত্রে এবং বিবাহের মাধ্যমে সম্পর্কিত আত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য (বোন বা মা বনাম স্বামীর মা)।

৬.২.১ জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী

জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী হল একটি ভাষা-সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত এমন সব সম্বন্ধবাচক শব্দ যেখানে এক ব্যক্তি অপরের সাথে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পর্কিত থাকে। বিভিন্ন সমাজ জ্ঞাতিসম্পর্ককে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে এবং এজন্য বিভিন্ন পদাবলি ব্যবহার করে। যেমন কিছু সংস্কৃতিতে ভাষাগত দিক থেকে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ও বৈবাহিক জ্ঞাতির পার্থক্য করা হয়। অন্যদিকে কিছু সমাজে পিতা ও তার ভাইকে বোঝাতে কেবল মাত্র একটা শব্দই ব্যবহৃত হয়। জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলী হচ্ছে একজন জ্ঞাতিকে ডাকার ভাষাগত মাধ্যম, কিন্তু এটা কেবলমাত্র ভাষাগত বিষয় নয়, এর সাথে সমাজের বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক বন্ধন ও ঐতিহ্য-প্রথা জড়িত। নৃবিজ্ঞানী মর্গান

(১৮৭০) সর্বপ্রথম জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী বিষয়ে গবেষণা করেন। যদিও তার কাজের বিষয়ে বিতর্ক আছে তথাপি মর্গান মনে করেন জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী কিছু বিষয়কে উপস্থাপন করে। যেমন বেশিরভাগ পদাবলীই লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন করে ও প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক ও দূরত্ব নিরূপন করে। অধিকন্তু মর্গান দাবী করেন জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী জ্ঞাতিকে রক্ত ও বিবাহের মাধ্যমে পার্থক্য করে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে কিছু নৃবিজ্ঞানী দাবী করে যে কিছু সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্ক শুধুমাত্র রক্তের মাধ্যমে তৈরি হয়না। যাহোক, জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর বিচিত্র স্বভাবের কারণে তিনি জ্ঞাতিসম্পর্ককে বর্ণনা ও শ্রেণীমূলক হিসাবে আখ্যায়িত করেন (এ বিষয়ে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে)। একটি জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে যখন বর্ণনামূলক পদাবলী ব্যবহৃত হয় তখন এটা শুধুমাত্র দুইজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে, অপরপক্ষে শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের বেলায় একই ধরণের অনেক জ্ঞাতিকে বোঝায়। একই সমাজে শ্রেণীমূলক ও বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক পাশাপাশি ব্যবহার হতে পারে। যেমন ইংরেজী সমাজে *ভাই-বোন* বলতে একই পিতামাতার সন্তানকে নির্দেশ করে। এটা বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক। অপরপক্ষে পিতামাতার ভাইবোনের সন্তানকে *কাজিন* নামে সম্বোধন করা হয়। এদিক দিয়ে এটা শ্রেনীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজে দেখা যায় *কাজিনদেরকে* চাচাত ভাইবোন, ফুফাত ভাইবোন, মামাত ভাইবোন, ও খালাত ভাইবোন নামে ডাকা হয়, ফলে এটা বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক। মর্গানের দৃষ্টিতে বলা যায় একটি সমাজের বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক অন্য সমাজে শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কে রূপান্তরিত হতে পারে।

জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ছয়টি প্রধান ধরণ মর্গান (১৮৭০) উল্লেখ করেন-

- **হাওয়ায় জ্ঞাতিসম্পর্কঃ** এটি সবচেয়ে শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক। হাওয়ায় জ্ঞাতিসম্পর্ক কেবলমাত্র লিঙ্গ ও প্রজন্মের মধ্যে পার্থক্য করে। ভাই-বোন ও কাজিনদেরকে পার্থক্য করা হয়না।
- **সুদানীয় জ্ঞাতিসম্পর্কঃ** সুদানীয় জ্ঞাতিসম্পর্ক সবচেয়ে বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক। এই জ্ঞাতিসম্পর্কে দুই ধরণের জ্ঞাতির বেলায় একই পদাবলী ব্যবহৃত হয়না। কাজিন থেকে ভাই-বোনকে আলাদা করা হয় এবং বিভিন্ন কাজিনকে বোঝাতে ভিন্ন পদাবলী ব্যবহৃত হয়।
- **এস্কিমো জ্ঞাতিসম্পর্কঃ** এস্কিমো জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী শ্রেণীমূলক ও বর্ণনামূলক উভয়। লিঙ্গ ও প্রজন্মের মধ্যে পার্থক্য করা সহ বংশগত জ্ঞাতি (lineal relatives) ও রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির (collateral relatives) মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বংশগত জ্ঞাতির বেলায় অধিক বর্ণনামূলক পদাবলী রয়েছে, অপরপক্ষে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির ক্ষেত্রে শ্রেণীমূলক পদাবলী ব্যবহৃত হয়। কাজিন থেকে ভাই-বোনকে আলাদা করা হয়, যেখানে সকল কাজিনকে একই দলভুক্ত করা হয়।

- **ইরোকুইস জ্ঞাতিসম্পর্কঃ** ইরোকুইস জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী শ্রেণীমূলক ও বর্ণনামূলক উভয়। লিঙ্গ ও প্রজন্মের মধ্যে পার্থক্য করা সহ লিঙ্গের ভিত্তিতে ভাই-বোনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। একটি বংশগত সম্পর্ক স্থাপন করা হয় যাতে একই লিঙ্গের একদল ভাই-বোনকে রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভাবা হয়, অপরপক্ষে বিপরীত লিঙ্গের কিছু ভাই-বোনকে বৈবাহিক জ্ঞাতি ভাবা হয়। অন্য কথায়, প্যারালাল কাজিনদেরকে ভাই-বোনের দলভুক্ত করা হয় আর ক্রস কাজিনদের ক্ষেত্রে ভিন্ন পদাবলী ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু, পিতার ভাইকে বাবা ডাকা হয় এবং মাতার বোনকে মা ডাকা হয়।
- **ক্র জ্ঞাতিসম্পর্কঃ** ক্র জ্ঞাতিসম্পর্ক ইরোকুইস জ্ঞাতিসম্পর্কের মত, কিন্তু পিতার দিকের জ্ঞাতি থেকে মায়ের দিকের জ্ঞাতিকে আলাদা করা হয়। মায়ের দিকের জ্ঞাতির জন্য বর্ণনামূলক পদাবলী ব্যবহৃত হয় আর পিতার দিকের জ্ঞাতির ক্ষেত্রে শ্রেণীমূলক পদাবলী ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রজন্মগত দূরত্ব করা হয়না। ফলে দেখা যায় পিতার বোন ও বোনের মেয়ের জন্য একই পদাবলী ব্যবহৃত হয়।
- **ওমাহা জ্ঞাতিসম্পর্কঃ** ওমাহা জ্ঞাতিসম্পর্ক ইরোকুইস জ্ঞাতিসম্পর্কের মত কেবল মায়ের দিকের জ্ঞাতির জন্য শ্রেণীমূলক পদাবলী বেশি ব্যবহৃত হয় অপরপক্ষে পিতার দিকের জ্ঞাতির ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক পদাবলী ব্যবহৃত হয়। ওমাহা জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রজন্মগত দূরত্ব করা হয়না। তাই মায়ের ভাই আর ভাইয়ের ছেলেকে একই পদাবলীর মাধ্যমে ডাকা হয়।

যাহোক, মানব সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলীর বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে। যেমন-

ক) সমাজ কাঠামোতে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষায় জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলী বিশেষ ভূমিকা রাখে।

খ) প্রজন্মগত পার্থক্য নিরুপনে জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলীর কার্যক্রম রয়েছে।

গ) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গৌণ জ্ঞাতিসম্পর্কের বেলায় পদাবলীর ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।

ঘ) পদাবলীর মাধ্যমে জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে শ্রেণীকরণ করা সম্ভব।

ঙ) জ্ঞাতিসম্পর্কের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করে কোন সমাজের পদাবলীকে অন্য সমাজের পদাবলীর সাথে তুলনা করা যায়, অথবা এর মাধ্যমে বৈশ্বিক জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উঘগাটন করা যায়।

চ) মানব সমাজের সামাজিক সম্পর্কের সাধারণীকরণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলী বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৬.২.২ জ্ঞাতিসম্পর্কের মাত্রা বা নৈকট্য

সমাজ জীবনে মানুষ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কের নানা মাত্রা আছে। কিছু সম্পর্ক থাকে খুব রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ ও নিবিড় আবার কিছু আছে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও নিবিড়। নিচে চিত্রে সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হল-

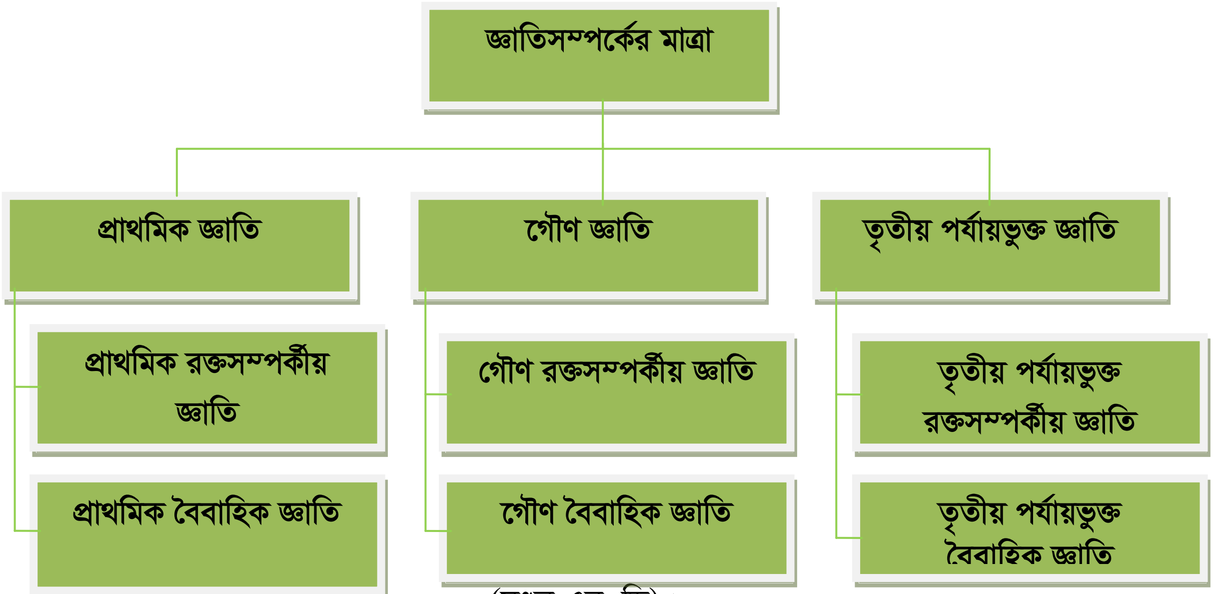

(মণ্ডল এন. ডি)।

৬.২.২.১ প্রাথমিক জ্ঞাতি

প্রাথমিক জ্ঞাতি (**Primary kinship**) বলতে সরাসরি সম্পর্ক বুঝায়। যেসব লোক একে অপরের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তাদেরকে প্রাথমিক জ্ঞাতি বলে। এরা মূলত আট ধরণের প্রাথমিক জ্ঞাতি যেমন স্ত্রী, পিতা, পুত্র, মাতা, কণ্যা, ভাই-বোন ইত্যাদি। প্রাথমিক জ্ঞাতি দুই ধরণের-

১) প্রাথমিক রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি (**Primary Consanguineal Kinship**) ঃ এরা হচ্ছে এমন জ্ঞাতি যারা একে অপরের সাথে জন্মসূত্রে সম্পর্কিত। পিতামাতা ও সন্তান, এবং সহোদর হল প্রাথমিক রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির অন্তর্ভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২) প্রাথমিক বৈবাহিক জ্ঞাতিঃ প্রাথমিক বৈবাহিক জ্ঞাতি (**Primary Affinal Kinship**) বলতে এমন জ্ঞাতিকে নির্দেশ করে যারা বৈবাহিক সূত্রে একে অপরের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। একমাত্র প্রাথমিক বৈবাহিক জ্ঞাতি হল স্বামী-স্ত্রী।

৬.২.২.২ গৌণ জ্ঞাতি

গৌণ জ্ঞাতি (**Secondary Kinship**) হচ্ছে তারা যারা প্রাথমিক জ্ঞাতির প্রাথমিক জ্ঞাতি। অন্যকথায় প্রাথমিক জ্ঞাতির সাথে যারা সরাসরি সম্পর্কিত তারা প্রাথমিক জ্ঞাতির গৌণ জ্ঞাতি। সর্বমোট ৩৩ ধরণের গৌণ জ্ঞাতি আছে। গৌণ জ্ঞাতি দুই ধরণের-

১) গৌণ রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি (**Secondary Consanguineal Kinship**)ঃ প্রাথমিক জ্ঞাতির সাথে যারা রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত তাদেরকে গৌণ রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতি বলে। গৌণ রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির উদাহরণ হল দাদা-দাদি/ নানা-নানীর সাথে নাতি-নাতনির সম্পর্ক।

২) গৌণ বৈবাহিক জ্ঞাতি (**Secondary Affinal Kinship**)ঃ প্রাথমিক বৈবাহিক জ্ঞাতির প্রাথমিক জ্ঞাতি হল গৌণ বৈবাহিক জ্ঞাতি। এই জ্ঞাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে শালা শালী, ভাবী, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর, ননদ ইতাদি। তেমনি মেয়ের জামাই, ছেলের বউ এই জ্ঞাতির অন্তর্ভুক্ত।

৬.২.২.৩ তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত জ্ঞাতি

তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত জ্ঞাতি (**Tertiary kinship**) বলতে প্রাথমিক জ্ঞাতির দুই প্রজন্ম পূর্বের প্রাথমিক জ্ঞাতিকে বুঝায়। যেমন প্রাথমিক জ্ঞাতি হল বাবা, তার প্রাথমিক জ্ঞাতি হল দাদা, তার প্রাথমিক জ্ঞাতি হল বড় দাদা যা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত জ্ঞাতি। প্রায় ১৫১ টি মধ্যবতি জ্ঞাতির সন্ধান পাওয়া যায় বিশ্বে। দুই ধরণের তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত জ্ঞাতি রয়েছে-

১) তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি (**Tertiary consanguineal kinship**)ঃ মধ্যবতি রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি হল একজনের দাদার দাদা। অর্থাৎ ইগোর প্রাথমিক জ্ঞাতি তথা বাবার প্রাথমিক জ্ঞাতি দাদার প্রাথমিক জ্ঞাতি বড় দাদা হল তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি।

Dhaka University Institutional Repository

২) তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত বৈবাহিক জ্ঞাতি **(Tertiary affinal kinship):** তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত বৈবাহিক জ্ঞাতি হল একজনের স্ত্রীর বা স্বামীর প্রাথমিক বৈবাহিক জ্ঞাতি বাবা বা মায়ের প্রাথমিক জ্ঞাতি দাদা বা দাদী। এই ধরণের জ্ঞাতির সংখ্যা অনেক। এক কথায় স্বামীর বা স্ত্রীর দাদা দাদী এর অন্তর্ভুক্ত (প্রাগুক্ত)।

৬.২.৩ বাংলাদেশের সমাজসমূহে জ্ঞাতিসম্পর্কের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সমাজসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাতিসম্পর্কের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-

ক) জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলী পরিবর্তনশীল। সমাজ পরিবর্তনের সাথে জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলী পরিবর্তন হয়। নগরায়ন, বিশ্বায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে জ্ঞাতিসম্পর্ক পদাবলী পরিবর্তন হয়। যেমন বাংলাদেশের সমাজে দেখা যায়- যুব সমাজের মধ্যে প্রথাগত পদাবলীর মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খ) সহোদর দলের মধ্যে সংহতি বিদ্যমান। একজনকে কেন্দ্র করে সহোদররা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে। যেমন একই বাবা মা কেন্দ্রিক ঐক্য ও সংহতি লক্ষ করা যায়।

গ) জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে লিঙ্গ বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের সমাজসমূহে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন লক্ষণীয়।

ঘ) জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে বয়স বিশেষভাবে মূল্যায়িত হয়। যেমন বাংলাদেশে দেখা যায় পিতা প্রাথমিক জ্ঞাতি হলেও পিতার বড় ভাইকে পিতার চেয়ে বেশি সম্মান ও বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

ঞ) জ্ঞাতিসম্পর্কের বেলায় প্রজন্ম বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সাথে বংশলতা জড়িত। প্রজন্মগত সম্পর্ক ও দূরত্ব জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

৬.২.৪ জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরণ

জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজ সংগঠনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধনই সমাজের বিভিন্ন মানুষকে সংগঠিত করে, সৃষ্টি করে মানব সম্পর্কের জটিল জাল। রক্ত ও বৈবাহিক বন্ধন সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও আরো কয়েক ধরণের বন্ধন রয়েছে। তাই জ্ঞাতিসম্পর্ককে তিন ধরণে ভাগ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১. রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন বা জৈবিকঃ জন্মগতভাবে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন বলা হয়। যেমন- একজন ব্যক্তি তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনীর সাথে রক্ত সম্পর্কিত সম্পর্কযুক্ত।

২. বৈবাহিক জ্ঞাতিঃ রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, বরং বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাকে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কিত জ্ঞাতিসম্পর্ক বলা হয়। কোন মহিলা বা পুরুষ তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়ী পক্ষের জ্ঞাতিদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। বস্তুতঃ কোন স্বামীর কাছে স্ত্রী প্রায় ক্ষেত্রেই বৈবাহিক বন্ধনের জ্ঞাতি।

৩. কাল্পনিক বন্ধন ঃ রক্ত কিংবা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নয়, অথচ তাদের সাথে রক্ত ও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আত্মীয়দের মতই আচরণ করা হয় এ রকম কাল্পনিকভাবে যে জ্ঞাতি সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে কাল্পনিক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলা হয়। মূলতঃ জ্ঞাতি পদ দ্বারা সম্বোধিত অনাত্মীয় ব্যক্তিদের সাথে যে সম্পর্ক তাই হলো কাল্পনিক জ্ঞাতিসম্পর্ক।

নৃবিজ্ঞানী মর্গান (১৮৭৮) জ্ঞাতিসম্পর্ককে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

(ক) শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ঃ এ প্রকারের জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক সুনির্দিষ্টভাবে বা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় না। এক্ষেত্রে আত্মীয়তার দূরত্বানুযায়ী আত্মীয়দেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং একটি শ্রেণীর আত্মীয়দেরকে একই শব্দে সম্বোধন করা হয়। এ জন্য এটাকে শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ককে বাবার স্তরে যেমন, চাচা, মামা, খালু, ফুপা এদের স্তরে সবাইকে বাবা ডাকা হয়। আবার মায়ের স্তরে মা, চাচী, মামী, ফুফু এদেরকে মা নামে সম্বোধন করা হয়।

(খ) বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ঃ এ প্রকারের জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়। এ পদ্ধতিতে এক বা একাধিক সম্বোধক শব্দ প্রয়োগ করে সম্বোধন করা হয়। এক্ষেত্রে পিতামাতা, চাচা-চাচী, মামা-মামী, দাদা-দাদী প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা শব্দ প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে এদের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১ঃ শ্রেণীমূলক ও বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক

শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক
সমাজবিকাশের প্রথম পর্যায়ে শ্রেণীমূলক জ্ঞাতি সম্পর্কের প্রচলন বেশি দেখা যায়।	একক বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা থেকে বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক চালু হয়
শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কে কোন ব্যক্তির আপন ভাই ও পিতৃব্য পুত্রদের সবাইকে ভাই, মায়ের বোনের মেয়েকে বোন বলে সম্বোধন করা হয়।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্কে কোন পরিচয় বিনিময়ের সময় স্পষ্টভাবে আত্মীয়তা উল্লেখ করা হয়। যেমন - সে আমার চাচাত ভাই বা মামাত ভাই এর মধ্যে বর্ণনামূলক স্তর আছে।
শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় না।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়।
শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রাক-একক বিবাহ পরিবার পর্যায়ের বেলায় প্রযোজ্য।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রাক একক বিবাহ প্রথার উদ্ভবের সাথে সাথে এর ব্যবহার শুরু হয়।
শ্রেণীমূলক আত্মীয়তা মালায়ন ও তুরানিয়ান সমাজে বেশী লক্ষ্য করা যায়।	মর্গানের মতে, বর্ণনামূলক আত্মীয়তা অর্য, সেমেটিক প্রভৃতি সমাজে বেশী লক্ষ্য করা যায়।
শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং সম্পত্তির যৌথ মালিকানা একই সঙ্গে বর্তমান।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ও ব্যক্তিগত মালিকানা পরবর্তী সময়ে একই সঙ্গে শুরু হয়।
শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের একটি শব্দ একই শ্রেণীর সকল আত্মীয়তাকে বুঝাতে পারে।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের একই শ্রেণীর কতকগুলো শব্দের সমন্বয়ে একজন আত্মীয়কে চিহ্নিত করা যায়।
শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের একটি কাজ একই ধারায় দন্ডায়মান।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক ভিন্ন ধারায় দন্ডায়মান।
শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক সূচক শব্দগুলো সৃষ্টি হয় মনস্তাত্ত্বিক কারণে।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক সূচক শব্দগুলো সামাজিক কারণে সৃষ্টি হয়েছে।
শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রথার ভিত্তি হল দলগত বিষয়।	বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রথার ভিত্তির ওপর কম নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে সমাজ কাঠামোর মূল চাবিকাঠি। নৃবিজ্ঞানে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রবিন ফক্স বলেন - "দর্শন শাস্ত্রের কাছে যুক্তিবিদ্যার যেমন গুরুত্ব এবং শিল্পকলার কাছে অনাবৃত দেহের ছবির যেমন প্রয়োজনীয়তা তেমনি নৃবিজ্ঞানের কাছে জ্ঞাতিসম্পর্কের সেই গুরুত্ব (১৯৭৭)"। জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজ কাঠামোর মূলে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক কাজ করে। আর এই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক। সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও মৌল সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবারকে জানতে হলে জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হবে। বৈবাহিক ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। আদিম সমাজে দেখা যেত, যে এলাকায় বেশী শিকার পাওয়া যায়, বেশী সুবিধা পাওয়া যায় সে এলাকার গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আধুনিক সমাজেরও দেখা যায় আর্থিক ও ক্ষমতার প্রতিপত্তি লাভের জন্য বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। জ্ঞাতিরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পরস্পরকে সাহায্য করে। একই জ্ঞাতির সদস্যরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। সম্পত্তির ভাগ বণ্টনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সম্পর্কের ভূমিকা অনন্য। সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক সমাজে দেখা যায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিককালের জাতীয়তাবোধ বস্তুত তথাকথিত 'আদিম' সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্কবোধেরই সম্প্রসারিত রূপ। আজকের যুগে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জ্ঞাতি নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আধুনিক আমলাতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চাকরির ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। বড় বড় অফিস ও মিল কারখানায় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সদস্যরই বেশী চাকরি পাচ্ছে। সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে জ্ঞাতিরা একত্রিত হয়। মানুষের মৌল চাহিদা পূরণ, শিশুর লালন পালন, সামাজিকীকরণ এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা যেমন- মমতা, ভালবাসা, সাহচর্য ইত্যাদি পূরণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জ্ঞাতিসম্পর্কই মানুষের মধ্যে সহমর্মিতাবোধ ও একাত্মবোধ সৃষ্টি করে, সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। বিয়ে, মৃত্যু, বিপদে-আপদে, জরুরী অবস্থায় জ্ঞাতিরাই প্রথমে এগিয়ে আসে। আদিম সমাজে জ্ঞাতিদের সাহায্য সহযোগিতাই সমাজকল্যাণের জন্ম দিয়েছে।

জ্ঞাতিত্বের সামাজিক কাঠামো সৃষ্টি ও সংরক্ষণে ঘর বা খানার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঘর বলতে আক্ষরিক অর্থেই একটি আবাসিক একক বোঝায় যেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের যেকোনো ধরনের সকল সদস্য অবস্থান করে। প্রতিটি একক ঘরকে বলা হয় চুলা বা খানা যার অর্থ হচ্ছে একই সঙ্গে আহার গ্রহণকারী একক। ঘরের সদস্যপদ প্রধানত পিতৃবাসের ওপর ভিত্তি করে নিরূপিত হয়। এটি উৎপাদন ও খরচের প্রাথমিক একক। ঘর হচ্ছে একটি আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্র। রক্তের সম্পর্কের সদস্য, তাদের বিবাহিত সঙ্গী এবং এক থেকে তিন প্রজন্মের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির সমন্বয়ে ঘর গঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া, কখনও কখনও অন্যান্য আত্মীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৬.৩ বাংলাদেশের সমাজসমূহে জ্ঞাতিসম্পর্ক

বাংলাদেশের সমাজে একটি বাড়িকে ঘিরে জ্ঞাতিত্ব গড়ে ওঠে। বাড়ি বলতে সাধারণভাবে একই আঙ্গিনায় একগুচ্ছ ঘরকে বোঝায়। বাড়ির অভ্যন্তরে, ঘরের প্রধানগণ হয় রক্তীয় অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত। কিছু কিছু ঘরের প্রধানগণ উল্লিখিত দুই সম্পর্কের কোনোটার দ্বারাই সম্পর্কযুক্ত নয়। অবশ্য এরকম ঘটনা খুবই বিরল। প্রতিটি পরিবারের একজন কার্যকরী প্রধান থাকে। কিন্তু সাধারণত বাড়ির কোনো স্বীকৃত প্রধান থাকে না। বাড়ির সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করে থাকে, বিশেষ করে কোনো সংকটময় মুহূর্ত উপস্থিত হলে এমনটি দেখা যায়। বাড়ির বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলাকে বিশেষ সম্মান দেখানো হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। বাড়ির অভ্যন্তরে প্রতিটি ঘরের সদস্যদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকলেও বাড়ি মূলত একটি সামাজিক বন্ধনযুক্ত একক। একটি বাড়ি সাধারণত তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ জীবিত অথবা মৃত সদস্যের মর্যাদার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

সাধারণত গোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞাতিত্বের সন্ধান মেলে। গোষ্ঠীর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে বিয়ে হয়ে সংসারে আসা স্ত্রীগণ ও বিয়ে হয়ে অন্য সংসারে যাওয়া কন্যাগণ ব্যতীত একগুচ্ছ ঘর বা পরিবার যারা সকলেই সগোত্রীয়। প্রপিতামহের সকল পুরুষ বংশধর এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ বংশ একটি অধিকারবোধ জাগ্রত করে যা গোষ্ঠীর সদস্যদের একই বন্ধনে আবদ্ধ করে। সদস্যরা একজন মৃত বা পূর্বপুরুষের মধ্যে তাদের সাধারণ উৎস খুঁজে থাকে। কোনো গোষ্ঠীর কোনো অবস্থাসম্পন্ন সদস্যের একই গ্রামের বা কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী গ্রামে নতুন বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস অস্বাভাবিক নয়। ফলে, একই গোষ্ঠীর সদস্যরা একই বাড়ির আঙ্গিনায় বসবাস করতেও পারে, নাও পারে। গোষ্ঠীর সদস্যগণ যারা একক সাধারণ পুরুষের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষের সন্ধান করে তারা একত্রে বাস করুক বা না করুক, তারা একই কুলের বা বংশের অন্তর্ভুক্ত। তবে হিন্দুদের মধ্যে কুল সম্পর্কে সচেতনতা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশি। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে গোষ্ঠীসচেতনতা অনেক বেশি শক্তিশালী। যদিও কুল ও গোষ্ঠী উভয়ই সমার্থক শব্দ, মুসলমানগণ তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের পরলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং মৃত ব্যক্তির মঙ্গল কামনায় গরিব দুস্থদের আহার করিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, হিন্দুরা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তুষ্টির জন্য খাবার পরিবেশন ও পূজা করে থাকে। বিয়ের পর একজন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান মহিলা তাঁর স্বামীর গোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভ করে, তবে একইসঙ্গে তাঁর পিতৃগোষ্ঠীর সদস্যপদও বহাল থাকে। একজন মুসলমান মহিলা বিয়ের মাধ্যমে অনেকটা দ্বৈত গোষ্ঠী সদস্যপদ অর্জন করে। সে ও তাঁর সন্তানরা বাপের বাড়ি বেড়ানোর সময় আত্মীয়-গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে উপহার গ্রহণ করলেও, পিতৃগোষ্ঠীতে তাঁর উত্তরাধিকার ও সেখানে আশ্রয়ের অধিকার বহাল থাকে। বিয়ের পর একজন হিন্দু মহিলার তাঁর পিতার পরিবারে আর কোনো সদস্যপদ থাকে না। স্বামীর গৃহে আসার পর সে স্বামীর গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে যায়।

বাংলাদেশে জ্ঞাতিত্ব বলতে সাধারণত আত্মীয়-স্বজনকে বোঝানো হয়। এ জটিল শব্দটির সংজ্ঞা দিতে গেলে আত্মীয় ও স্বজন শব্দ দুটিকে আলাদাভাবে এবং একটি জটিল বিন্যাসে বিবেচনা করতে হবে। একটি গোষ্ঠীতে সকল সদস্যের সাধারণ পূর্বপুরুষ থাকে। বংশ তালিকায় এটা দৃষ্টিগোচর হয়। এসব লোকদের বলা হয় নিজের লোক (স্বজন)। আত্মীয় হওয়ার জন্য এ ধরনের সাধারণ পূর্বপুরুষের প্রয়োজনীয়তা নেই। আত্মীয় শব্দটি এসেছে আত্মবাচক শব্দ থেকে। আত্মীয় সদস্যপদে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে, আবার এ সদস্যপদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারে। বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের আত্মীয় সদস্যরূপে দাবি করে থাকে। মায়ের রক্তের সম্পর্কিত লোকজন (যেমন মায়ের ভাই) এবং পুরুষের রক্তের সম্পর্কিত বিবাহিত মহিলাদেরকেও আত্মীয়-স্বজনরূপে গণ্য করা হয়।

পিতৃগোষ্ঠীর মাধ্যমে রক্ত সম্পর্কিত বাড়ির সকল সদস্যদের মধ্যে গভীর নৈকট্যবোধ থাকে; তারা মনে করে যে, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক বাড়িতে বধূ হিসেবে আনা গৃহিণীদের সঙ্গে সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি গাঢ় ও নির্ভরশীল। এ কারণে, নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে যখন কোনো মহিলার বিবাহ হয়, তখন সে তাঁর পিতৃপরিবারে ভাই-বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ভাইরাও তাদের বোনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং সুযোগ-সুবিধামতো উপঢৌকন দিয়ে ও বাড়িতে দাওয়াতের মাধ্যমে ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে। যখন কোনো ভাই বিবাহিত বোনের বাড়ি বেড়াতে যায় তখন বোন তাঁর বিশেষ যত্ন নেয় এবং উত্তম আহারাদি পরিবেশন করে। গ্রামের সকল মহিলাই বিয়ের পরে স্বামীর পিতার গৃহে গমন করে এবং সারাজীবন সেখানে কাটায়। কিন্তু একজন মহিলার সবসময়ই তাঁর বাপের বাড়ির জন্য বিশেষ অনুভূতি থাকে। বাপের বাড়ি বেড়ানোর জন্য সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যখনই সম্ভব হয় একজন পিতা তাঁর বিবাহিত কন্যাকে *নাইওর* আনার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারে শিশুরা তাদের পিতামাতা ও ভাইবোন দ্বারা লালিত-পালিত হয়ে থাকে। সাধারণ পরিস্থিতিতে, ঘরের বন্ধন খুবই ঘনিষ্ঠ। একজন পুরুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাঁর নিজের ঘর বা পরিবার দেখাশোনা করা। এরপর সে গোষ্ঠী বা স্বজনের দিকে নজর দিতে পারে। এ ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্য প্রথমে নিকট আত্মীয় ও আত্মীয়-স্বজন, এরপর সমাজ এবং পাড়া-পড়শির মধ্যে বিস্তৃত হতে পারে। আত্মীয় ও আত্মীয়-স্বজনের বিস্তারলাভ ঘটে থাকে সমাজ বরাবর এলোপাতাড়িভাবে। কারণ এ ধরনের সম্পর্ক সাধারণত তৈরি হয় বিয়ের মাধ্যমে। কখনও কখনও গোষ্ঠী বিস্তার ঘরের সীমানা এবং প্রায়শই গ্রাম ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশে ঘরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক একক হিসেবে গণ্য করা হয়। এর কিছুটা হয়ে থাকে বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন, যেমন গোষ্ঠী-আত্মীয়। তারা বৈবাহিক সম্পর্ক বাছাই, মোহরানা ও কনের পণ নির্ধারণ, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি গৃহস্থালি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। এ নিয়ন্ত্রণ অধিকার আসে রক্তীয়, বৈবাহিক বা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। এ ধরনের বিষয়ে গোষ্ঠী সদস্যদের প্রভাব আত্মীয়-স্বজনভুক্ত সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি। এ তিন দলের ক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সাধারণত গৃহে পুরুষের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব মহিলার চেয়ে বেশি। অবশ্য কনিষ্ঠ পুরুষ সদস্যের ওপর বয়স্ক মহিলাদের প্রভাব থাকতে পারে। বিয়ের পূর্বপর্যন্ত একজন মহিলাকে তার পিতামাতার কর্তৃত্বে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আবার বিয়ের পর স্বামীর, বিশেষ করে কয়েকজন ছেলেমেয়ে না হওয়া পর্যন্ত শাশুড়ির কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে। বিধবা অবস্থায় সে সাধারণত তার অবিবাহিত উপযুক্ত পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকতে পছন্দ করে। যথাসময়ে পুত্র যদি বিয়ে করে, সে তার সঙ্গেই বসবাস করতে থাকে। তবে সকল পুত্রই আর্থিকভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে। পুরুষ কর্তৃক সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ এবং শিশু যত্নের শ্রম থেকে মুক্ত থাকার ফলে পুরুষ বিশেষত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকায় যেমন, মাঠের কাজ করা, মাছ ধরা, বাজারে বেচা-কেনা এবং সমাজের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করতে পারে। জ্ঞাতিত্বের বন্ধন লোকজনের মধ্যে আনুগত্যের সৃষ্টি করে। একটি সাধারণ ভাষায় কথা বলা ও খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস গৃহের সদস্যদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক সহজ করে তোলে। তারা একে অন্যকে ভালভাবে বুঝতে পারে। তারা অনুভব করে যে প্রয়োজনের সময় তারা একে অন্যের প্রতি আস্থার সাথে নির্ভর করতে পারে। প্রতিটি মুসলমান ও হিন্দু গৃহ এক একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি হিন্দু পরিবার আবার একটি বর্ণভুক্ত। মুসলমানদের বেলায় এটি প্রযোজ্য নয়। একজন বাঙালি চাষি তার গ্রামের সঙ্গে এবং অন্যরাও তার পরিবার, গোষ্ঠী ও দ্বিপাক্ষিকভাবে সম্প্রসারিত আত্মীয়ের সঙ্গে কিছু কর্মকান্ডে জড়িত থাকে। এদের সকলেই তার গ্রামের বাসিন্দা হতেও পারে, নাও পারে। মুসলমান হলে তার মসজিদের সঙ্গে কিছু কিছু কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট থাকে। গ্রামের সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে বর্ণ, সমাজ ও জ্ঞাতিত্ব। এগুলি গ্রামকে বিভিন্ন সামাজিক দলে বিভক্ত করে। মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আত্মীয় সদস্যদের বিশেষ অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আত্মীয়দলের সদস্যরা বিদ্যমান সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে। মুসলমানরা প্রায়শ নবজাতকের নামকরণ উৎসবে আকিকা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

আকিকা পালনে ছেলেশিশুর জন্য দুইটি ও মেয়েশিশুর জন্য একটি ছাগল উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গ করা পশুর মাংস তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এর এক ভাগ নবজন্ম শিশুর পরিবার, এক ভাগ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবং তৃতীয় ভাগ গরিবদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। জিয়াফত বা মেজবানি অর্থাৎ কোনো উৎসব উপলক্ষে রক্ত ও বিবাহসূত্রে সকল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। হিন্দু ধর্মীয় পঞ্জিকায় পালনের জন্য বিভিন্ন দিবস রয়েছে। তাদের সবচেয়ে প্রত্যাশিত উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত মেলা। এ সময় মহিলারা পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে স্থানীয় মন্দিরে দেবতা জগন্নাথের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও অর্থ নিবেদন করে থাকে। বাড়ির মহিলা ও শিশুরা ধর্মীয় চেতনার উৎকর্ষ ঘটানো ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে একত্রে গ্রামের বাইরে যাবার যে সকল সুযোগ পায় এ মেলা তার অন্যতম। মেলায় এক বাড়ির সদস্যরা অন্য বাড়ির, বিশেষ করে বৈবাহিকসূত্রে সম্পর্কিত আত্মীয় সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়। বাড়ির বা গৃহের বাইরে আরও কয়েকটি বড় ধরনের ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের উৎসব একটি গ্রামের একই বর্ণের প্রায় সকলের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। বেশির ভাগ গ্রামেই বর্ণভিত্তিক দল বৈবাহিক জোটের মাধ্যমে একটি আত্মীয়দলে রূপান্তরিত হয়। এভাবে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, গঙ্গা পূজা, সরস্বতী পূজা, শীতলা পূজা এবং মনসা পূজার মতো বড় বড় ধর্মীয় উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে বর্ধিত আত্মীয়দল একটি সার্বজনীন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে একসঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজার সময় পূর্বপূরুষের স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়। প্রতিটি পরিবার তার মৃত পূর্বপুরুষের জন্য বলিদান করে থাকে। ব্রাহ্মণকে কিছু দান করলে তা পূর্বপুরুষগণ পায় বলে বিশ্বাস করা হয়। সুতরাং মৃত আত্মীয়স্বজন যে সমস্ত উপাদান পছন্দ করত সেগুলিই পুরোহিতকে দান করা হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহের সময় রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ জানানোর রীতি প্রচলিত আছে। পুত্র বা কন্যার বিয়ের সময় পিতা তার নিজের বংশের লোকজনদের ছাড়াও শ্বশুর, মামা, মামাশ্বশুর, জামাই ও সন্তানদের শ্বশুরকুলের লোকজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। কোনো বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর যদি রক্তসম্পর্কীয় কোনো আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ আসে তাহলে সেই বিয়ে কয়েক দিনের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকটি অনুষ্ঠান নির্ধারিত কিছু আত্মীয়-স্বজনকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান জামাইষষ্ঠীর সময় সকল জামাইকে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাতে হয়। সাধারণত মেয়ের স্বামীকে এ ধরনের নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে ধনাঢ্য পরিবারগুলি ভাইয়ের মেয়ের স্বামীকেও নিমন্ত্রণ করে থাকে। এ সময় জামাই ও শাশুড়ি পরস্পরকে নতুন কাপড় উপহার দিয়ে থাকে। শাশুড়ি জামাইয়ের দীর্ঘায়ু প্রত্যাশায় আশীর্বাদ করে। এ ধরনের আরেকটি উপলক্ষ আছে যার নাম শীতল-ষষ্ঠী। এ সময় মা তার ছেলের দীর্ঘায়ু কামনায়

Dhaka University Institutional Repository

আশীর্বাদ করে থাকে। অন্য আরেকটি অনুষ্ঠান ভ্রাতৃ বা রাখিবন্ধন-এর মাধ্যমে ভাই এবং বোন পরস্পরের দীর্ঘজীবন কামনা করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আচার-অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মৃতের পুত্র, পিতৃপক্ষের রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তি বা অন্য আত্মীয় মৃতদের শ্মশানে নিয়ে যাবে। যারা মৃতের মুখে আগুন (মুখাগ্নি) দিতে পারবে তারা হচ্ছে পুরুষের ক্ষেত্রে জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র, অথবা স্ত্রী, অথবা কন্যা, অথবা ছোট ভাই, অথবা পিতা, বা চাচা, দাদা, মামা, নানা এবং অন্যান্যরা। নারীর ক্ষেত্রে পুত্র বা কন্যা বা সতীনের ছেলে বা স্বামী, পুত্রবধূ,ভাই এবং অন্যান্যরা। মৃত্যুর পর অশুচিকাল পালন করতে হয়। এটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, যেমন মৃতব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আত্মীয়তার ধরন, তাদের পেশা, বর্ণ ইত্যাদি ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। অশুচিকাল শেষে সব ধরনের বিধিনিষেধ উঠে যায় এবং পুত্ররা মাথা ন্যাড়া করে পুরোহিতের সহায়তায় একটি অনুষ্ঠান পালন করে যার নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের দিন পুত্ররা রক্তসম্পর্কীয় সকল আত্মীয়কে মৃতের আত্মার শান্তির জন্য তাদের সঙ্গেৎান ও আহারের নিমন্ত্রণ করে। মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য ভোজের আয়োজন করে থাকে। মৃত্যু পরবর্তী ভোজ আয়োজনের জন্য প্রয়োজন হলে মৃতব্যক্তির সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় করা হয়। মুসলমান বা হিন্দু উভয়ের মধ্যেই এ প্রথা চালু রয়েছে। আত্মীয়-স্বজন সমন্বয়ে বেশির ভাগ ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই ভোজন ও উপহার প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক পরিবার প্রতিটি ধর্মীয় উপলক্ষ যথাযথভাবে পালনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে ঈদ বা পূজার ছুটির সময় গ্রামের বাইরে বা দূরদেশে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আনন্দোৎসবে যোগদানের জন্য সচেষ্ট থাকে। এভাবে তারা নিয়মমাফিক জীবনযাত্রার বাইরে এসে আনন্দ উপভোগ ও আত্মীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক আচরণ প্রকাশের সুযোগ পায়। বাংলাদেশি আত্মীয়তা একটি ব্যাপক বর্ণনার বিষয়। শব্দটির অর্থ বহুমুখী এবং এর পরিসর অনাত্মীয় সামাজিক সদস্য পর্যন্ত বিস্তৃত। এ কারণে অনেক দূরের সম্পর্কের লোকদেরও আত্মীয়রূপে শ্রেণিকরণের একটি অবিরাম প্রবণতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের সমাজে প্রায় দুশতরেও অধিক বেশি আত্মীয় সম্পর্কের পদাবলী রয়েছে। সামান্য পার্থক্যবিশিষ্ট এসব সম্পর্কের বিশ্লেষণ অত্যন্ত কঠিন। তবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের রীতি বা শ্রেণিবিভাগ অনুসরণ তেমন কঠিন নয় (আজিজ ২০১৪)। এতে প্রতিয়মান হয় যে, জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজকাঠামো বিশ্লেষণে তথা পরিবার, বিবাহ এবং সমাজগঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন তেমনি নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডে এর রয়েছে বিশেষ অবদান। বর্তমান অধ্যয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে যা ক্ষেত্রানুসন্ধানের সহায়তায় উদঘাটন করা হয়েছে। তা নিচে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্ক

৬.৪.১ চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্ক

চাকমা সমাজে পরিবার হল জ্ঞাতিসম্পর্কের মৌলিক উপাদান। পরিবার এবং বাড়ি মিলে জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষুদ্র উপাদান গঠন করে। অনেকগুলো বাড়ি একসাথে হয়ে জ্ঞাতিসম্পর্কের আরো বৃহৎ উপাদান গঠন করে। এই উপাদানের সদস্যরা একটা দলের মত হয়ে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। এর চেয়ে বড় জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রথমত উপাদান হল অর্থনৈতিক দল যারা একসাথে চাষ, শিকার ও সংগ্রহের কাজ করে। এই দলের একজন কারবারি থাকেন। চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের দ্বিতীয় উপাদান হল গ্রাম যেখানে সবাই যুথবদ্ধভাবে বসবাস করে। ঐতিহ্যগতভাবে চাকমা বংশলতা হচ্ছে পিতৃসূত্রীয়[১] যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাতৃসূত্রীয়[২] জ্ঞাতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সমাজে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির প্রতি অবস্থা প্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

সারণী ৬.২ঃ চাকমা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্বারোপ

পিতা অথবা মায়ের জ্ঞাতির প্রতি বিশেষ গুরুত্বদান		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১০	৩৩.৩
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৯	৩০.০
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১১	৩৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

চাকমা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি যেমন পিতা ও মাতার দিকের জ্ঞাতির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কিছু পরিবারের সাথে পিতার দিকের জ্ঞাতির ভাল সম্পর্ক আছে। আবার কিছু পরিবারের সাথে মাতার দিকের পরিবারের ভাল সম্পর্ক আছে। সাধারণত দেখা যায় পরিবার যদি পিতৃতান্ত্রিক হয় তবে পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির প্রতি

[১] পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি বলতে বাবার দিকের জ্ঞাতিজনদের বুঝানো হচ্ছে।
[২] মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি বলতে মাতার দিকের জ্ঞাতিজনদের বুঝানো হচ্ছে। বিবাহ বন্ধনের ফলে মায়ের দিকের জ্ঞাতিজনরা বোনের পরিবারে কিছু ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। আর পরিবার যদি মাত্রিতান্ত্রিক হয় তবে মায়ের দিকের জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্বারোপ করে। কোন দম্পতি যদি স্বীয় মায়ের বা পিতার বাসস্থানে বাস করে তবে তাদের সন্তানরা তাদের মায়ের জ্ঞাতিদের সাথে খুব ঘনিষ্ট থাকে পিতার জ্ঞাতিদের তুলনায়। তবে বাংলাদেশের মূলধারার সমাজের ন্যায় চাকমা সমাজ যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক তাই দেখা যায় পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতিজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে চাকমা সমাজ। সারণী ৬.২ এ দেখা যায় ৩৩.৩ শতাংশ পরিবারে পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতিজনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আবার সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবারে পিতা মাতা উভয়ের দিকের জ্ঞাতিজনের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করে।

সারণী ৬.৩ঃ চাকমা সম্প্রদায়কে বিপদাপদে সহায়তা প্রদানকারী

বিপদাপদে সহায়তা		
সহায়তাকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজস্ব সম্প্রদায়	২৯	৯৬.৭
বাঙ্গালী	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

চাকমা সম্প্রদায় বিপদাপদে সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়ে থাকে তাদের নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের মাধ্যমে। এর অন্যতম কারণ হল এরা এক স্থানে যুথবদ্ধভাবে বসবাস করে। ফলে সারণী ৬.৩ এ দেখা যায় গোষ্ঠীর কেউ বিপদে পড়লে অন্যরা তাকে সাহায্য করে। সামাজিক জীবনে চাকমাদের গোষ্ঠীগত সম্পর্ক খুবই কার্যকর। বিপদাপদে সাহায্যের বেলায় জ্ঞাতিসম্পর্ক এ সমাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ৩.৩ শতাংশ চাকমা মনে করে বিপদাপদে বাঙ্গালিরা তাদের সাহায্য করে। বাঙ্গালীদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে একে অপরের সাথে সামাজিক বন্ধন থেকে বিপদাপদে চাকমারা বাঙ্গালীদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে থাকে কখনো কখনো।

সারণী ৬.৪ঃ সামাজিক সুসম্পর্ক

কোন ধরণের জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক বেশি		
জ্ঞাতি	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১৪	৪৬.৭
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৭	২৩.৩
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৯	৩০.০
মোট	৩০	১০০.০

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা সমাজে সামাজিক বা পারিবারিক সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। যেমন যোগাযোগ, দূরত্ব, এবং লেনদেন। দেখা যায় ঐতিহ্যগতভাবে পিতৃতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজ গঠিত হয় বলে পিতার দিকের জ্ঞাতিজনের সাথেই সবাই বসবাস করে। ফলে সাধারণত পিতার দিকের জ্ঞাতিজনের সাথে সুসম্পর্ক বেশি। আবার কিছু ক্ষেত্রে পিতার দিকের জ্ঞাতিজনের সাথে সীমিত সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকায় অনেক সময় সুসম্পর্ক নষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মাতার দিকের জ্ঞাতিজনের সাথে সুসম্পর্ক থাকে। অনেক পরিবার আছে যেখানে উভর দিকের জ্ঞাতিজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা হয় (সারণী ৬.৪)।

সারণী ৬.৫ঃ চাকমা সমাজে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা

পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা			মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা	
মাত্রা	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
দৈনিক	২৪	৮০.০	১৪	৪৬.৭
সাপ্তাহিক	৪	১৩.৩	৮	২৬.৭
মাসিক	২	৬.৭	৭	২৩.৩
ষাণ্মাসিক	০	০	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার কারণে পিতৃজাত জ্ঞাতির সাথে একসাথে বসবাস করার রীতি প্রচলিত। এ সমাজে দেখা যায় পিতার জ্ঞাতির সাথে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে যোগাযোগ বেশি হয়ে থাকে। সারণী ৬.৫ এ দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক চাকমা পরিবারের পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির সাথে দৈনিক যোগাযোগ হয়। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিবারের পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে সপ্তাহ অন্তর কমপক্ষে একবার যোগাযোগ হয়। কিছু পরিবারের পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে মাসে যোগাযোগ হয়। এই পরিবারসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতৃসূত্রীয় বাসস্থানের পরিবর্তে নয়া বাসস্থান অথবা মাতৃসূত্রীয় বাসস্থানে বসবাস করে বিধায় পিতৃজাত জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ কম হয়। পিতার ভাই, পিতার বাবা-মা ও বংশ পরাক্রমায় অন্যান্য পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি পিতৃতান্ত্রিক বাসস্থান প্রথা চর্চা করায় চাকমা সমাজে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে বেশি যোগাযোগ হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশের অন্যান্য সমাজসমূহের বেলায়ও একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা সমাজে পিতার সূত্রীয় জ্ঞাতির পাশাপাশি মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। দেখা যায় ৪৬.৭ শতাংশ চাকমা পরিবারের সাথে তাদের মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির দৈনিক যোগাযোগ হয়। ২৬.৭ শতাংশ চাকমা পরিবারের সাথে মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির যোগাযোগ হয় সপ্তাহে। মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থান করার কারণে যোগাযোগ মাত্রা কম। তবে এর অর্থ এই নয় যে মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে বন্ধন কম। বরং যোগাযোগ কম হলেও বন্ধন পূর্বের মত আছে বলে মনে করে চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা। চাকমা সমাজে বিবাহের পরে মেয়ে বরের বাড়িতে যাওয়ার রীতি রয়েছে। তাই সারণী ৬.৬ এ দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবাহিত বোনের সাথে দৈনিক যোগাযোগ হয়। দৈনিক যোগাযোগ এটা নির্দেশ করে যে বিবাহিত বোনের সাথে খুব আন্তরিকতার সম্পর্ক রক্ষা করা হয়। যোগাযোগের মাত্রা কম হয় যদি বোনের বিবাহ একই পাড়া বা এলাকার মধ্যে হয় যেখানে যোগাযোগের চেয়ে দেখা সাক্ষাৎ বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক।

সারণী ৬.৬ঃ বিবাহিত বোন ও মেয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা

বিবাহিত বোনের সাথে যোগাযোগের মাত্রা			বিবাহিত মেয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা	
মাত্রা	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
দৈনিক	২৬	৮৬.৭	১০	৩৩.৩
সাপ্তাহিক	৪	১৩.৩	১	৩.৩
মাসিক	০	০	১	৩.৩
প্রযোজ্য নয়	০	০	১৮	৬০.০
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের পর মেয়ে স্বামীর সংসারে চলে যায় বিধায় বিবাহিত মেয়ের সাথে যোগাযোগ মাত্রা অনুসন্ধান করা হয় কার্যত আন্তরিকতার মাত্রা উপলব্ধি করার জন্য। দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে যাদের বিবাহিত মেয়ে আছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৩.৩ শতাংশের বিবাহিত মেয়ের সাথে দৈনিক যোগাযোগ হয়। বর্তমানে যোগাযোগ হয় মোবাইলের মাধ্যমে। হয় মেয়ে নিজে বা বাবার পক্ষ বিবাহিত মেয়ের সাথে যোগাযোগ করে। মূলধারার বাঙ্গালী সমাজের মত কিছু দিন অন্তর বিবাহিত মেয়েকে বাবার বাড়িতে আনার রীতি প্রচলিত আছে চাকমা সমাজে। এতে দেখা যায় বিবাহিত মেয়ের সাথে তার স্বামী শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন প্রথা, রীতি নীতির পরিবর্তন যেমন ঘটেছে তেমনি ঐতিহ্যবাহী যোগাযোগ মাধ্যমের পরিবর্তে নতুন তথ্য প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগের ধরণে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। এর পাশাপাশি দেখা যায় মোবাইল সহজলভ্য হওয়ায় আগে যোগাযোগ মাত্রা ছিল কম ফলে জ্ঞাতিদের বাড়ি পরিভ্রমণ করা হত বেশি। সারণী ৬.৭ এ অতীত ও বর্তমান সময়ের ব্যবধানে জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ ও পরিভ্রমণের এক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় বর্তমানের সাথে অতীতের সম্পুর্ণ বিপরীত ধর্মী চিত্র পাওয়া যায়। যেমন বর্তমানে যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক চাকমা জ্ঞাতির সাথে পরিভ্রমণের পরিবর্তে যোগাযোগ করে সেখানে অতীতে যোগাযোগের পরিবর্তে পরিভ্রমণ করত। তবে পরিভ্রমণের চেয়ে যোগাযোগের হার বৃদ্ধি পেলেও চাকমা জনগোষ্ঠী এটাকে আন্তরিকতার ঘাটতি বলতে নারাজ। সমাজ পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির দিকে ধাবিত হওয়াটাকে স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাত্রার অপরিহার্য অংশ দেখছে স্থানীয় জনগোষ্ঠী।

সারণী ৬.৭ঃ চাকমা সমাজে বর্তমান ও অতীতে আত্মীয়দের সাথে দেখাসাক্ষাৎ নাকি যোগাযোগ বেশি ছিল

বর্তমানে আত্মীয়কে পরিভ্রমণ নাকি যোগাযোগ করা হয় বেশি?			অতীতে আত্মীয়কে পরিভ্রমণ নাকি যোগাযোগ করা হয় বেশি?	
ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
যোগাযোগ	২৯	৯৬.৭	১	৩.৩
পরিভ্রমণ	১	৩.৩	২৯	৯৬.৭
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সময়ের সাথে যোগাযোগ মাধ্যমে আমুল পরিবর্তন এসেছে। পূর্বের ডাক টেলিগ্রাম, দুরালাপনী থেকে মানব সভ্যতা পৌছে গেছে আধুনিক পঞ্চম প্রজন্মের অতিদ্রুত গতির ইন্টারনেটের যুগে। সভ্যতার এই পরিবর্তনের ধাক্কায় ঐতিহ্যবাহী নৃগোষ্ঠীসমূহ নিজেদের কিছু ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে অথবা আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় জীবন মান উন্নত করেছে। সারণী ৬.৮ তে দেখা যায় চাকমা সমাজে বর্তমানে যোগাযোগের জন্য ডাকের ব্যবহার নেই। এই স্থান দখল করে নিয়েছে আধুনিক মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা। অন্যদিকে অতীতে দেখা যায় ডাক ব্যবস্থা ছিল যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৮ঃ চাকমা সমাজে যোগাযোগ মাধ্যম

বর্তমান যোগাযোগ মাধ্যম			অতীত যোগাযোগ মাধ্যম	
মাধ্যম	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
মোবাইল	৩০	১০০.০	-	-
ডাক	-	-	২৮	৯৩.৩
অন্যান্য	-	-	২	৬.৬
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

কালের পরিক্রমায় চাকমা সমাজে জ্ঞাতিকে পরিভ্রমণের হার হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া হত অনেক বেশি যা বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে যাওয়া আর মোবাইলে যোগাযোগ করার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে।

সারণী ৬.৯ঃ চাকমা সমাজে পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ

পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ		
কারণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
পরিভ্রমনে অসুবিধা	২৬	৮৬.৭
ব্যস্ততা	৩	১০.০
অন্যান্য	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

আত্মীয়দের বাড়িতে গেলে কিছু সময় আত্মীয়ের সান্নিধে কাটানো যেত। একে অপরের সাথে খাওয়া-দাওয়া করার স্থলে সুখ-দুখের গল্প ভাগাভাগি করা যেত আন্তরিকতাপূর্ণ আবেশে। এতে করে বন্ধন আরো বৃদ্ধি পেত। কিন্তু মোবাইল যোগাযোগের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করা গেলেও আত্মীয়কে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়না। ফলে জ্ঞাতির মধ্যে যে আবেগ, মমতা, ভালবাসা পরিলক্ষিত হতো তা ক্রমান্বয়ে শিথিল হচ্ছে। বৃহত্তর সমাজে যে ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে চাকমা সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। যাহোক সারণী ৬.৯ এ দেখা যায় পরিভ্রমণ হ্রাসের অন্যতম কারণ হল অসুবিধা। আজকাল অনেকে আত্মীয়কে পরিভ্রমণ করা অসুবিধা হিসাবে মনে করছে। আবার কেউ কেউ মনে করে পূর্বের তুলনায় ব্যস্ততা বেড়েছে ফলে পরিভ্রমণের হার কমে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১০ঃ চাকমা সমাজে মোবাইল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ

মোবাইলে যোগাযোগ বেশি হওয়ার কারণ		
কারণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
মোবাইলে যোগাযোগ সহজ	১০	৩৩.৩
যাতায়াতে অসুবিধা	১	৩.৩
পরিভ্রমণ ও মোবাইল যোগাযোগের একই অর্থ	৯	৩০.০
পরিভ্রমণের চেয়ে মোবাইল যোগাযোগ সাশ্রয়ী	১০	৩৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সাম্প্রতিককালে পরিভ্রমণের চেয়ে মোবাইল যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে চাকমা সমাজের আত্মীয়দের মধ্যে। অনেকে এটাকে আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি হুমকি মনে করে। বর্তমান গবেষণায় পরিভ্রমণ হ্রাসের কারণ জানার পাশাপাশি মোবাইল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ জানার চেষ্টা করা হয়। সারণী ৬.১০ তে দেখা যায় ৩৩.৩ শতাংশ চাকমা মনে করে মোবাইলে যোগাযোগ সহজ পরিভ্রমণের তুলনায়। একই সংখ্যক চাকমা মনে করে পরিভ্রমণের চেয়ে মোবাইল যোগাযোগ সাশ্রয়ী কেননা পরিভ্রমণ করতে গেলে যাতায়াত ও আনুষাঙ্গিক খরচ লাগে দূরের আত্মীয়ের বেলায়। ৩০.০ শতাংশ চাকমা মনে করে আত্মীয়কে পরিভ্রমণ আর মোবাইল যোগাযোগের মধ্যে কার্যত কোন পার্থক্য নেই। পরিভ্রমণ করলে যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হয় তেমনি পরিভ্রমণ না করে মোবাইলে যোগাযোগ করলেও বন্ধন একই থাকে।

সারণী ৬.১১ঃ চাকমাদেরকে বিপদাপদে সহায়তাকারী

জ্ঞাতিজন কর্তৃক বিপদাপদে সহায়তা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১৪	৪৬.৭
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৭	২৩.৩
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৯	৩০.০
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ জীবনে চলতে গেলে নানা ধরণের বিপদাপদের সম্মুখিন হতে হয়। এসব বিপদাপদে আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা দরকার হয়। সারণী ৬.১১ তে দেখা যায় চাকমাদের মধ্যে ৪৬.৭ শতাংশ পিতার দিকের আত্মীয়দের থেকে বিপদাপদে বেশি সহযোগিতা পেয়ে থাকে। ২৩.৩ শতাংশ মায়ের দিকের আত্মীয়দের থেকে বেশি সাহায্য পেয়ে থাকে। এই সাহায্য হতে পারে আর্থিক অথবা পরামর্শদান। কিছু চাকমা মনে করে তারা বিপদাপদে পিতামাতা উভয় দিকের আত্মীয়-স্বজন থেকে সমভাবে সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

সারণী ৬.১২ঃ চাকমা সমাজে পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১১	৩৬.৭
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১০	৩৩.৩
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৯	৩০.০
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা অপরিহার্য। পারিবারিক পরিমণ্ডলে একসাথে বা পাশাপাশি বসবাস করতে গেলে ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্য, যৌথ পরিবারের সদস্যের মধ্যে মনোমালিন্য ইত্যাদি বিষয় চাকমা সমাজে দেখা যায়। যৌথ পরিবারের অভ্যন্তরে বিবাদের কারণে পরিবার ভাঙ্গনও এ সমাজে বেশ লক্ষণীয়। সারণী ৬.১২ তে দেখা যায় পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে ৩৬.৭ শতাংশ ক্ষেত্রে পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের ভূমিকা বেশি। প্রায় কাছাকাছি তথা ৩৩.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক বিবাদ নিরসনে মায়ের দিকের আত্মীয়ের ভূমিকা বেশ জোরালো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১৩ঃ চাকমা সামাজিক বিবাদ নিষ্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

সামাজিক বিবাদ নিষ্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১৩	৪৩.৩
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৮	২৬.৭
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৯	৩০.০
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

একইভাবে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবার তথা সামাজিক বিবাদ নিষ্পত্তিতে চাকমা সমাজে পিতার দিকের আত্মীয়ের ভূমিকা বেশি (সারণী ৬.১৩)। তবে বিবাদ যদি পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে হয় সেক্ষেত্রে মায়ের দিকের আত্মীয় নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিতামাতা উভয় দিকের আত্মীয় সামাজিক বিবাদ নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখে।

সারণী ৬.১৪ঃ চাকমা সমাজে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১২	৪০.০
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৮	২৬.৭
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১০	৩৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক সংকটকালীন মুহুর্তে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য সহযোগিতা দরকার হয়। রাঙ্গামাটি শহর কেন্দ্রিক কাপ্তাই লেক খনন করার ফলে চাকমা সমাজে জীবিকার উৎস সংকুচিত হয়ে গেছে। ঐতিহ্যবাহী চাষাবাদ পদ্ধতি মোটামুটিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চাকমা জনজীবনকে মারাত্বক হুমকির সম্মুখিন করছে। এর ফলে আর্থিক দৈন্যতা কাটিয়ে উঠতে ও বিকল্প জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বনে আত্মীয়-স্বজনদের ভূমিকা অপরিহার্য। সারণী ৬.১৪ তে দেখা যায় ৪০.০ শতাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় পিতার দিকের আত্মীয়রা সহযোগিতা করে। আর ২৬.৭ শতাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক সংকটে মায়ের দিকের আত্মীয়রা সাহায্য করে। অপরদিকে ৩৩.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় মায়ের দিকের আত্মীয়রা সাহায্য করে। আর্থিক সংকটকালীন সময়ে আত্মীয়-স্বজন নিজেদের অবস্থা অনুসারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

সারণী ৬.১৫ঃ চাকমা সমাজ জীবনে যাদের সাথে লেনদেন বেশি হয়

সমাজ জীবনে কাদের সাথে লেনদেন বেশি হয়		
সম্প্রদায়	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজস্ব সম্প্রদায়	২৯	৯৬.৭
অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সমাজ জীবনে চলতে গেলে আদানপ্রদান ও লেনদেন করতে হয়। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ ঐতিহ্যগতভাবে অনেকটা বদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ছিল। আধুনিকায়ন, বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে এদের মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া লাগছে। ফলে বৃহৎ সমাজের সাথে মিথস্ক্রিয়ার হার বেড়ে গেছে। পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজের প্রসার হওয়ার আগে উৎপাদন ছিল নিজস্ব ভোগের উদ্দেশ্যে। উদ্বৃত ফসল সামাজিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগত। বিনিময়ের ধরণে পরিবর্তন হলেও ঐতিহ্যগত বিনিময় ব্যবস্থা একেবারে উঠে যায়নি। যাহোক, সারণী ৬.১৫ তে দেখা যায় চাকমা সমাজে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয় এই সমাজের মধ্যেই। বাণিজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্য যে কারো সাথে লেনদেন হতে পারে। উপহার আত্মীয়তার বন্ধকে দৃঢ় করে। চাকমা সমাজে উপহার বা দেয়া নেয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১৬ঃ চাকমা সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ ও প্রদান

সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ			সমাজ জীবনে উপহার প্রদান	
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১২	৪০.০	১১	৩৬.৭
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৭	২৩.৩	৮	২৬.৭
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১১	৩৬.৭	১১	৩৬.৭
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৬.১৬ তে দেখা যায় ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা পিতার দিকের আত্মীয় থেকে বেশি উপহার পায়। অন্যদিকে ২৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা মায়ের দিকের আত্মীয় থেকে বেশি উপহার পায়। ৩৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন তারা পিতামাতা উভয় দিকের আত্মীয় থেকে উপহার পেয়ে থাকেন। একইভাবে দেখা যায় ৩৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা পিতার দিকের আত্মীয়কে উপহার দেয়। আর ২৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা মায়ের দিকের আত্মীয়কে উপহার দেয়। ৩৬.৭ শতাংশ চাকমা মনে করে উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে পিতামাতার আত্মীয় সমভাবে বিবেচ্য।

যাহোক, চাকমা সমাজে বর্তমানে আত্মীয়তার বন্ধনের স্বরূপ ও অবস্থার উদঘাটন ও নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখা প্রদান করার জন্য বিভিন্ন উপাদানের সাহায্য নেয়া হয়েচে যা উপরে উপস্থাপন করা হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক নিঘূঢ় উপায়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে আত্মীয়তার বন্ধনের অতীত ও বর্তমান অবস্থা। সমাজ পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে চাকমা সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে আত্মীয়তার বন্ধনের উপর। উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে সামষ্টিক সামাজিক বন্ধনের পরিবর্তে বর্তমান বন্ধন পরিবার বা খানা কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। প্রথাগত সমাজ কাঠামোতে জ্ঞাতিত্ব নির্ভর ক্ষমতা চর্চার পরিবর্তে স্থানীয় সরকারের আধিপত্য বেড়েছে। উৎপাদনের সম্প্রদায়গত ধারণার পরিবর্তে ব্যক্তি মালিকানা অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। আধুনিকতা, ভোগবাদ, অভিগমন এবং ধর্মান্তর চাকমা আত্মীয়তার সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪.২ চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী

চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পিতৃসূত্রীয় প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্ক হাওয়ায় জ্ঞাতিসম্পর্কের মত অনেকটা। ভাই-বোন থেকে কাজিন/ চাচাত/ মামাত/ ফুফাত/ খালাত ভাই-বোনদের পার্থক্য করা হয়না। তাদেরকে ভাই-বোনের মত মনে করা হয়, যার কারণে এ সমাজে ক্রস কাজিন ও প্যারালাল কাজিন বিবাহ রীতি প্রচলিত নয়। তবে পুরোপুরি হাওয়ায় জ্ঞাতিসম্পর্কের মত নয়। কারণ চাকমা সমাজে পিতার ভাইকে বাবা ও মাতার ভাইকে মা ডাকা হয়না। যেমন পিতার ভাই ও মাতার ভাইকে ভিন্ন পদাবলীর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়। একইভাবে বাবার বোন ও মাতার বোনকে ভিন্ন নামে ডাকা হয়। অন্যদিকে দাদার পর্যায়ে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়না, যেমন দাদা ও নানাকে ডাকা হয় *আজু* নামে আর দাদী ও নানীকে ডাকা হয় *নানু* নামে। প্রথম অবরোহী প্রজন্মের মধ্যে (first descending generation) পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির মধ্যে পার্থক্য করা হয়না। যেমন, পিতার ভাই বোনের ও মাতার ভাই বোনের ছেলে সন্তানকে *দা* নামে ডাকা হয় আর মেয়ে সন্তানকে *দি* নামে ডাকা হয়। এদিক বিবেচনায় চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে এস্কিমো প্রভাব লক্ষণীয়। তবে চাকমা সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতা চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের বেলায় প্রতিফলিত হয়। নিম্নে চাকমা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

Dhaka University Institutional Repository

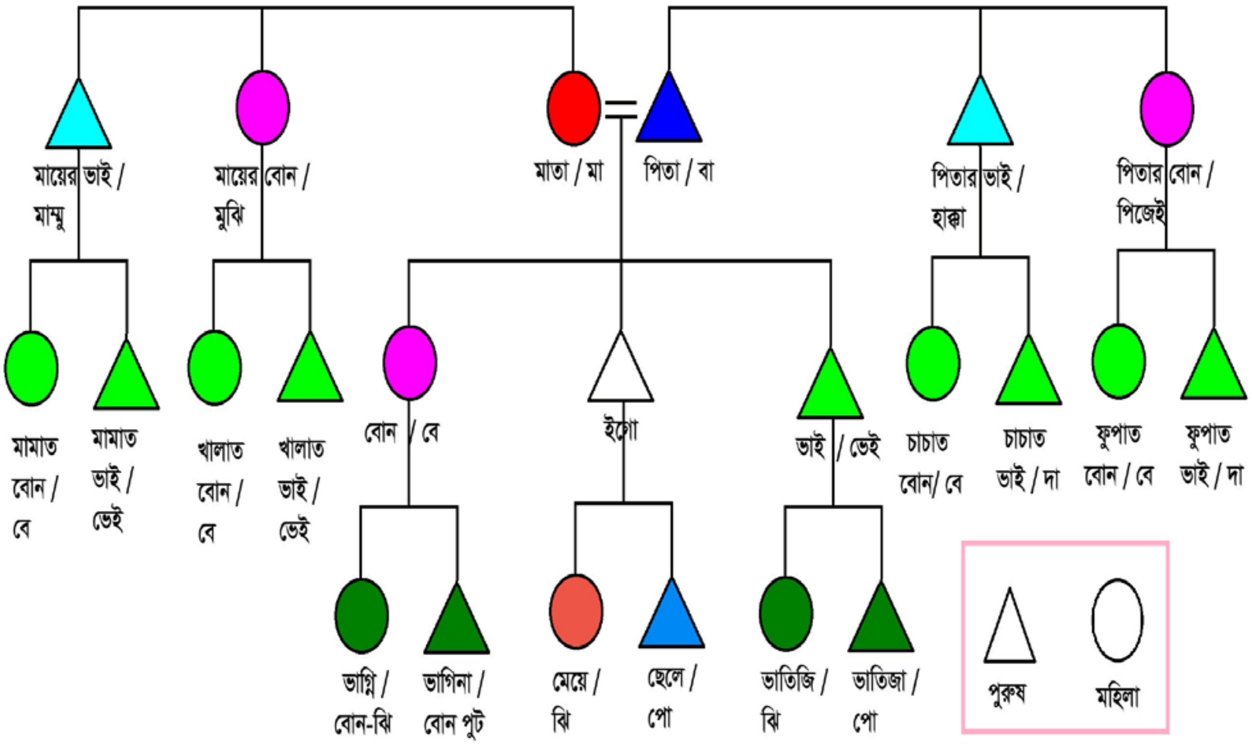

চিত্র ৬.১: চাকমা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

নিচে চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী তুলে ধরা হল-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১৭ঃ চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী

চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী		
জ্ঞাতি	বর্তমান গবেষণা	লেভি-স্ট্রস (১৯৫২)
পিতামহ/দাদার পদাবলী	আজু	আজু
পিতামহী/দাদীর পদাবলী	বেইৎ	নানু
পিতার পদাবলী	বা	বাবা
মাতার পদাবলী	মা	মা
চাচার পদাবলী	হাক্কা	কাকা/ জেটা
চাচীর পদাবলী	হাক্কি	
ফুফুর পদাবলী	পিজেই	পিসি
ফুফার পদাবলী	পিজা	পিসা
স্ত্রীর পদাবলী	মোক	বো
স্ত্রীর ভাই/বোনের পদাবলী	শ্যালা- শ্যালি	শালা/ শালি
ভাইয়ের পদাবলী	ভেই	সিকুন্দা
ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	ভুঝি	ভুঝি
বোনের পদাবলী	বে	বোন
বোনের স্বামীর পদাবলী	বোনোই	বোনোই
চাচাত ভাইয়ের পদাবলী	দা	খুরতুতো ভাই
চাচাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	ভুঝি	ভুঝি
চাচাত বোনের পদাবলী	বে	বে
চাচাত বোনের স্বামীর পদাবলী	বোনোই	বোনোই
ফুফাত ভাইয়ের পদাবলী	দা	পিসতুতো ভাই

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী		
জ্ঞাতি	বর্তমান গবেষণা	লেভি-স্ট্রস (১৯৫২)
ফুফাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	ভুঝি	ভুঝি
ফুফাত বোনের পদাবলী	বে	পিসতুতো বোন
ফুফাত বোনের স্বামীর পদাবলী	বোনোই	বোনোই
ছেলের পদাবলী	পো	পোয়া
মেয়ের পদাবলী	ঝি	মিলা
মাতামহী/নানির পদাবলী	বেই	নানু
মাতামহ/নানার পদাবলী	আজু	নানু
মামার পদাবলী	মাম্মু	মামা
মামীর পদাবলী	মামী	মামী
খালার পদাবলী	মুঝি	মাসি
খালুর পদাবলী	মোইঝো	মুজি
স্বামীর পদাবলী	নেক	নেক
ভাইয়ের পদাবলী	ভেই	সিকুন্দা
ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই/বোনের পদাবলী	ভেঝুর	
খালাত বোনের পদাবলী	বে	মাসতুতো বোন
খালাত ভাইয়ের পদাবলী	ভেই	মাসতুতো ভাই
বোনের (খালাত/আপন) মেয়ের পদাবলী	বোন-ঝি	ভাগিনি
বোনের (খালাত/আপন) ছেলের পদাবলী	বোন পুট	ভাগিনি

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮ ও লেভি-স্ট্রস (১৯৫২)

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ মারমা জ্ঞাতিসম্পর্ক

৬.৫.১ মারমা জ্ঞাতিসম্পর্ক

মারমা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের মূলে কাজ করে পরিবার। পরিবার থেকে জ্ঞাতিসম্পর্কের বৃহৎ উপাদান গঠিত হয়। পরিবারের আওতায় জ্ঞাতিসম্পর্কের ধারণাগত বিষয়ে অবগত হয় মারমা শিশু। এ সমাজে সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জ্ঞাতিসম্পর্ক যা সামাজিক যুথবদ্ধতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজের ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তম ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মারমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য রয়েছে। কিছু কিছু পরিবার মায়ের দিকের জ্ঞাতিকে অধিক গুরুত্ব দেয়। এসব পরিবারের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরণ ও পদাবলীর ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। মারমা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে রক্তসম্পর্কীয় ও বৈবাহিক জ্ঞাতিকে প্রায় সমানভাবে দেখা হয়।

সারণী ৬.১৮ঃ মারমা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্বারোপ

পিতা অথবা মায়ের জ্ঞাতির প্রতি বিশেষ গুরুত্বদান		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৩	১০.০
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৭	২৩.৩
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	২০	৬৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

মারমা সমাজ অন্যান্য সমাজের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সম অবস্থানে বিশ্বাসী। কেননা এ সমাজে দেখা যায় পিতামাতার জ্ঞাতিকে সমানভাবে দেখা হয়। বরং অন্যান্য সমাজের তুলনায় মারমা সমাজে মায়ের দিকের জ্ঞাতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। সারণী ৬.১৮ এ দেখা যায়- মারমা সমাজে পিতামাতার উভয় দিকের জ্ঞাতিকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। গুনবাচক আলোচনায় জানা যায় মারমা সমাজে মায়ের দিকের জ্ঞাতিকে সমান গুরুত্ব দেয়ার কারণ হল একই সমাজে পাশাপাশি বসবাস। অর্থাৎ মারমা সমাজে দেখা যায় কনে নির্বাচন করা হয় একই

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার মারমা সম্প্রদায় থেকে। ফলে মায়ের দিকের জ্ঞাতি নিকট দূরত্বে বসবাস করার কারণে আন্তরিকতারপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করে।

সারণী ৬.১৯ঃ মারমা সম্প্রদায়কে বিপদাপদে সহায়তা প্রদানকারী

বিপদাপদে সহায়তা		
সহায়তাকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজস্ব সম্প্রদায়	২৯	৯৬.৭
বাঙ্গালী	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সমাজে চলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদ ঘটতে পারে। এই বিপদাপদে জ্ঞাতিজনের সাহায্যের হাত অতীব দরকারী। মারমা সমাজে দেখা যায়, বিভিন্ন বিপদাপদে তারা নিজস্ব মারমা সম্প্রদায় থেকে সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকে। মারমারা অনেকটা যুথবদ্ধ গোষ্ঠী। তবে বিশ্বায়নের এই যুগে মারমারা দিন দিন উন্মুক্ত গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই দেখা যায়, মারমারা এখন তামাক চাষের মত বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সরাসরি জড়িত। নিজস্ব এলাকায় যুথবদ্ধভাবে বসবাস করার কারণে দেখা যায় (সারণী ৬.১৯) বিপদাপদে এরা নিজের সম্প্রদায় থেকে বেশি সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

সারণী ৬.২০ঃ মারমা সামাজিক সুসম্পর্ক

কোন ধরণের জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক বেশি		
জ্ঞাতি	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৫	১৬.৭
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৭	২৩.৩
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১৮	৬০.০
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে চলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক যেমন বজায় রাখতে হয় তেমনি নতুন জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। ঐতিহ্যবাহী মারমা সমাজে পিতা-মাতার জ্ঞাতির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ প্রদান করা হয়। মারমা সমাজে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির প্রতি পার্থক্য করা হয়না। এ সমাজে পিতার জ্ঞাতির পাশাপাশি মায়ের জ্ঞাতির সাথে সু স্পর্ক বজায় রাখতে তাগিদ দেয়া হয়। পরিবার, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিতার জ্ঞাতির পাশাপাশি মায়ের জ্ঞাতির ভূমিকা অনস্বীকার্য এ সমাজে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হওয়ার কারণে পিতার জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে এ সমাজে মায়ের জ্ঞাতির সাথেও সুসম্পর্ক লক্ষণীয় (সারণী ৬.২০)।

সারণী ৬.২১ঃ মারমা সমাজে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা

পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা			মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা	
মাত্রা	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
দৈনিক	২৩	৭৬.৭	১৫	৫০.০
সাপ্তাহিক	১	৩.৩	৭	২৩.৩
মাসিক	৫	১৬.৭	৫	১৬.৭
ষাণ্মাসিক	০	০	১	৩.৩
বার্ষিক	১	৩.৩	০	০
কখনো না	০	০	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

মারমা সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ মাত্রা দেখানো হয়েছে ৬.২১ নং সারণীতে। এতে দেখা যায় বেশিরভাগ মারমা উত্তরদাতার সাথে তাদের পিতার দিকের জ্ঞাতির নিয়মিত যোগাযোগ হয়। পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ মাত্রা নিয়মিত হওয়ার অন্যতম কারণ হল মারমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক যেখানে নব দম্পতি স্বামীর পিতামাতার পরিবারে অথবা একই এলাকায় বসবাস করে। এরফলে দৈনিক যোগাযোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে কোন কারণে বিবাদ বা মনোমালিন্য থাকে তবে সেক্ষেত্রে যোগাযোগ কম হয়। দম্পতি যদি পিতৃবাস প্রথার পরিবর্তে নয়াবাস প্রথা অবলম্বন করে দূরে অবস্থান করে সেক্ষেত্রেও যোগাযোগ কম হতে পারে। পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে তুলনায় মায়ের দিকের জ্ঞাতির

Dhaka University Institutional Repository

সাথে যোগাযোগ মাত্রা কম মারমা সমাজে। দেখা যায় ৫০ শতাংশ মারমা উত্তরদাতার সাথে তাদের মায়ের দিকের জ্ঞাতির যোগাযোগ হয় নিয়মিত তথা দৈনিক। ২৩.৩ শতাংশ মারমা মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে সপ্তাহ অন্তর যোগাযোগ করে। অপরদিকে ১৬.৭ শতাংশ মারমা মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির সাথে মাসিক অন্তর যোগাযোগ করে।

সারণী ৬.২২ঃ মারমা সমাজে বিবাহিত বোনের সাথে যোগাযোগের মাত্রা

বিবাহিত বোনের সাথে যোগাযোগের মাত্রা			বিবাহিত মেয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা	
মাত্রা	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
দৈনিক	২২	৭৩.৩	৭	২৩.৩
সাপ্তাহিক	৪	১৩.৩	০	০
মাসিক	৪	১৩.৩	১	৩.৩
প্রযোজ্য নই	০	০	২২	৭৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

মারমা সমাজ-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বাহন হল বিবাহ। মারমা সমাজে বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীর পিতার বাসস্থানে বসবাস করে। এরফলে কন্যা তার পিতামাতা, ভাই-বোন ছেড়ে স্বামীর সংসারে শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সাথে বসবাস করে। যদি একই এলাকার মারমা ছেলের সাথে বিবাহ হয় তবে যোগাযোগ হয় নিয়মিত। দূরের কোন মারমা ছেলের সাথে বিবাহ হলে যোগাযোগ মাত্রা কম থাকে। সারণী ৬.২২ এ দেখা যায় ৭৩.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে বিবাহিত বোনের সাথে দৈনিক যোগাযোগ হয়। পক্ষান্তরে ২৩.৩ শতাংশ মারমা উত্তরদাতার সাথে বিবাহিত বোনের যোগাযোগ হয় দৈনিক। সমান সংখ্যক অর্থাৎ ১৩.৩ শতাংশ মারমার সাথে বিবাহিত বোনের সাপ্তাহিক ও মাসিক যোগাযোগ হয়। যেখানে ৩.৩ শতাংশ মারমার বিবাহিত বোনের সাথে যোগাযোগ হয় মাসিক।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২৩ঃ মারমা সমাজে বর্তমান ও অতীতে আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নাকি যোগাযোগ বেশি ছিল

বর্তমানে আত্মীয়কে পরিভ্রমণ নাকি যোগাযোগ করা হয় বেশি?			অতীতে আত্মীয়কে পরিভ্রমণ নাকি যোগাযোগ করা হয় বেশি?	
ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
যোগাযোগ	২৬	৮৬.৭	২	৬.৭
পরিভ্রমণ	৪	১৩.৩	২৮	৯৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার ছাগলখাইয়া গ্রামের মারমা সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দিষ্ট এলাকায় সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সামাজিক যুথবদ্ধতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই গ্রামের মারমা সম্প্রদায়। একের সাথে অপরের সামাজিক যোগাযোগ ও পরিভ্রমণ সময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হচ্ছে। সারণী ৬.২৩ এ অতীত ও বর্তমানে মারমা সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ ও পরিভ্রমণের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায় তথ্য প্রযুক্তির অগ্রসরতার সাথে পরিভ্রমণ হ্রাস পেয়ে স্থান করে নিয়েছে যোগাযোগ। অর্থাৎ অতীতের তুলনায় বর্তমানে জ্ঞাতিকে পরিভ্রমণ করার পরিবর্তে জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ করা হয়। অতীতে জ্ঞাতির বাড়িতে গিয়ে জ্ঞাতিকে দেখা আসার প্রচলণ ছিল বেশি। কালের পরিক্রমায় জ্ঞাতির বাড়িতে যাওয়ার পরিবর্তে প্রযুক্তি বা মোবাইলের মাধ্যমে জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ করা হয়।

সারণী ৬.২৪ঃ মারমা সমাজে যোগাযোগ মাধ্যম

বর্তমান যোগাযোগ মাধ্যম			অতীত যোগাযোগ মাধ্যম	
মাধ্যম	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
মোবাইল	২৮	৯৩.৩	-	-
ডাক	১	৩.৩	২৪	৮০.০
অন্যান্য	১	৩.৩	৬	২০.০
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২৪ এ বর্তমান ও অতীতের যোগাযোগ মাধ্যম উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানে ৯৩.৩ ক্ষেত্রে যোগাযোগ মাধ্যম হল মোবাইল যেখানে অতীতে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে যোগাযোগ মাধ্যম ছিল ডাক। সময়ের ব্যবধানে প্রযুক্তির অগ্রসরতার সাথে তাল মিলিয়ে মারমা সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমান গবেষণার মাঠকর্ম পরিচানা কালে এটা পর্যবেক্ষিত হয়েছে যে অনেক মারমা এখন আধুনিক স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে।

বান্দরবান জেলায় মারমা সম্প্রদায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এক এলাকার মারমার সাথে অন্য এলাকার মারমার বিবাহ বন্ধনের ফলে নতুন জ্ঞাতিসম্পর্ক তৈরি হয়। বন্ধন তত্ত্ব (Alliance Thoery) এর মাধ্যমে মারমা জ্ঞাতিসম্পর্কে বিচার বিশ্লেণ করতে গেলে এটা প্রতীয়মান হয় যে মারমা সম্প্রদায় বৈবাহিক সম্পর্কের জালে একে অপর সম্পর্কিত। এই সমাজে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান জ্ঞাতিসম্পর্কের ও সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিবাহের চর্চা অন্তঃগোত্র (Endogamy) হওয়ার কারণে বিবাহ সমাজ জীবনে সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে। ফলে দেখা যায় একে অপরের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত। আবার জ্ঞাতিসম্পর্কের কাঠামোবাদী তত্ত্বের প্রেক্ষিতে মারমা জ্ঞাতিসম্পর্কে দেখতে গেলে এটা পরিলক্ষিত হয় যে- এ সমাজ আক্ষরিক অর্থে বা উপরি কাঠামোতে পিতৃতান্ত্রিক হলেও গভীর কাঠামোতে সমান্তরালভাবে পিতা ও মাতার জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্ব দেয়।

সারণী ৬.২৫ঃ মারমা সমাজে পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ

পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ		
কারণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
পরিভ্রমনে অসুবিধা	২৬	৮৬.৭
আন্তরিকতার অভাব	১	৩.৩
জানিনা	৩	১০.০
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৬.২৫ এ মারমা সমাজে পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়- অধিকাংশ মারমা মনে করে পরিভ্রমণে অসুবিধা হওয়ায় কারণে পরিভ্রমণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এই অসুবিধার মধ্যে আছে ভৌগোলিক দূরত্ব ও সময়। এক জন মারমা মনে করে পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ হল পূর্বের ন্যায় আন্তরিকতা না থাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২৬ঃ মারমা সমাজে মোবাইল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ

মোবাইলে যোগাযোগ বেশি হওয়ার কারণ		
কারণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
মোবাইলে যোগাযোগ সহজ	১২	৪০.০
পরিভ্রমণ ও মোবাইল যোগাযোগের একই অর্থ	১০	৩৩.৩
পরিভ্রমণের চেয়ে মোবাইল যোগাযোগ সাশ্রয়ী	৮	২৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

মারমা সমাজে পরিভ্রমণ হ্রাস পেয়ে মোবাইলে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে কিছু কারণ জড়িত, যেমন ৪০ শতাংশ মারমা মনে করে মোবাইলে যোগাযোগ অনেক বেশি সহজ (সারণী ৬.২৬)। যেমন মোবাইলে যখন তখন জ্ঞাতির খোঁজ খবর নেয়া যায় কিন্তু যখন তখন পরিভ্রমণ করা সম্ভব নয়। ৩৩.৩ শতাংশ মারমা মনে করে পরিভ্রমণ ও মোবাইলে যোগাযোগের একই তাৎপর্য। আবার ২৬.৭ শতাংশ মনে করে মোবাইল যোগাযোগ সাশ্রয়ী।

সারণী ৬.২৭ঃ মারমাদেরকে বিপদাপদে সহায়তাকারী

জ্ঞাতিজন কর্তৃক বিপদাপদে সহায়তা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৭	২৩.৩
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৬	২০.০
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১৭	৫৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

সমাজ জীবনে নানা ধরণের বিপদ আপদ আসতে পারে। এসকল বিপদাপদে জ্ঞাতি ও পাড়া-প্রতিবেশির সাহায্য সহযোগিতা লাগে। মারমা সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে পিতৃতান্ত্রিক। এ সমাজে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে লেনদেন বেশি হয়। সারণী ৬.২৭ এ দেখা যায় ২৩.৩ শতাংশ মারমা বিপদাপদে পিতার দিকের জ্ঞাতি থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। অন্যদিকে ২০ শতাংশ মারমা দৈনন্দিন বিপদাপদে মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। এ সমাজে পিতা মাতার জ্ঞাতির প্রতি সমান গুরুত্বারোপ করা হয় বিধায় দেখা যায় ৫৬.৭ শতাংশ মারমা বিপদাপদে পিতামাতা উভয়পক্ষ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে।

সারণী ৬.২৮ঃ মারমা সমাজে পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৬	২০.০
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৭	২৩.৩
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১৭	৫৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সংসারে একসঙ্গে বসবাস করার ফলে ঝগড়া বিবাদ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের, স্বামীর সাথে স্ত্রীর, সন্তানের সাথে পিতামাতার, ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে ননদ-দেবরের, পুত্রবধুর সাথে শ্বশুর শ্বাশুড়ির ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্য বাংলাদেশের পরিবারসমূহের চিরন্তন সমস্যা। মারমা সমাজ এর ব্যতিক্রম নয়। এ সমাজে দেখা যায় ২০ শতাংশ মারমা পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাহায্য পেয়ে থাকে (সারণী ৬.২৮)। অপরদিকে ২৩.৩ শতাংশ মারমা মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাহায্য পেয়ে থাকে। ৫৬.৭ শতাংশ মারমা পিতামাতার দিকে থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে।

সারণী ৬.২৯ঃ মারমা সামাজিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

সামাজিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১২	৪০.০
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১০	৩৩.৩
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৮	২৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

Dhaka University Institutional Repository

মারমা সমাজে সামাজিক বিবাদ খুবই কম। মারমারা পারস্পরিক সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতির উপর জোর দেয়। এর পরেও বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিবাদ ঘটে যা মিমাংসা বা নিস্পত্তির দরকার হয়। যেমন ৪০ শতাংশ মারমা মনে করে সামাজিক জীবনে বিবাদ নিস্পত্তিতে তাদের পিতার দিকের জ্ঞাতিরা বেশি ভূমিকা পালন করে (সারণী ৬.২৯)। অপরপক্ষে ৩৩.৩ শতাংশ মারমা মনে করে সামাজিক বিবাদ নিস্পত্তিতে তাদের মায়ের দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা বেশি। ২৬.৭ শতাংশ মারমা সামাজিক বিবাদ নিরসনে পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতির সাহায্য পায়। একইভাবে সর্বোচ্চ সংখ্যক মারমা মনে করে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতি সমান ভূমিকা রাখে (সারণী ৬.৩০)।

সারণী ৬.৩০ঃ মারমা সমাজে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৮	২৬.৭
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৬	২০.০
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১৬	৫৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সামাজিক যোগাযোগ আত্মীয়তার বন্ধনকে শক্ত করে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগের ফলের আন্তরিকতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সম্পর্কের ভিত্তি গাঢ় হয়। মারমা সমাজে দেখা যায় মায়ের জ্ঞাতির চেয়ে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ বেশি হয়। তবে অধিকাংশ মারমার মতে তারা পিতা মাতা উভয় দিকের জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে (সারণী ৬.৩১)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩১: মারমা সমাজে কোন ধরণের আত্মীয়-স্বজনের সাথে বেশি যোগাযোগ হয়

কোন ধরণের আত্মীয়-স্বজনের সাথে বেশি যোগাযোগ হয়		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৭	২৩.৩
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৬	২০.০
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১৭	৫৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

মারমা সমাজ কৃষি চাষের সাথে যুক্ত। ঐতিহ্যবাহী চাষাবাদের ধরণে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এক সময় মারমা সমাজ শিকার ও সংগ্রহের উপর নির্ভর করলেও বর্তমানে আধুনিক চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল। বাজার নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা মারমাদেরকে বাজারে সরাসরি লেনদেনের দিকে ধাবিত করেছে। সারণী ৬.৩২ এ দেখা যায় মারমারা সমাজ জীবনে দেনাপাওনা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজের সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেয় বেশি।

সারণী ৬.৩২ঃ মারমা সমাজ জীবনে যাদের সাথে লেনদেন বেশি হয়

সমাজ জীবনে কাদের সাথে লেনদেন বেশি হয়		
সম্প্রদায়	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজস্ব সম্প্রদায়	২৯	৯৬.৭
বাঙ্গালী	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩৩ঃ মারমা সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ ও প্রদান

	সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ		সমাজ জীবনে উপহার প্রদান	
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৯	৩০.০	৮	২৬.৭
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৬	২০.০	৬	২০.০
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	১৫	৫০.০	১৬	৫৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

মারমারা খুব অতিথি পরায়ন। কোন আগন্তুক মারমা গ্রামে প্রবেশ করলে তারা আগ্রহ নিয়ে আগন্তুকের সাথে কথা বলে যা বর্তমান গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের সময়কালে গভীরভাবে অনুধাবন ও পর্যবেক্ষিত হয়েছে। সমাজ জীবনে এরা একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে ভালবাসে। বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একে অপরকে উপহার প্রদান করে। সারণী ৬.৩৩ এ দেখা যায় ৩০ শতাংশ মারমা পিতার দিকের জ্ঞাতি থেকে উপহার পেয়ে থাকে যেখানে ২৬.৭ শতাংশ পিতার দিকের জ্ঞাতিকে উপহার দিয়ে থাকে। ২০ শতাংশ মারমা মায়ের দিকের জ্ঞাতিকে উপহার দেয় ও উপহার পায়। ৫০ শতাংশ মারমা পিতা মাতা উভয় দিকের জ্ঞাতি থেকে উপহার পেয়ে থাকে যেখানে ৫৩.৩ শতাংশ পিতা মাতা উভয় দিকের জ্ঞাতিকে উপহার প্রদান করে।

যাহোক, নৃবৈজ্ঞানিক নিগূঢ় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখা যায়- মারমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার কারণে এ সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব রয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মীয়তার বন্ধনের বেলায় পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। সমাজ জীবনে মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ বেশি হলেও মারমা সমাজ অন্যান্য সমাজের তুলনায় অধিক সহনশীল। ঐতিহ্যগত উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে আধুনিক তামাক চাষ এ সমাজে আমূল পরিবর্তন এনেছে যা সমাজ কাঠামো, পারস্পরিক সম্পর্ক, সহনশীলতা ও সামাজিক যুথবদ্ধতাকে প্রভাবিত করছে। বর্তমান অধ্যয়নে এটা প্রতিফলিত হয়েছে যে বিভিন্ন অন্ত ও বহিঃ চলকের প্রভাবে মারমা জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছে। কৃষি সংস্কৃতির সাথে সামাজিক পট পরিবর্তন ও গোষ্ঠীবদ্ধ যৌথ উৎপাদনের জন্য যৌথ ঐক্য ও পারস্পরিক মেলবন্ধন ধারণার ক্রমবর্ধমান রূপান্তরের ফলে মারমা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রভাব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫.২ মারমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী

মারমা সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষুদ্রতম উপাদান হল পরিবার। পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে জ্ঞাতিসম্পর্কের অন্যান্য বৃহৎ উপাদান গঠিত হয়। যেমন সম্প্রদায়, সমাজ ও সমাজ কাঠামো। মারমা পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহনের পর থেকে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মারমা জ্ঞাতিসম্পর্ক এস্কিমো জ্ঞাতিসম্পর্কের মত। মারমা সমাজে ভাই-বোন থেকে ক্রস কাজিন তথা মামাত/ ফুপাত ভাই-বোনদের পার্থক্য করা হয়। তাই এদের মধ্যে বিবাহ বৈধ। আর প্যারালাল কাজিন তথা চাচাত/ খালাত ভাই-বোনদেরকে ভাই-বোনের মত মনে করা হয়, যার কারণে এ সমাজে প্যারালাল কাজিন বিবাহ রীতি প্রচলিত নয়। পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এ সমাজে পিতার ও মাতার দিকের জ্ঞাতির জন্য অবস্থা প্রেক্ষিতে ভিন্ন পদাবলী ব্যবহৃত হয়। লেভি-স্ট্রস (১৯৫২) পার্বত্য চট্রগামের কিছু নৃগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর উপর কাজ করেন। সেখানে তিনি মারমাদের জ্ঞাতিসম্পর্ক ও পদাবলী বিষয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে লেভি-স্ট্রস (১৯৫২) কর্তৃক সনাক্তকৃত পদাবলীর সাথে মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত পদাবলী তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজ পরিবর্তনের সাথে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরণ ও পদাবলীর ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটলে তা নিরূপন করা। নিম্নে মারমা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

Dhaka University Institutional Repository

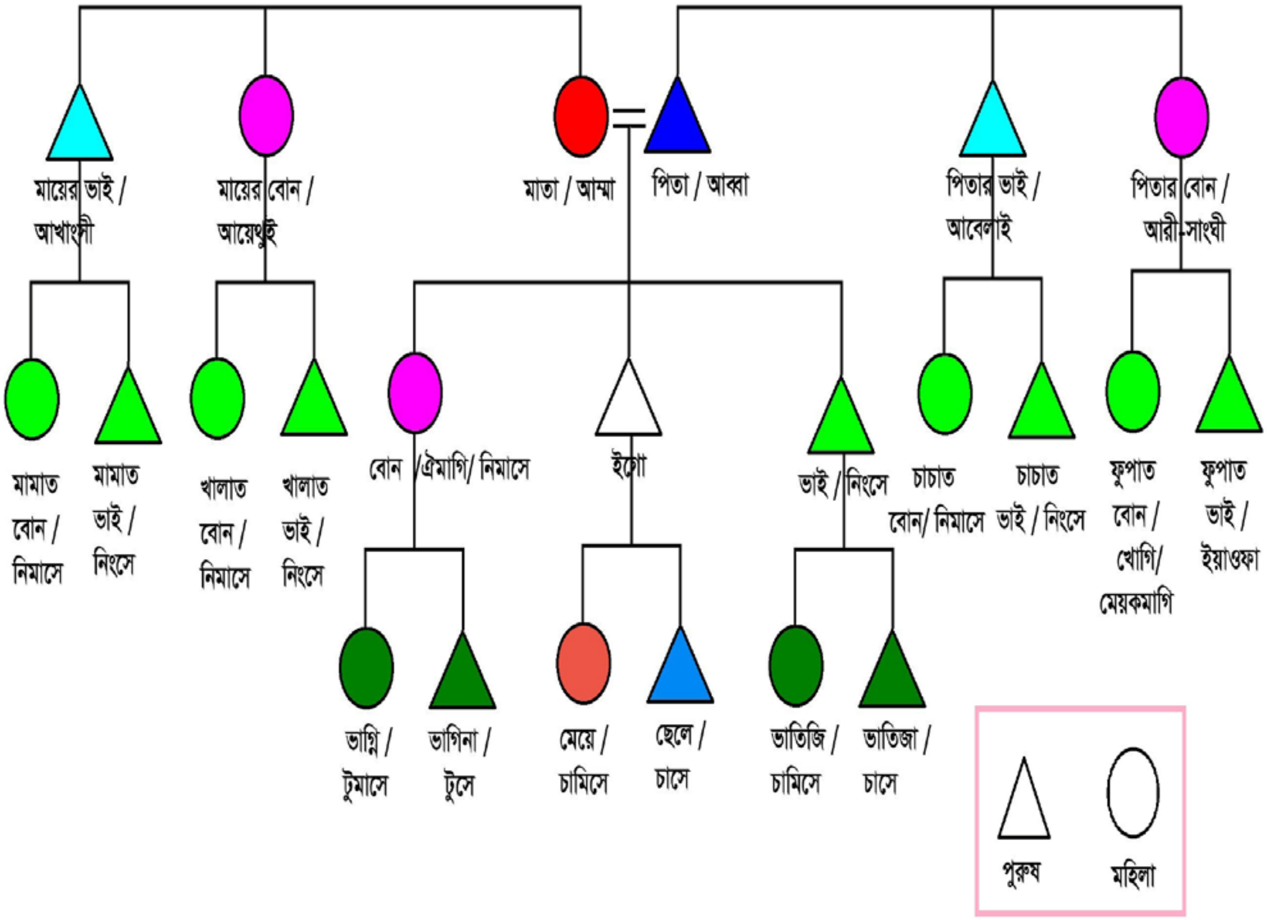

চিত্র ৬.২: মারমা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

নিচে মারমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী তুলে ধরা হল-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩৪ঃ মারমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী

মারমা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী		
জ্ঞাতি	বর্তমান গবেষণা	লেভি-স্ট্রস (১৯৫২)
পিতামহ/দাদার পদাবলী	আফু	নাফুসি
পিতামহী/দাদীর পদাবলী	আদা	আব
পিতার পদাবলী	আব্বা	আবা
মাতার পদাবলী	আম্মা-আম্মিক	আয়ুন
চাচার পদাবলী	আবেলাই	আবাগ্রি
চাচীর পদাবলী	আ-য়েলাই	
ফুফুর পদাবলী	আরী-সাংঘী	আরিসা
ফুফার পদাবলী	আথাংঘী	মামু
স্ত্রীর পদাবলী	ইয়াফা	মিয়া
স্ত্রীর ভাই/বোনের পদাবলী	য়াফা/ ইয়াফা	ইয়াফা
ভাইয়ের পদাবলী	নিংসে/ আকোগি	কুগ্রি/ নিসে
ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	কেমাসে	
বোনের পদাবলী	ঐমাগি/ নিমাসে	মেগ্রি
বোনের স্বামীর পদাবলী	ইয়াওপা	
চাচাত ভাইয়ের পদাবলী	নিংসে	কুগ্রিসা
চাচাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	কেমাসে	
চাচাত বোনের পদাবলী	নিমাসে	কুগ্রিসেমি
চাচাত বোনের স্বামীর পদাবলী	ইয়াওফা	
ফুফাত ভাইয়ের পদাবলী	ইয়াওফা	আসাংরি
ফুফাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	নিমাসে	

Dhaka University Institutional Repository

ফুফাত বোনের পদাবলী	খোগি/ মেয়কমাগি	
ফুফাত বোনের স্বামীর পদাবলী	আকো	
ছেলের পদাবলী	চাসে	সা
মেয়ের পদাবলী	চামিসে	সেমি
মাতামহী/নানির পদাবলী	আদ্দা	ইকমা
মাতামহ/নানার পদাবলী	আদ্দা	আব
মামার পদাবলী	আখাংসী	মামু
মামীর পদাবলী	আরেসাংগি	আরিসা
খালার পদাবলী	আয়েথুই	আগ্রিমা
খালুর পদাবলী	আখায় থুই	আবাগ্রি
স্বামীর পদাবলী	ইংসা/ আকেই	লাই
ভাইয়ের পদাবলী	নিংসে/ আকোগি	
ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	কেমাসে	
ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই/বোনের পদাবলী	ইয়াগোসি/ খেমাসে	নিয়েন
খালাত বোনের পদাবলী	নিমাসে	
খালাত ভাইয়ের পদাবলী	নিংসে	
বোনের (খালাত/আপন) মেয়ের পদাবলী	টুমাসে	টুমা
বোনের (খালাত/আপন) ছেলের পদাবলী	টুসে	টু

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮ ও লেভি-স্ট্রস (১৯৫২)

৬.৬ ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্ক

৬.৬.১ ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্ক

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি গোত্রে দ্বী-ধারায় বংশ গণনা করার পদ্ধতি চালু আছে। এতে একজন সন্তান তার পিতার *দফা* (দল) ও গোত্রের অধিকারি হয়। আবার একই পিতার ঔরসজাত কন্যাসন্তান তার মায়ের *দফা* (দল) ও গোত্রের অধিকারি হয়। ত্রিপুরাদের *দেনদাক*, *ফাতং*, *খালি*সহ বেশ কয়েকটি গোত্রে এই দ্বী-ধারায় বংশ গণনা করার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। ত্রিপুরাদের *আসলং-দফার* মেয়েরা সবসময় মাতৃধারা বংশ গণনা করে অর্থাৎ ছেলে হোক আর মেয়ে হোক মায়ের চোখে তাদের পিতা যে গোত্রেরই হোকনা কেন ছেলে-মেয়েরা *আসলং দফার* লোক। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বহির্গোত্র বিবাহ প্রথা কমবেশি প্রচলিত আছে (চাকমা ১৯৮৫)।

আধুনিকায়ন, বিশ্বায়ন, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে বহির্গোত্র বিবাহ প্রথা বর্তমানে বেশি চর্চিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে মারমারা কিছুটা ব্যতিক্রম। তবে ত্রিপুরাদের মধ্যে বহির্গোত্র বিবাহ প্রথা খুব প্রচলিত। ত্রিপুরারা প্রায়ই নিজ দফায় এবং কখনও কখনও স্বগোত্রে বিয়ে করে। এ কারণে তাদের ভাষায় জ্ঞাতি সম্বোধনসূচক শব্দগুলিতেও তার ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়; যেমন পিসি, কাকী, মাসী এদের সবাইকে *আনই* বলে সম্বোধন করে এবং পরিচয়ের ক্ষেত্রে *ননই* হিসেবে পরিচয় দেয়। একইভাবে তারা কাকা, পিসা, মেসো এদের সবাইকে *আতই* বলে সম্বোধন করে এবং পরিচয়ের ক্ষেত্রে ততই হিসাবে পরিচয় দেয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আত্মীয়দের অবস্থান সম্পর্ক মোটামুটি নিম্নরূপঃ

পিসী=মাসী=কাকী=মামী= *ননই*

পিসা=মেসো=কাকা=মামা=ততই

ত্রিপুরাদের মধ্যে আন্তঃগোত্রে বিবাহ করার রীতি এককালে খুবই বলবৎ ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চলকের কারণে ত্রিপুরাদের মধ্যে বর্তমানে অধিক পরিমানে বহির্গোত্র বিবাহ হচ্ছে। এরফলে জ্ঞাতিসম্পর্ক ও এর পদাবলী যেমন পরিবর্তন হচ্ছে তেমনি নতুন ধরণের জ্ঞাতিসম্পর্ক তৈরি হচ্ছে।

সারণী ৬.৩৫ঃ ত্রিপুরা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্বারোপ

পিতা অথবা মায়ের জ্ঞাতির প্রতি বিশেষ গুরুত্বদান		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১	৩.৩
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৩	১০.০
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	২৬	৮৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ত্রিপুরা সমাজে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। ত্রিপুরা সম্প্রদায় সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী যাদের পূজা, পালা-পার্বনে পিতা ও মাতার দিকের জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ থাকে। ত্রিপুরা সমাজ ব্যবস্থায় পিতা ও মাতার *দফা* বা দল নামক উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত থাকায় এ সমাজে পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতির প্রতি গুরুত্বারোপ দেখা যায়। সারণী ৬.৩৬ এ একই চিত্র ফুটে উঠে।

সারণী ৬.৩৬ঃ ত্রিপুরা সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার

পুরুষ মালিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকার			মহিলা মালিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকার	
উত্তরাধিকার	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
পুত্র	২৮	৯৩.৩	২	৬.৭
কন্যা	২	৬.৬	২৮	৯৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরা সমাজে দুই ধরণের উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত। পিতার *দফার* অনুসারী হলে পুরুষ সন্তান পিতার সম্পত্তির মালিক হয়। আর অন্যদিকে মায়ের *দফার ক্ষেত্রে* কন্যা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়। উল্লেখ্য যে পুরুষ *দফার* ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়। অপরপক্ষে মহিলা *দফার* ক্ষেত্রে কন্যা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়।

সারণী ৬.৩৭ঃ ত্রিপুরা সম্প্রদায়কে বিপদাপদে সহায়তা প্রদানকারী

বিপদাপদে সহায়তা		
সহায়তাকারী	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজস্ব সম্প্রদায়	২৯	৯৬.৭
বাঙ্গালী	১	৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরা সম্প্রদায় অনেকটা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। এ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের জিবনমান নিম্মুখি। তাছাড়া পাহাড়ের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ফলে এখানে জীবন হয়ে উঠছে সংগ্রামী ও প্রতিযোগিতামূলক। এই তীব্র প্রতিযোগিতার সময়েও ত্রিপুরারা তাদের বিপদাপদে নিজস্ব ত্রিপুরা সম্প্রদায় থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পায়। সারণী ৬.৩৭ এ এই বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণী ৬.৩৮ঃ ত্রিপুরা সামাজিক সুসম্পর্ক

কোন ধরণের জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক বেশি		
জ্ঞাতি	গণসংখ্যা	কতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১৩	৪৩.৩
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	১৭	৫৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরা সমাজে পিতার ও মাতার দিকের জ্ঞাতির মধ্যে দেখা যায় মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক বেশি (সারণী ৬.৩৮)। এর অন্যতম কারণ মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হওয়ার কারণে পিতার জ্ঞাতির সাথে বসবাস করার ফলে সীমিত সম্পদের উপর তীব্র প্রতিযোগিতায় উপনীত হতে হয়। পক্ষান্তরে মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক কম। তবে একেবারেই যে নেই তা বলা যাবেনা। মায়ের দিকের *দফা* থেকে কালক্রমে পিতৃতান্ত্রিক *দফার* দিকে ত্রিপুরা সমাজ ধাবিত হচ্ছে।

এর ফলে মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে সম্পত্তির ভাগ নিয়ে বিবাদ যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি প্রতিযোগিতাও বাড়ছে।

সারণী ৬.৩৯ঃ ত্রিপুরা সমাজে পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা

পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা			মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা	
মাত্রা	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
দৈনিক	১৭	৫৬.৭	২	৬.৭
সাপ্তাহিক	৭	২৩.৩	১	৩.৩
মাসিক	৪	১৩.৩	১১	৩৬.৭
ষাণ্মাসিক	১	৩.৩	৬	২০.০
বার্ষিক	১	৩.৩	০	০
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

এ সমাজে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে দৈনিক যোগাযোগ হয় বেশি। সারণী ৬.৩৯ এর তথ্য অনুসারে ৫৬.৭ শতাংশ ত্রিপুরা পরিবারে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে দৈনিক যোগাযোগ হয়। অপরদিকে ২৩.৩ শতাংশ পরিবারে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ হয় সপ্তাহ অন্তর। এখানে উল্লেখ্য যে জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ মাত্রা জ্ঞাতিত্ব নিরূপনের অনেকগুলো মাপকাঠির একটি। তাই বর্তমান গবেষণায় জ্ঞাতিত্বের বন্ধনের স্বরূপ উপলব্ধি করার লক্ষ্যে যোগাযোগ মাত্রা নিরূপনের চেষ্টা করা হয়। একইভাবে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংকখ্যক ত্রিপুরা পরিবারের সাথে মেয়ের দিকের জ্ঞাতির যোগাযোগ হয় মাসিক। এর অন্যতম কারণ হল মায়ের দিকের জ্ঞাতিরা দূরে বসবাস করে। ৬.৭ শতাংশ ত্রিপুরার মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে দৈনিক যোগাযোগ হয় যেখানে ৩.৩ শতাংশের সাপ্তাহিক যোগাযোগ হয়।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সনাতনী হিন্দু হলেও এ সমাজে মেয়েদের সম্মান বাংলাদেশের মূলধারার হিন্দু সমাজের মেয়েদের থেকে বেশি। যেমন ত্রিপুরা সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষ বরপক্ষকে কোন প্রকার পণ বা যৌতুক দেয়া লাগেনা। বরং ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষকে পণ দিতে হয়।

সারণী ৬.৪০ঃ ত্রিপুরা সমাজে বিবাহিত বোন ও মেয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা

বিবাহিত বোনের সাথে যোগাযোগের মাত্রা			বিবাহিত মেয়ের সাথে যোগাযোগের মাত্রা	
মাত্রা	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
দৈনিক	৩	১০.০	৬	২০.০
সাপ্তাহিক	১১	৩৬.৭	১৩	৪৩.৩
মাসিক	১১	৩৬.৭	১	৩.৩
ষাণ্মাসিক	১	৩.৩	-	-
বার্ষিক	১	৩.৩	-	-
প্রযোজ্য নই	৩	১০.০	১০	৩৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

যাহোক, ত্রিপুরা সমাজে বিবাহিত বোনের সাথে যোগাযোগ মাত্রা মোটামুটি পর্যায়ের (সারণী ৬.৪০)। দেখা যায় ৩৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতার সাথে বিবাহিত বোনের সাপ্তাহিক ও মাসিক যোগাযোগ হয়। ১০ শতাংশ উত্তরদাতার সাথে বিবাহিত বোনের দৈনিক যোগাযোগ হয়। বিবাহিত বোনের সাথে বিবাহিত মেয়ের তুলনায় দেখা যায় ৪৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতার সাথে বিবাহিত মেয়ের সাপ্তাহিক যোগাযোগ হয়। ২০ শতাংশ উত্তরদাতার সাথে বিবাহিত মেয়ের দৈনিক যোগাযোগ হয়।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কালের পরিক্রমায় জ্ঞাতিত্ব বন্ধনে পরিবর্তন এসেছে। ফলে দেখা যায় অতীতে জ্ঞাতিকে পরিভ্রমণ করার রীতি বেশি প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে তা হ্রাস পাচ্ছে। সারণী ৬.৪১ দেখা যাচ্ছে অতীতে ৯৬.৭ শতাংশ ত্রিপুরা জ্ঞাতিকে পরিভ্রমণ করাকে প্রাধান্য দিত। কিন্তু বর্তমানে ৯০ শতাংশ ত্রিপুরা পরিভ্রমণ করার পরিবর্তে শুধুমাত্র মোবাইল যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞাতির সাথে কুশল বিনিময় করছে ও যোগাযোগ রাখছে। পরিভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞাতির বাড়িতে গিয়ে কুশল বিনিময়, একসাথে আহার, সুখ-দুঃখের গল্প, এবং পরস্পরের হাসি আনন্দের প্রত্যক্ষ্য অংশীদার হতো। কিন্তু পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণে যোগাযোগ মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও কিছু ত্রিপুরা মনে করে এতে ঘনিষ্ঠতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে।

সারণী ৬.৪১ঃ ত্রিপুরা সমাজে বর্তমান ও অতীতে আত্মীয়দের সাথে দেখাসাক্ষাৎ নাকি যোগাযোগ বেশি ছিল

বর্তমানে আত্মীয়কে পরিভ্রমণ নাকি যোগাযোগ করা হয় বেশি?			অতীতে আত্মীয়কে পরিভ্রমণ নাকি যোগাযোগ করা হত বেশি?	
ধরণ	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
যোগাযোগ	২৭	৯০.০	১	৩.৩
পরিভ্রমণ	৩	১০.০	২৯	৯৬.৭
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

বর্তমানে জ্ঞাতিকে পরিভ্রণের পরিবর্তে যোগাযোগ বেশি করা হচ্ছে ত্রিপুরা সমাজে। সারণী ৬.৪২ এ ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধে যোগাযোগ মাধ্যম দেখানো হয়েছে। বর্তমান ও অতীতের যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে বিপরীত ধর্মী সম্পর্ক রয়েছে। যেমন অতীতে ৮০ শতাংশ ত্রিপুরার যোগাযোগ মাধ্যম ছিল ডাক ব্যবস্থা বর্তমানে যেটি মোবাইলকে তার স্থান ছেড়ে দিয়েছে। তাই দেখা যায় ৯৩.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে বর্তমানে যোগাযোগ মাধ্যম হল মোবাইল। বাংলাদেশের মূলধারার সমাজসমূহের মতই ত্রিপুরা সমাজে আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরায়ন, অভিগমন, বৃহত্তর সমাজের সাথে মিথষ্ক্রিয়া, বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়নের প্রভাব ত্রিপুরা সমাজে ক্রমাগতভাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে।

সারণী ৬.৪২ঃ ত্রিপুরা সমাজে যোগাযোগ মাধ্যম

বর্তমান যোগাযোগ মাধ্যম			অতীত যোগাযোগ মাধ্যম	
মাধ্যম	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
মোবাইল	২৮	৯৩.৩	-	-
ডাক	১	৩.৩	২৪	৮০.০
অন্যান্য	১	৩.৩	৬	২০.০
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৬.৪৩ঃ ত্রিপুরা সমাজে পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ

পরিভ্রমণ হ্রাস পাওয়ার কারণ		
কারণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
পরিভ্রমনে অসুবিধা	২০	৬৬.৭
আন্তরিকতার অভাব	১	৩.৩
ব্যস্ততা	৭	২৩.৩
জানিনা	২	৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৬.৪৩ এ ত্রিপুরা সমাজে জ্ঞাতিকে পরিভ্রমণ করার পরিমান হ্রাস পাওয়ার কারণ দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় ৬৬.৭ ত্রিপুরা মনে করে পরিভ্রমণে অসুবিধা হওয়ার কারণে পরিভ্রমণ হ্রাস পাচ্ছে। তবে ৩.৩ শতাংশ ত্রিপুরা পরিভ্রমণ হ্রাসের কারণ হিসাবে আন্তরিকতার অভাব মনে করে। ২৩.৩ শতাংশ ত্রিপুরা মনে করে দৈনন্দিন জীবনে পূর্বের তুলনায় ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিভ্রমণ হ্রাস পাচ্ছে। এটাও প্রতিপাদ্য যে দিনদিন ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর মাঝে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথাগত উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, সরকারি বিধি-নিষেধ ও উর্ধমান দৈনন্দিন খরচের সাথে মানিয়ে নিতে বিকল্প উৎপাদন কৌশল অবলম্বন ইত্যাদি কারণে ত্রিপুরাদের মাঝে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী ৬.৪৪ঃ ত্রিপুরা সমাজে মোবাইল যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ

মোবাইলে যোগাযোগ বেশি হওয়ার কারণ		
কারণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
মোবাইলে যোগাযোগ সহজ	৬	২০.০
পরিভ্রমণ ও মোবাইল যোগাযোগের একই অর্থ	৭	২৩.৩
পরিভ্রমণের চেয়ে মোবাইল যোগাযোগ সাশ্রয়ী	১৭	৫৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

২০ শতাংশ ত্রিপুরা মনে করে মোবাইলে যোগাযোগ বেশি হওয়ার একটি কারণ হল এতে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনেক সহজ (সারণী ৬.৪৪)। ২৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে জ্ঞাতিকে পরিভ্রমণ করা আর মোবাইলে যোগাযোগ করার মধ্যে কার্যত কোন পার্থক্য নেই বরং একই তাৎপর্য। ৫৬.৭ শতাংশ ত্রিপুরা মনে করে জ্ঞাতিকে পরিভ্রমণ করা একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার অন্যদিকে এতে যাতায়াত খরচ দরকার হয়। এদিক বিবেচনায় তারা মনে করে পরিভ্রমণের চেয়ে মোবাইল যোগাযোগ সাশ্রয়ী।

সারণী ৬.৪৫ঃ জ্ঞাতিত্বের বন্ধন

বর্তমানে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন অতীতের মত ভাল আছে?		
জ্ঞাতিত্বের অবস্থা	গণসংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	২৫	৮৩.৩
না	৫	১৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

বর্তমান গবেষণায় জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন জানার চেষ্টা করা হয়। এ লক্ষ্যে অতীত থেকে বর্তমানে জ্ঞাতিত্বের বন্ধনের নৈকট্য উদঘাটন করা ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। চাকমা ও মারমা সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা এটা মানতে নারাজ যে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে বা হ্রাস পেয়েছে। চাকমা ও মারমাদের প্রায় সবাই মনে করে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন আগের মতই আছে। শুধু নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ত্রিপুরারা ব্যতিক্রম। ত্রিপুরাদের কিছু অংশ মনে করে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে। সারণী ৬.৪৫ এ দেখা যায় ১৬.৭ শতাংশ ত্রিপুরা মনে করে অতীতের তুলনায় বর্তমানে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে।

সারণী ৬.৪৬ঃ জ্ঞাতিত্বের বন্ধন দুর্বল হওয়ার কারণ

জ্ঞাতিত্বের বন্ধন দুর্বল হওয়ার কারণ কি কি?		
কারণ	গণসংখ্যা	শতাংশ
পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির প্রভাব	২	৬.৭
আধুনিকায়নের প্রভাব	৩	১০.০
প্রযোজ্য নয়	২৫	৮৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরাদের একটি অংশ মনে করে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আত্মীয়দের মাঝে দিন দিন সৌহার্দ্য ও উদারতা হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু বর্তমানে এক আত্মীয়ের সুখ-দুঃখ অপর আত্মীয়কে পূর্বের ন্যায় নাড়া দেয়না। এর কারণ হিসাবে ত্রিপুরারা কিছু কারণ চিহ্নিত করে। ত্রিপুরাদের মাঝে ৬.৭ শতাংশ মনে করে আত্মীয়তার বন্ধন হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ পারিপার্শ্বিক অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব (সারণী ৬.৪৬)। এ অংশের মতে পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে প্রথাগত ত্রিপুরা সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন হ্রাসমান। অপরদিকে ১০ শতাংশ মনে করে আধুনিকায়নের প্রভাবের কারণে ত্রিপুরা সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে।

সারণী ৬.৪৭ঃ জ্ঞাতিজন কর্তৃক ত্রিপুরাদেরকে বিপদাপদে সহায়তাকারী

জ্ঞাতিজন কর্তৃক বিপদাপদে সহায়তা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২৪	৮০.০
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২	৬.৭
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৪	১৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৬.৪৭ এ দেখানো হয়েছে ত্রিপুরাদের বিপদাপদে পিতা নাকি মায়ের দিকের আত্মীয়রা বেশি সহায়তা করে। এতে দেখা যায় ৮০ শতাংশ ত্রিপুরা মনে করে বিপদাপদে তাদের পিতার দিকের আত্মীয়রা বেশি সহায়তা করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে এ সমাজে পিতার দিকের আত্মীয়ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

সারণী ৬.৪৮: ত্রিপুরা সমাজে পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২২	৭৩.৩
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৪	১৩.৩
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৪	১৩.৩
মোট	৩০	১০০

একসাথে বসবাস করতে গেলে ছোটখাট বিবাদ হয় যাকে পারিবারিক বিবাদ বলা হয়। ত্রিপুরা সমাজে পারিবারিক বিবাদ একবারেই যে নেই তা বলা যাবেনা। এসব পারিবারিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়দের ভূমিকা অপরিহার্য। ত্রিপুরা সমাজে দেখা যায় ৭৩.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক বিবাদ নিরসনে পিতার দিকের আত্মীয় ভূমিকা রাখে (সারণী ৬.৪৮)।

সারণী ৬.৪৯ঃ ত্রিপুরা সামাজিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

সামাজিক বিবাদ নিস্পত্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২৪	৮০.০
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২	৬.৭
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৪	১৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সম্পদ ও বাঁচার উপায় সীমিত হয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাথে তাল মিলিয়ে সামাজিক বিবাদও বাড়ছে। ত্রিপুরা সমাজে দেখা যায় প্রথাগত কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়ে জীবন ধারণের উপায় ক্রমাতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখিন হচ্ছে। এরফলে সামাজিক জীবনে বিবাদ ও অন্যনায় ছোটখাট সংঘাত দেখা দিচ্ছে। সারণী ৬.৪৯ এ দেখা যায় সামাজিক বিবাদ নিরসনে ত্রিপুরা সমাজে পিতার দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা অনস্বীকার্য সামাজিক বিবাদ নিরসনে।

সারণী ৬.৫০ঃ ত্রিপুরা সমাজে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

আর্থিক সংকট মোকাবেলায় আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২০	৬৬.৭
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৬	২০.০
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৪	১৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ঐতিহ্যগতভাবে লিখিত দলীল ব্যাতিত কৃষি জমি ভোগ দখলের পদ্ধতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত। বর্তমানে দলীলকরণের গুরুত্ব দিন দিন উপলব্ধি হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজ সমূহে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জমির উপর ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরফলে উৎপাদন উপায় সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি নতুন উৎপাদন কৌশল তৈরি হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেক সদস্য বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় অনুসরণ করতে না পারায় জীবন-জীবিকা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হচ্ছে। এরফলে আর্থিক সংকটসহ অনেক সংকট দেখা দিচ্ছে। সারণী ৬.৫০ এ দেখা যায় আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রান পেতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে পিতার দিকের জ্ঞাতিজন।

সারণী ৬.৫১ঃ ত্রিপুরা সমাজে কোন ধরণের আত্মীয়-স্বজনের সাথে বেশি যোগাযোগ হয়

কোন ধরণের আত্মীয়-স্বজনের সাথে বেশি যোগাযোগ হয়		
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২৪	৮০.০
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২	৬.৭
পিতা মাতা উভয় দিকের আত্মীয়	৪	১৩.৩
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

সারণী ৬.৫১ এ ত্রিপুরা সমাজে জ্ঞাতিজনদের সাথে যোগাযোগ মাত্রা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে বেশি যোগাযোগ হয়। সামাজিক ও পারিবারিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সমাজে অগ্রাধিকার পায় পিতার দিকের জ্ঞাতি। ত্রিপুরা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়াতে সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে পিতার দিকের জ্ঞাতির প্রভাব বেশ লক্ষণিয়।

সারণী ৬.৫২ঃ ত্রিপুরা সমাজ জীবনে যাদের সাথে লেনদেন বেশি হয়

সমাজ জীবনে কাদের সাথে লেনদেন বেশি হয়		
সম্প্রদায়	গণসংখ্যা	শতাংশ
নিজস্ব সম্প্রদায়	২৮	৯৩.৩
বাঙ্গালী	২	৬.৭
মোট	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরা সমাজ জীবনে লেনদেন ও সামাজিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সমাজ জীবনে নিজস্ব ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বাহিরে লেনদেন ও আদান প্রদানের হার কম ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে। পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার দিক দিয়ে ত্রিপুরারা নিজের সম্প্রদায়ের উপর অধিক আস্থাশীল। তাই সারণী ৬.৫২ তে দেখা যায় মাত্র ৬.৭ শতাংশ ত্রিপুরা বাঙ্গালীদের সাথে লেনদেন করে।

সারণী ৬.৫৩ঃ ত্রিপুরা সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ ও প্রদান

সমাজ জীবনে উপহার গ্রহণ			সমাজ জীবনে উপহার প্রদান	
আত্মীয়	গণসংখ্যা	শতাংশ	গণসংখ্যা	শতাংশ
পিতৃসূত্রীয় আত্মীয়	২৪	৮০.০	২০	৬৬.৬
মাতৃসূত্রীয় আত্মীয়	৬	২০.০	১০	৩৩.৩
মোট	৩০	১০০.০	৩০	১০০.০

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

ত্রিপুরা সমাজ জীবনে উপহার প্রথা ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে। এ সমাজে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে জ্ঞাতিকে উপহার দেয়া হয়। সনাতনী হিন্দু প্রধান ত্রিপুরা সমাজে পূজা-পার্বনে সামর্থমত একে অপরকে উপহার প্রদান করা হয়। বিবাহিত মেয়েকে যেমন উপহার দেয়া হয় তেমনি বিবাহিত মেয়ে ও মেয়ের জামাই শ্বশুর পক্ষকে উপহার প্রদান করে। সারণী ৬.৫৩ তে দেখা যায় পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতিকে উপহার বেশি যেমন প্রদান করা হয় তেমনি পিতৃসূত্রীয় জ্ঞাতি থেকে বেশি উপহার গ্রহণ করা হয়।

যাহোক, ত্রিপুরা সমাজে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় পিতার দিকের জ্ঞাতির গুরুত্ব বেশি। উপরিকাঠামোতে দেখা যায় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে মিথস্ক্রিয়া বেশি হয়। এর অন্যতম কারণ হল বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজসমূহের মত ত্রিপুরা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার ফলে পিতার জ্ঞাতির সাথে একসাথে বসবাস করা হয়। তবে জ্ঞাতিসম্পর্কের কাঠামোবাদী তত্ত্বের আলোকে ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্ককে বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মায়ের দিকের জ্ঞাতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্ককে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে যুক্ত হয় এ সম্প্রদায়ের লোকেরা। এ বন্ধন পরিপূর্ণতা পায় সমাজ জীবনে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

৬.৬.২ ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী

ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন পরিচয়ের অন্যতম বাহ্যিক রূপ হল জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী। ত্রিপুরা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী নিজস্ব কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলে। জ্ঞাতিসম্পর্কের কাঠামোবাদী তত্ত্বের আলোকে ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা ছাড়া পিতার ও মায়ের দিকের পুরুষ জ্ঞাতিকে ডাকা হয় ততই নামে। অপরপক্ষে মা ব্যতিত মায়ের ও বাবার দিকের সকল মহিলা জ্ঞাতিকে ডাকা হয় *ননই* নামে। এতে প্রতীয়মান হয় যে ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পিতার ও মাতার জ্ঞাতিকে আলাদা করার পরিবর্তে লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন করে একই কাঠামোতে বিচার করা হয় যা হাওয়ায় জ্ঞাতিসম্পর্কের মত। নিম্নে ত্রিপুরা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

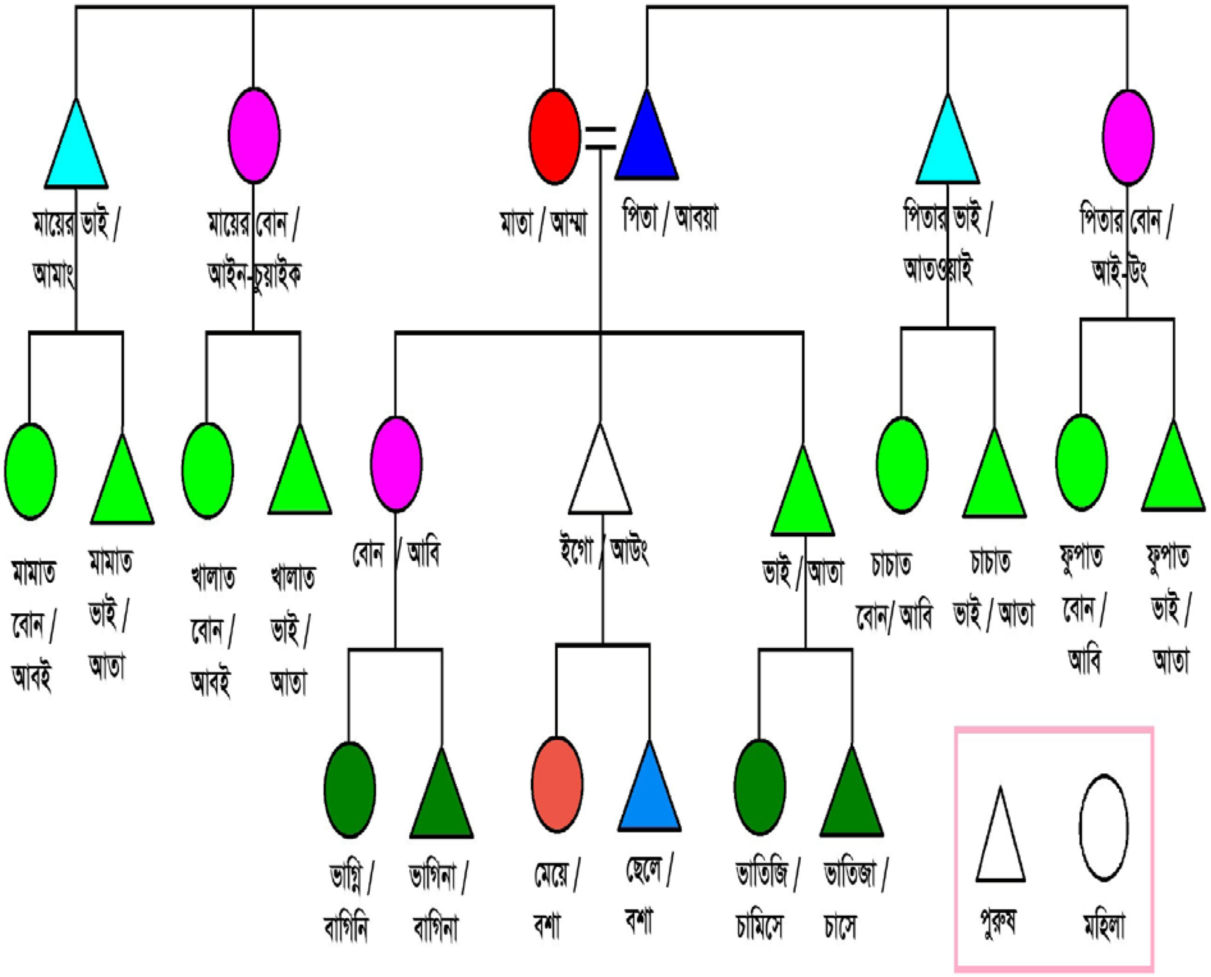

চিত্র ৬.৩: ত্রিপুরা জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

নিচে ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী দেখানো হল

সারণী ৬.৫৪ঃ ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী

ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী			
জ্ঞাতি	পদাবলী	জ্ঞাতি	পদাবলী
পিতামহ/দাদার পদাবলী	আচু	খালাত বোনের পদাবলী	আবই/ আকই
পিতামহী/দাদীর পদাবলী	আচুই	বোনের (খালাত/আপন) ছেলের পদাবলী	বাগিনা
পিতার পদাবলী	আবয়া	মেয়ের পদাবলী	বাশা
মাতার পদাবল	আম্মা	ছেলের পদাবলী	বাশা
চাচার পদাবলী	আতওয়াই	ফুফাত বোনের পদাবলী	আবি/আকি
চাচীর পদাবলী	আনুই	ফুফাত বোনের স্বামীর পদাবলী	আকি
ফুফুর পদাবলী	আই-উং	ছেলের পদাবলী	বশা
ফুফার পদাবলী	আইন-চোক	মেয়ের পদাবলী	বশা
স্ত্রীর পদাবলী	বিহি/আফাচাকমা	মাতামহী/নানির পদাবলী	আচই
স্ত্রীর ভাই/বোনের পদাবলী	পারাংলা	মাতামহ/নানার পদাবলী	আচু
ভাইয়ের পদাবলী	আতা/আকই	মায়ের পদাবলী	আম্মা
ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	বাচই	মামার পদাবলী	আমাং
বোনের পদাবলী	আবি/আকি	মামীর পদাবলী	আথিচুয়াইক
বোনের স্বামীর পদাবলী	কমই	খালার পদাবলী	আইন-চুয়াইক
চাচাত ভাইয়ের পদাবলী	আতা/ আকি	খালুর পদাবলী	আই-উং
চাচাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	বাচই/ আকি	স্বামীর পদাবলী	চালা
চাচাত বোনের পদাবলী	আবি/আকি	ভাইয়ের পদাবলী	আতা/ আকি
চাচাত বোনের স্বামীর পদাবলী	কমই	ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	আকিনি বিহি
ফুফাত ভাইয়ের পদাবলী	আতা/ আকি	ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই/বোনের	পারাংলা

ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী			
জ্ঞাতি	পদাবলী	জ্ঞাতি	পদাবলী
		পদাবলী	
ফুফাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	বাচই/ আকি	বোনের (খালাত/আপন) মেয়ের পদাবলী	বাগিনি
খালার ভাইয়ের পদাবলী	আতা/ আকই		

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৬.৭ আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বর্তমান অধ্যায়ে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের জ্ঞাতিসম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। জ্ঞাতিসম্পর্কের নৈকট্য উপলব্ধি করার জন্য বিশেষ কিছু চলকের সাহায্যে আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ জরুরি। এর ফলে নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃস্য ও বৈসাদৃস্য ফুটে উঠে। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজের বৈশিষ্ট্য পিতৃতান্ত্রিক হলেও এদের মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যেমন আছে তেমনি এমন কিছু উপাদান আছে মোটামুটি সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান। পাশাপাশি পরিবেশে বসবাসের কারণে নিজস্ব জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার, বিশেষ করে পদাবলীর সম্মক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন-

সারণী ৬.৫৫ঃ নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী

নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী			
জ্ঞাতি	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা
পিতামহ/দাদার পদাবলী	আজু	আফু	আচু
পিতামহী/দাদীর পদাবলী	বেইৎ	আদা	আচুই
পিতার পদাবলী	বা	আব্বা	আবয়া
মাতার পদাবলী	মা	আম্মা-আম্মিক	আম্মা
চাচার পদাবলী	হাক্কা	আবেলাই	আতওয়াই
চাচীর পদাবলী	হাক্কি	আ-য়েলাই	আনুই
ফুফুর পদাবলী	পিজেই	আরী-সাংঘী	আই-উং
ফুফার পদাবলী	পিজা	আথাংঘী	আইন-চোক
স্ত্রীর পদাবলী	মোক	ইয়াফা	বিহি/আফাচাকমা
স্ত্রীর ভাই/বোনের পদাবলী	শ্যালা- শ্যালি	য়াফা/ ইয়াফা	পারাংলা
ভাইয়ের পদাবলী	ভেই	নিংসে/ আকোগি	আতা/আকই
ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	ভুঝি	কেমাসে	বাচই
বোনের পদাবলী	বে	ঐমাগি/ নিমাসে	আবি/আকি
বোনের স্বামীর পদাবলী	বোনোই	ইয়াওপা	কমই
চাচাত ভাইয়ের পদাবলী	দা	নিংসে	আতা/ আকি

নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী			
জ্ঞাতি	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা
চাচাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	ভুঝি	কেমাসে	বাচই/ আকি
চাচাত বোনের পদাবলী	বে	নিমাসে	আবি/আকি
চাচাত বোনের স্বামীর পদাবলী	বোনোই	ইয়াওফা	কমই
ফুফাত ভাইয়ের পদাবলী	দা	ইয়াওফা	আতা/ আকি
ফুফাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	ভুঝি	নিমাসে	বাচই/ আকি
ফুফাত বোনের পদাবলী	বে	খোগি/ মেয়কমাগি	আবি/আকি
ফুফাত বোনের স্বামীর পদাবলী	বোনোই	আকো	আকি
ছেলের পদাবলী	পো	চাসে	বশা
মেয়ের পদাবলী	ঝি	চামিসে	বশা
মাতামহী/নানির পদাবলী	বেই	আদ্দা	আচই
মাতামহ/নানার পদাবলী	আজু	আদ্দা	আচু
মামার পদাবলী	মাম্মু	আখাংসী	আমাং
মামীর পদাবলী	মামী	আরেসাংগি	আথিচুয়াইক
খালার পদাবলী	মুঝি	আয়েথুই	আইন-চুয়াইক
খালুর পদাবলী	মোইঝো	আখায় থুই	আই-উং
স্বামীর পদাবলী	নেক	ইংসা/ আকেই	চালা
ভাইয়ের পদাবলী	ভেই	নিংসে/ আকোগি	আতা/ আকি

নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী			
জ্ঞাতি	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা
ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই/বোনের পদাবলী	ভেঝুর	ইয়াগোসি/ খেমাসে	পারাংলা
খালাত বোনের পদাবলী	বে	নিমাসে	আবই/ আকই
খালাত ভাইয়ের পদাবলী	ভেই	নিংসে	আতা/ আকই
বোনের (খালাত/আপন) মেয়ের পদাবলী	বোন-ঝি	টুমাসে	বাগিনি
বোনের (খালাত/আপন) ছেলের পদাবলী	বোন পুট	টুসে	বাগিনা

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

৬.৮ পদাবলী পরিবর্তনের কারণ

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষণীয়। কিছু প্রভাবকের কারণে পদাবলীর ক্ষেত্রে পরিবতন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া চলমান। সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে প্রতীয়মান হয় যে বৃহৎ সমাজের সাথে মিথস্ক্রিয়া করার ফলে পদাবলী পরিবর্তন হচ্ছে। এছাড়া সমাজ পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সামগ্রিক জীবনে পরিবর্তন আসছে। জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে ভাষা মূখ্য বিষয়। অধিকন্তু ভাষার সাথে পদাবলীর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভাষাগত তারতম্য পদাবলীতে প্রভাব রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের ভাষার গভীর কাঠামোতে এক ধরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায় যা তাদের জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রেও বেশ লক্ষণীয়। তবে নৃগোষ্ঠীসমূহের মাঝে যোগাযোগের সাধারণ ভাষা হল বাংলা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাকমারা মারমা ভাষা, আর মারমারা চাকমা ভাষা রপ্ত করে স্বাভাবিকভাবে। পাশাপাশি বসবাস করার কারণে পারস্পরিক যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে এমনটা হয়। যাহোক, বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যায় চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যগত ভাষার পরিবর্তে সাধারণ যোগাযোগের বেলায় বাংলা ভাষা বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাঝে আন্তঃগোষ্ঠীগত যোগাযোগের জন্য সাধারণ ভাষা হল বাংলা।

পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ ভাষা ব্যবহার করতে হয় যা পদাবলীতে পরিবর্তনের জন্য দায়ী। এছাড়া স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা বা ইংরেজি হওয়ার কারণে নিজস্ব পদাবলীর পরিবর্তে আংকেল আন্টি ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিকায়নের প্রভাবে নিজস্ব সংস্কৃতির বাহিরে নতুন কিছু করাকে রসবোধপূর্ণ ভাবছে তরুণ প্রজন্ম। এর কারণে নিজস্ব ভাষাগত পদাবলীর পরিবর্তে অধিক প্রচলিত বাংলা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী গ্রহণ করছে অনেকে। উল্লেখযোগ্য আরেকটি বিষয় যা পদাবলী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জড়িত তা হল জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ মাত্রা হ্রাস ও সম্প্রদায় থেকে দূরে এমন স্থানে বসবাস করা যেখানে অন্য গোষ্ঠীর বসবাস বেশি। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় নিজস্ব সম্প্রদায় থেকে দূরে থাকার কারণে ব্যক্তি নিজস্ব গোষ্ঠীর সাথে নিজস্ব পদাবলীর মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়া করতে পারেনা, ফলে নিজস্ব জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী ধীরে ধীরে ব্যক্তির কাছে অপ্রচলিত মনে হয় এবং ব্যক্তি নিজের সংস্কৃতির পদাবলী ভুলে মূলধারার পদাবলীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। প্রজন্মগত দূরত্বও পদাবলী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

৬.৯ জ্ঞাতির ভূমিকা ও দায়িত্বে পরিবর্তন

জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীতে পরিবর্তনের কারণে জ্ঞাতির ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকেনা বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়। যেমন চাকমা ও ত্রিপুরা সমাজে ক্রস কাজিন বিবাহ তথা বাবার বোনের অথবা মায়ের ভাইয়ের মেয়ে বা ছেলেকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত ছিলনা। অন্যদিকে প্যারালাল কাজিন বিবাহ অর্থাৎ মায়ের বোনের অথবা বাবার ভাইয়ের মেয়ে বা ছেলেকে বিবাহ করার রীতি নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজে প্রচলিত ছিলনা পূর্বে। এসব কাজিনদেরকে ভাই-বোনের দৃষ্টিতে দেখা হত। কিন্তু বর্তমানে এ সমাজসমূহে ক্রস কাজিন ও প্যারালাল কাজিন বিবাহ প্রথা সীমিত আকারে চালু হচ্ছে (এর কারণ পরিবার ও বিবাহ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) যা জ্ঞাতিসম্পর্কের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা ও দায়িত্বে পরিবর্তন নিয়ে আসছে। পূর্বে একজন ব্যক্তির সাথে তার ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিল কেবলমাত্র ভাই-বোনের সম্পর্ক সেখানে ক্রস কাজিন ও প্যারালাল কাজিন বিবাহ চালু হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্ক বেয়াই-বেয়াইনে রূপান্তরিত হচ্ছে যা নতুন ধরণের দায়িত্ব আরোপ করছে।

যাহোক, নিম্নে নৃগোষ্ঠীসমূহের আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল-

সারণী ৬.৫৬: জ্ঞাতিসম্পর্কের আন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা
সম্পত্তির উত্তরাধিকার	চাকমাদের মধ্যে পিতা থেকে পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়। কন্যা সন্তান প্রথাগতভাবে সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করেনা, তবে বাবা বা স্বামীর সম্পত্তি কিছু অবস্থা বিবেচনায় পেয়ে থাকে।	মারমাদের মধ্যে সম্পত্তির মালিকানার ধারণা বাংলাদেশের মূলধারার সমাজ ব্যবস্থার মতই। এখানে পিতার সম্পত্তি পুত্র পেয়ে থাকে। কখনো কখনো মেয়েকে কিছু সম্পত্তি দেয়া হয়। মায়ের মালিকানাধীন সম্পত্তি প্রায় সব ক্ষেত্রেই মেয়ে পেয়ে থাকে।	ঐতিহ্যগতভাবে এখানে সম্পত্তির বন্টন মূলধারার হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা। এ সমাজে বংশ গণনা যদি মায়ের *দফা* থেকে হয় তবে মায়ের সম্পত্তির মালিকানা পায় কন্যা। বাবার *দফা* থেকে বংশ গণনা করা হলে পুত্র বাবার সম্পদের মালিক হয়।
বিপদাপদে সহায়তা প্রদানকারী	চাকমা সমাজে বিভিন্ন বিপদাপদে প্রধানত সাহায্য করে নিজ সম্প্রদায়। মাতার চেয়ে পিতার দিকের জ্ঞাতিরা বিপদাপদে সাহায্য-সহযোগিতা করে।	মারমা সমাজেও বিপদাপদে সাধারণত সাহায্য করে নিজস্ব সম্প্রদায়। জ্ঞাতিদের মধ্যে পিতামাতার জ্ঞাতিরা বেশি সহযোগিতা করে।	ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ বিপদে পড়লে সম্প্রদায়ের লোকেরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ সমাজেও পিতার দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা বেশি।
জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক	চাকমা সমাজে পিতার দিকের জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক বেশি।	মারমা সমাজে পিতা-মাতা উভয় দিকের জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক বেশি।	ত্রিপুরা সমাজে মায়ের দিকের জ্ঞাতির সাথে সুসম্পর্ক বেশি।
সামাজিক সুসম্পর্ক	সমাজ জীবনে নিজস্ব	মারমাদের নিজস্ব	ত্রিপুরাদের জীবন অধিক

বিষয়বস্তু	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা
	চাকমা সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে ভাল যোগাযোগ আছে।	সম্প্রদায়ের সদস্যদের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মারমারা অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ বাঙ্গালীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।	সংগ্রামী বিধায় সমাজ জীবনে বাস্তবতার নিরিখে সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক বঝায় রাখা হয়।
পরিভ্রমণ	অতীতের তুলনায় বর্তমানে জ্ঞাতিকে পরিভ্রমণ করার প্রথা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। চাকমারা জ্ঞাতির সাথে দেখাসাক্ষাতের পরিবর্তে যোগাযোগকে প্রাধান্য দিচ্ছে ইদানিংকালে।	মারমাদের মধ্যেও জ্ঞাতিকে সরাসরি দেখার প্রথা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে মোবাইল যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞাতির খোঁজ নেয়ার প্রথা বেশি চর্চা হচ্ছে।	ত্রিপুরাদের মধ্যে পরিভ্রমণ ইদানিংকালে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর অন্যতম কারণ হল পরিভ্রমণের অসুবিধা।
যোগাযোগ মাধ্যম	বর্তমানে মোবাইল, ইন্টার্নেট যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।	মোবাইল, ইন্টার্নেট পূর্বের ডাক ব্যবস্থার স্থান দখল করে নিয়েছে।	পূর্বে ডাকা যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে মোবাইল যোগাযোগ বেশি।
জ্ঞাতিত্বের বন্ধন	জ্ঞাতিত্বের বন্ধন আগের মত ভাল আছে বলে মনে করে।	জ্ঞাতিত্বের বন্ধনে নতুন মাত্রা যোগ হলেও আন্তরিকতা আগের মতই আছে।	কিছু সদস্য মনে করে বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে দিন দিন।
বিবাদ নিষ্পত্তি	বিবাদ নিষ্পত্তিতে পিতার দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা	মারমাদের মধ্যে বিবাদের অনুপাত কম হলেও	ত্রিপুরাদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তিতে মায়ের দিকের

বিষয়বস্তু	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা
	বেশি। তবে মায়ের দিকের জ্ঞাতির ও ভূমিকা আছে।	নিষ্পত্তিতে পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতি ভূমিকা রাখে।	জ্ঞাতির চেয়ে পিতার দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা বেশি।
আর্থিক সংকট মোকাবেলা	চাকমাদের মধ্যে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় পিতার দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা বেশি হলেও মায়ের দিকের জ্ঞাতিরও ভূমিকা রয়েছে।	মারমাদের মধ্যে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা রয়েছে।	ত্রিপুরাদের মধ্যে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় পিতার দিকের জ্ঞাতির ভূমিকা বেশি।
সামাজিক লেনদেন	সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চাকমারা নিজের সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেয়।	মারমারা সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মারমা সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেয়।	ত্রিপুরা দেনদেন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেয়।
উপহার	পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পিতার দিকের জ্ঞাতিকে বেশি উপহার দেয় ও পিতার জ্ঞাতি থেকে বেশি উপহার পায়।	মারমা সমাজে পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতি থেকে উপহার গ্রহণ করে ও প্রদান করে।	ত্রিপুরা সমাজে পিতার দিকের জ্ঞাতি থেকে বেশি উপহার গ্রহণ ও প্রদান করে।
জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী	জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেণী বিভাজন প্রাধান্য পায়।	মারমা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে বার্মিজ পদাবলী বেশ লক্ষণীয়।	ত্রিপুরা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পিতামাতার বিভাজনের চেয়েও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ।

(উৎসঃ মাঠকর্ম ২০১৮)

যাহোক, বর্তমান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ করা গেছে যে বিশ্বায়ন, নগরায়ন, আধুনিকায়ন ও অভিগমনের ফলে নৃগোষ্ঠীসমূহের জ্ঞাতিসম্পর্ক ও পদাবলী পরিবর্তন হচ্ছে। মাঠকর্মের সময়কালে দেখা গেছে বর্তমান প্রজন্মের অনেকে জ্ঞাতির ঐতিহ্যগত পদাবলী জানেনা। শুধু তাই নয়, অনেকে বাংলাদেশের মূলধারার বাঙ্গালী সমাজের পদাবলী যেমন ব্যবহার করছে আবার ইংরেজি পদাবলিও ব্যবহারও করছে, যেমন আংকেল, আন্টি ইত্যাদি। এটা অবাক করা বিষয় যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহে প্রথাগত জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন পরিবর্তন হয়ে নতুন মাত্রা পাচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহ জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে ভৌগোলিকভাবে পাশে অবস্থান করা বাঙ্গালী সমাজকে অনুসরণ না করে বিদেশী পদাবলী অনুসরণ করছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। এর অন্যতম কারণ হল আকাস সংস্কৃতি ও উপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাব। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাঝে নিজস্ব ভাষার ব্যবহার কমার ফলে জ্ঞাতিসম্পর্কের মাত্রা ও পদাবলীর ব্যবহারও কমছে। নিজস্ব ভাষায় জ্ঞাতিকে ডাকার মাঝে এক ধরণের আন্তরিকতা বিদ্যমান যা অন্য ভাষা থেকে ধার করা পদাবলীর ক্ষেত্রে নেই। বর্তমান অধ্যয়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী পরিবর্তন হওয়ার সাথে বন্ধন ও আন্তরিকতাও পরিবর্তন হচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

৭.১ উপসংহার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ধারাবাহিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই নৃগোষ্ঠীসমূহ নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচার-প্রথা ও রীতিনীতি যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছে। মূলধারার বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর সাথে এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দিয়ে বাংলাদেশকে বহু সংস্কৃতির দেশে পরিণত করেছে। মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও স্বতন্ত্র জীবনাচারণের কারণে গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হচ্ছে এ জনগোষ্ঠী। উপনিবেশিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজ গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু দখল করে আছে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি। সমতল এলাকা থেকে ভৌগোলিকভাবে স্বতন্ত্র হওয়ায় কারণে পার্বত্য অঞ্চলে এক বিশেষ সংস্কৃতির দেখা পাওয়া যায় যা নানাবিধ নৃগোষ্ঠীর সন্নিবেশের ফসল। এদের আলাদা ভাষা, ঐতিহ্য, বিবাহ, পরিবার ব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাধারণ চিন্তা-চেতনা, জ্ঞাতিসম্পর্ক, সমাজ পরিচালনার নীতি, ও শিল্প-সাহিত্য বাংলাদেশকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছে। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজের পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে আন্তঃসাংস্কৃতিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আন্তঃসাংস্কৃতিক ও তুলনামূলক গবেষণার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সাধারণীকীকরণ, যার মাধ্যমে তুলনা সম্ভব হয়ে উঠে। এ ধরণের গবেষণা একবারেই অপ্রতুল। এতে নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজ সংস্কৃতি ও জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে তুলনামূলক উপায়ে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠী থেকে আলাদা তথ্য সংগ্রহ করে নিঘুঢ় বর্ণনার সাহায্যে প্রত্যেক চলকের মাধ্যমে আলাদা আলাদা তথ্য উপস্থাপন করে শেষে তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে। অন্তঃসারপূর্ণ তুলনামূলক উপস্থাপনের ফলে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি, জ্ঞাতিত্ব অধ্যায়নে নৃবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা বিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রস এর পার্বত্য চট্রগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে ১৯৫২ সালে পরিচালিত গবেষণার সাথে তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এর ফলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার ধরণ, পদাবলী ও পরিবর্তন উপলব্ধি করা সহজ হয়েছে। প্রতিবেশী বৃহত্তর সমাজ, ধর্মান্তর, আধুনিক শিক্ষা, ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধকরণ, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়ন, ভূমি মালিকানা ও ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর এর প্রভাব এবং পেশার ধরনে পরিবর্তন ইত্যাদি উপাদানের প্রভাবে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জীবন প্রণালীতে নানাভাবে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর

Dhaka University Institutional Repository

সমাজব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক, পরিবার, জ্ঞাতিসম্পর্ক, ধর্ম, রাজনীতি, উৎপাদন প্রণালী ও বাজার ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন হয়ে একটি জটিল সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর হয়েছে। এই পরিবর্তনের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং বিশ্বায়ন। সমাজ উন্নয়নের কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য অঞ্চলে সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর কৌশলগত কারণে গুরুত্বারোপ করা হয়। এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলশ্রুতিতে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জনজীবনে কিছু সুযোগ যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি কিছু সমস্যা ও চোখে পড়ার মত। যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে অন্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অভিগমন যেমন বেড়েছে তেমনি পর্যটনের নামে সমতলের অধিবাসীরা এদের লোকালয়ে ভিড় করছে। পাশাপাশি বৃহৎ সমাজের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে বৃহৎ উপাদান দ্বারা নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের ভাষা। বর্তমান অধ্যয়নের মাঠকর্মের সময়ে দেখা গেছে বর্তমান প্রজন্মের অনেকে নিজস্ব ভাষা ভালকরে বলতে পারেনা। মূলধারার সাথে মেশার জন্য বাংলা ভাষা শিখতে হচ্ছে। জীবনমান উন্নয়নের জন্য চাকুরি, অভিগমন ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন এবং উপলব্ধি করতে পেরেছে। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের মাঝে চাকমাদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা তুলনামূলক বেশি থাকার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হার বেশি। মারমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যেও দিন দিন শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের একটি অংশ জীবনমান উন্নয়নের জন্য শিক্ষাগ্রহণ ও চাকুরির দিকে ঝুঁকছে। চাকুরি ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য তাদেরকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিখতে হচ্ছে। ফলে অনেকে নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজিকে অধিক সহায়ক ভাবছে। সমাজ নৃবিজ্ঞানী হার্বাট স্পেন্সারের পরীক্ষিত মতবাদের পরিপূর্ণ বা আংশিক মিল পাওয়া যায় এ সমাজসমূহে। তিনি বলেছিলেন মানব সমাজ সহজ সরল অবস্থা থেকে জটিল রূপ ধারণ করে। এ সমাজসমূহও ক্রমাগতভাবে সরলতর অবস্থা থেকে জটিল রূপ ধারণ করছে। পরিবর্তনের ফলে কিছু সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। নতুনভাবে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায় হল কৃষি ব্যবস্থা। পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষি উৎপাদন বাংলাদেশের মূলধারা থেকে আলাদা। এখানে সিংহভাগ কৃষি উৎপাদন আসে জুম চাষ থেকে। এই জুম চাষকে কেন্দ্র করে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের সর্বাঙ্গীন জীবন পরিচালিত হয়। জুমের চাষে তাদের জীবন এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে জুম চাষ ব্যতিরেকে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা উপলব্ধি করা

Dhaka University Institutional Repository

কার্যত অসম্ভব। ঐতিহ্যগতভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ জুমের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহসহ দৈনন্দিন বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করে আসছে। জুম চাষের শুরু থেকে শেষ অবধি কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। জাতিগতভাবে চাকমা ও মারমারা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী হলেও জুম চাষের সাথে ধর্ম নিবিড়ভাবে জড়িত হওয়ার কারণে জুম চাষ কেন্দ্রিক নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। মূলধারার সনাতনী হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসের সাথে জুম কেন্দ্রিক বিশেষ ত্রিপুরা ধর্ম তৈরি হয়েছে যা মূলধারা থেকে কিছুটা পৃথক। বর্তমান গবেষণা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মনে করে ভূমি কেন্দ্রিক জীবন যাত্রা এই নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে নতুন ধরণের ধর্ম বিশ্বাস তৈরি করছে যেন ধর্ম এখানে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলেমিশে একাকার।

পার্বত্য অঞ্চলের জৈব বৈচিত্র ও পরিবেশের সাথে জুম চাষ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। জুম চাষের ক্ষেত্রে আধুনিক চাষাবাদ সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিবর্তে লোকজ জ্ঞান ব্যবহার করা হয়। ঐতিহ্যবাহী এ চাষবাদ কৌশলের ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান যেমন খুবই কম ব্যবহার করা হয় তেমনি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিও কম ব্যবহার করা হয়। তবে দিন দিন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন খাগড়াছড়ি এলাকার অনেক কৃষি জমি সমতল বা আংশিক সমতল হওয়ার কারণে কৃষি চাষাবাদে ত্রিপুরারা ট্রাক্টর, সার, কীটনাশক ইত্যাদি আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করছে। তবে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার মাটি পাহাড়ী হওয়ার কারণে মারমা ও চাকমারা প্রথাগত উপায়ে জুম চাষ করছে। বর্তমান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এটা পরিস্ফুটিত হয়েছে যে কৃষি উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পেয়ে জীবনযাত্রা হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে। উন্নয়নের জন্য সরকার ও সরকারি সংস্থাসমূহ খাগড়াছড়ি জেলার ত্রিপুরাদের জমি অধিগ্রহণ করেছে ফলে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সরকারীভাবে জুম চাষ নিষিদ্ধ করার কারণে জুম চাষের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। অনেকটা গোপনীয়ভাবে ও ভয়ে ভয়ে জুম চাষ হচ্ছে যা চূড়ান্তভাবে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের জীবন-জীবিকাকে সংকীর্ণ করেছে। পরিবেশের উপর জুমের বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে জুম চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে জুম চাষের পরিবেশগত তেমন প্রভাব নেই। অধিকন্তু এই চাষাবাদ পদ্ধতি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সম্পূর্ণ জৈবি-প্রাকৃতিক উপায়ে ফসল উৎপাদন করে। বর্তমান গবেষণা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে একমত হয়ে এই দাবী উপস্থাপন করে যে জুম চাষের পরিবেশগত কি ধরণের প্রভাব হয় বা বাস্তুসংস্থান পুনঃমুল্যায়ন করে জুম চাষের উপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে পুনঃবিবেচনার জন্য।

চাকমাদের ঘরের ধরণে পরিবর্তন এসেছে। ঐতিহ্যগতভাবে চাকমারা বনজ কাঠ ও বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি করত। ছাউনি হিসাবে লতাগুল্ম বা শন ব্যবহার করত। কিন্তু বর্তমানে ছাউনি হিসাবে ব্যাপকহারে টিন ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে। তিন নৃগোষ্ঠির মধ্যে মারমা গৃহ নির্মাণশৈলি সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মারমা ঘর মাটি থেকে কিছুটা উপরে মাচার মত করে তৈরি করা হয়। মারমা ঘর তৈরিতে ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক নির্মাণশৈলি ও উপাদানের মিশ্রণ বেশ লক্ষণীয়। ত্রিপুরাদের ঘর অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে ঘর নির্মাণ করা হয়। ত্রিপুরাদের ঘরের সাথে চাকমা ঘরের মিল রয়েছে। যারা অভিগমন ও চাকুরিসহ অন্য উপায়ে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হচ্ছে তারা ঐতিহ্যগত ঘৃহ নির্মাণ কৌশল থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক উপকরণ যেমন সিমেন্ট, ইট ইতাদি সম্বলিত ঘর তৈরি করছে। তাই নৃবৈজ্ঞানিক নিঘুঢ় মাঠ গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রতি হুমকি হিসাবে দেখা দিচ্ছে। ফলে বতমান গবেষণা এই দাবী উথাপন করে যে উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে যেন সহায়ক হয়। তিন নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়- সামাজিক সুসম্পর্ক ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেয়া। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠী সমাজে যুথবদ্ধভাবে বসবাস করে। ঐতিহ্যগত বিনিময় ব্যবস্থা এখন আর নেই বলা চলে। আধুনিক বাজার ব্যবস্থা ও মুদ্রা ঐতিহ্যগত বিনিময় ব্যবস্থার স্থান দখল করে নিয়েছে ফলে বাজার নির্ভর লেনদেন হয় বেশি।

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা। বাংলাদেশের মূলধারার সমাজসমূহের মত পরিবারে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে পুরুষ সদস্য যেমন স্বামী বা বড় ছেলের হাতে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহে পিতৃসূত্রীয় বাসস্থান প্রথা অনুসারে পরিবার গঠিত হয়। পরিবারে মহিলাদের সহায়ক ভূমিকা থাকে। চাকমা সমাজে ঐতিহাবাহী পরিবারের ধরণ হল যৌথ পরিবার। কিন্তু বর্তমানে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবার বেশি প্রচলিত। তবে চাকমাদের তুলনায় মারমা সমাজে এখনো যৌথ পরিবার বেশি রয়েছে। মারমা সমাজেও দিন দিন যৌথ পরিবারের স্থানে একক পরিবার স্থান করে নিচ্ছে। কৃষি নির্ভরতা হ্রাসের কারণে ত্রিপুরা সমাজে ইদানিংকালে একক পরিবার খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গঠনের ফলে পরিবারের আকার ছোট হচ্ছে ক্রমাগত। কিছু অন্ত ও বহি চলক যেমন শিক্ষা, আধুনিকতা, বিশ্বায়ন, স্বনির্ভরতা, বিকল্প উৎপাদন কৌশল অভিগমন ইত্যাদির কারণে পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তিন সমাজেই এক বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। একের অধিক বিবাহ করলে সমাজ তাকে তিরস্কার করে। তবে কিছু অবস্থা বিবেচনায় একজন পুরুষ এক স্ত্রী জীবিত থাকা সত্বেও আবার বিবাহ করতে পারেন। এগুলো হল- স্ত্রী শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ হলে, ব্যবিচারিণী হলে, সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে। আবার একই কারণসমূহের কারণে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে মারমা বিবাহ প্রথা সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটছে ক্রমাগত। তাই

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় বিবাহের অনুষ্ঠানে হিন্দি গান ও নাচ চর্চা করে কেউ কেউ। বর্তমানে পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে প্রণয়ঘটিত বিবাহের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতেও প্রণয়ঘটিত বিবাহের অস্তিত্ব ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহে। কিন্তু আত্ম কেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা, নিজস্ব পছন্দকে অধিক গুরুত্বদান, সহজলব্য মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা, পারিবারিক বন্ধন হ্রাস ইত্যাদি কারণে এর মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবাহের ক্ষেত্রে দরকষাকষি বা বিনিময় ব্যবস্থা আছে মোটামুটিভাবে *দাবা* বা *দাফা/ দাপা* নামে বেশ পরিচিত চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজে। এটি মূলত বিবাহের ক্ষেত্রে বরপক্ষ কর্তৃক কনেপক্ষকে উপহার প্রদান প্রথা। বিবাহের বিনিময় ব্যবস্থায় এতকাল মেয়েপক্ষ গুরুত্ব পেয়ে থাকলেও মূলধারার বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ত্রিপুরাদের মধ্যে যৌতুকের চর্চা শুরু হয়েছে। তাই বর্তমান গবেষণা এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে রুখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানায়।

জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার অন্যতম উপাদান হল বংশগণনা যার মাধ্যমে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়। বর্তমান গবেষণায় জ্ঞাতিসম্পর্ককে Alliance Theory (মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব) ও Descent Theory (বংশ তত্ত্ব) এর আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। Alliance Thoery (মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব) এর আলোকে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জ্ঞাতিসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়- এ সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের মৌল উপাদান হল পরিবার যা বিবাহের মাধ্যমে গঠিত হয়। এ সমাজসমূহে বিবাহের মাধ্যমে জ্ঞাতিসম্পর্ক তৈরি হয় যা এক পর্যায়ে উত্তরাধিকার নির্ণয়ে কাজ করে। একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সবাই একে উপরের সাথে উত্তরাধিকার বা বংশগতভাবে যুক্ত নয়। এর বিশেষ কারণ হল উত্তরাধিকার বা পুর্বপুরুষ নির্ধারিত হয় একের সাথে অপরের জ্ঞাতিসম্পর্কের মাত্রার ভিত্তিতে। তাই এ সমাজসমূহে দেখা যায়, একের সাথে অন্যের বংশলতা নিরুপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের নৈকট্য গুরুত্বপূর্ণ। সব জ্ঞাতি যেমন উত্তরাধিকার নয় তেমনি পূর্বপুরুষও নয়। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার কারণে উত্তরাধিকার ও পূর্বপুরুষ নিরুপন পদ্ধতি পিতার দিকের জ্ঞাতি কেন্দ্রিক। ফলে এ সমাজসমূহে Alliance Theory (মৈত্রীবন্ধন তত্ত্ব) এর মূল বক্তব্যের আলোকে জ্ঞাতিসম্পর্ক তৈরি হলেও বংশগণনা ও উত্তরাধিকার নিরুপনের ক্ষেত্রে Descent Theory (বংশ তত্ত্ব) অনুসরণ করা হয়।

এই তিন সমাজের বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুত্রকে গুরুত্বদানের ক্ষেত্রে। যদিও পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির মালিকানা সমতলের মত নয়। এখানে ভূমির মালিকানা বলতে অনেকাংশে কেবলমাত্র ভোগ দখলের অধিকারকে নির্দেশ করে। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সমাজে পিতা থেকে পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কন্যা সন্তান প্রথাগতভাবে সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করেনা, তবে বাবা বা স্বামীর সম্পত্তি কিছু অবস্থা বিবেচনায় পেয়ে থাকে। স্বামীর মৃত্যুর পর বড় ছেলে সম্পদের মালিক সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে মা কেবল মাত্র প্রতীকী মালিকের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালন করে। যেমন- ছেলে সন্তান চাইলে পিতার অবর্তমানে সম্পদ নিজের খুশি মত বিক্রি করতে পারে মায়ের সম্মতি ছাড়া। কিন্তু পুত্র সাধারণত পৈত্রিক সম্পদ ক্রয় ও বিক্রির সময় মায়ের সম্মতি যেমন নিয়ে থাকে তেমনি মায়ের সাথে পরামর্শ করে। কিন্তু মা চাইলে তার স্বামীর অবর্তমানে সম্পদ বিক্রি করতে পারেনা। ত্রিপুরা সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে সম্পত্তির বন্টন মূলধারার হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা। ত্রিপুরা সমাজে বংশগণনা যদি মায়ের *দফা* থেকে করা হয় তবে মায়ের সম্পত্তির মালিকানা পায় কন্যা। আর বাবার *দফা* থেকে বংশগণনা করা হলে পুত্র বাবার সম্পদের মালিক হয়।

অতএব নৃগোষ্ঠী সমাজসমূহে জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন অতীতের মতই আবদ্ধ আছে বলে অধিকাংশ অধিবাসী মনে করে। তবে কিছু অধিবাসী মনে করে ক্রমাগতভাবে জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে। কার্যত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, প্রথাগত উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন, যোগাযোগ ও সামাজিক আদান-প্রদান হ্রাসের কারণে জ্ঞাতিত্বের বন্ধন হ্রাস পাচ্ছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে। বাজার নির্ভর উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থার কারণে অধিবাসীদের ব্যস্ততা অনেকাংশে বৃদ্ধি হওয়ায় জ্ঞাতির সাথে যোগাযোগ ও পরিভ্রমণে নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। অধিকন্তু আধুনিক জৌলুশ ভোগ-দখলের কামনা ব্যক্তিকে করে তুলছে আত্ম কেন্দ্রিক যা চুড়ান্ত পরিণামে জ্ঞাতির সাথে দূরত্ব তৈরি করছে। চাকমা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয় জ্ঞাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাজন প্রাধান্য পায়। মারমা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে বার্মিজ ভাব বেশ লক্ষণীয়। ত্রিপুরা সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলীর ক্ষেত্রে পিতামাতার দিকের জ্ঞাতির বিভাজনের চেয়েও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সামজিক যুথবদ্ধতা মানব সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সমাজের কাঠামোসমূহের যথাযথ কার্যক্রম থাকা জরুরি। পরিবার ও বিবাহ মানব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা থেকে সমাজ গঠিত হয়। পারিবারিক শিক্ষা ও মুল্যবোধ সমাজের কাংখিত সদস্য হয়ে বসবাস করতে সহায়তা করে। ক্ষুদ্র বা একক পরিবারের চেয়ে যৌথ পরিবারে শিক্ষার পরিসর বড়। চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের মাঝে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া রোধ করতে পারিবারিক বন্ধন বৃদ্ধি করার জন্য বর্তমান গবেষণা জোর দিচ্ছে। পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্ম কেন্দ্রিক চিন্তার পরিবর্তে সামগ্রিক চিন্তা চেতনা ধারণ ও লালন করা উচিত বলে বর্তমান গবেষণা মনে করে। সমাজে সহাবস্থান ও সংহতি রক্ষা করার জন্য জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন মজবুত রাখা অতিব জরুরি। জ্ঞাতিত্বের বন্ধন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হল পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা। তাই বর্তমান গবেষণা জ্ঞাতিত্বের বন্ধন সুসংহত করার জন্য পারিবারিক বন্ধনের উপর জোর দিচ্ছে। শিক্ষায়ন, আধুনিকায়ন, নগরায়ন, বিশ্বায়ন, অভিগমন

Dhaka University Institutional Repository

এবং সাংস্কৃতিয়ান এমনভাবে হতে হবে যেন তা ঐতিহের জন্য হুমকি না হয়ে বন্ধু হয়। তবেই চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কাংখিত উন্নয়ন যেমন হবে তেমনি ঐতিহ্যগত বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

যাহোক, নৃবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির আলোকে পরিচালিত বর্তমান গবেষণা কর্মে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবার ও বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্কের বিষয়াবলী খুব কাছ থেকে নিবিড়ভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যয়নটি মনে করে মানব সমাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহকে আরো গভীর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষণা করে তাদের জীবন প্রণালী নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

অন্তরা, সাদিয়া আফরিন (২০১৮), বৈচিত্রময় চাকমা বিবাহ রীতি, বার্তা প্রতিক্ষণ।

ইসলাম, মোহাম্মদ রফিকুল (২০১৫), ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মারমা সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও পরিচিতি, বান্দরবান।

ত্রিপুরা, শান্তনু (২০১৭), ত্রিপুরা জাতি, ঢাকা, জুমজার্নাল।

এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ (১৯৭৭), পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, মস্কো, প্রগতি প্রকাশনী।

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল (১৯৯১),পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, রাঙ্গামাটি।

ত্রিপুরা, প্রভাংশু (১৪১০ ত্রিপুরাব্দ), ত্রিপুরা জাতির মানিক্য উপাখ্যান, ঢাকা।

ত্রিপুরা, প্রভাংশু (১৪১০ ত্রিপুরাব্দ), ত্রিপুরা জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বলাকা প্রকাশন

ত্রিপুরা, প্রভাংশু (১৪১১ ত্রিপুরাব্দ), খাগড়াছড়ির ইতিহাস, বলাকা প্রকাশন।

ত্রিপুরা, প্রভাংশু (১৯৯৯), ত্রিপুরার লোককাহিনী, বলাকা প্রকাশন।

ত্রিপুরা, শোভা (২০১৭), ত্রিপুরা জাতি, উত্তরণ প্রকাশনী।

ত্রিপুরা, প্রশান্ত (১৯৯২), সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতা ও আত্ম পরিচয়ের সংকট: বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা ৪৬, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

ত্রিপুরা, শোভা, (২০১৮), ত্রিপুরা জাতির ইতিবৃত্ত, বলাকা প্রকাশন।

ত্রিপুরা, প্রশান্ত (১৯৯৩), পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসত অনুসন্ধান বিষয়ে, হাফিজ উদ্দিন খান সম্পাদিত, বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী: অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত, বাংলাদেশ উপজাতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ।

ত্রিপুরা, পপেন (২০১৬) আদিবাসী জনগোষ্ঠী: জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ঢাকা, জুম জার্নাল

কামাল, মেসবাহ, ইসলাম, জাহিদুল এবং চাকমা, সুগত, আদিবাসী জনগোষ্ঠী (২০০৭), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

খোকন, সালেক (২০১৮), ত্রিপুরা বিয়ে: জলপূর্ণ কলস নৃত্য আনন্দ উদযাপনের প্রতীক, ঢাকা।

খান, আবদুল মাবুদ, বান্দরবান জেলার মারমা সম্প্রদায়, বাংলা একাডেমি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষ, সতীশচন্দ্র (১৯০৯), চাকমা জাতি, কলিকাতা।

চাকমা, সঞ্জীব (২০১১), চাকমা জাতির পরিচয় বৃত্তান্ত, ঢাকা।

চাকমা, সুপ্রিয় (২০১৭), চাকমাদের বৈচির্ত্যময় জীবনাচার, বিডি টাইমস, বান্দরবান।

চাকমা, শরবিন্দু শেখর, (২০১১), চাকমা জাতির ইতিহাস, অনুভূতি প্রকাশনী।

চাকমা, মাধবচন্দ্র (১৯৪০), রাজনামা, চট্টগ্রাম।

চাকমা, সুগত (১৯৮৩), চাকমা পরিচিতি, রাঙ্গামাটি।

বল, কুমার প্রীতীশ, মারমা জাতির কথা, ন্যাশনাল পাবলিকেশন।

বল, কুমার প্রীতীশ, বাংলাদেশের আদীবাসী, কমন পাবলিকেশন।

বল, কুমার প্রীতীশ, ত্রিপুরা উপজাতি রূপকথা, কমন পাবলিকেশন।

বল, কুমার প্রীতীশ, ও রহমান, আ. ন. স. হাবীবুর, আদিবাসী রূপকথা, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ (২০০১), বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনজাতি।

বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ (১৯৮১), পূব-ই রাবাইনিসাল।

বুলবুল, আজাদ (২০১৪), পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজাতি ও সংস্কৃতি গবেষণা : দুইশ বছরের বৃত্তান্ত, নির্বানা।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম (২০১৩), বাংলাদেশের আদিবাসীঃ এথনোগ্রাফিয় গবেষণা, উৎস প্রকাশন।

বাংলাদেশ সরকার, আদবাসীদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বর্ণনা, http://baliadangi.thakurgaon.gov.bd/sites/default/files/files/baliadangi.thakurgaon.gov.bd/law_policy/a9454439_1901_11e7_9461_286ed488c766/Adi.pdf

মারমা, অংগ প্রু, (২০১৫), মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি, পাহাড়ের আলো।

মারমা, উথোয়াই (২০১৬), আদিবাসী জনগোষ্ঠী মারমা সম্প্রদায়, বান্দরবান নিউজ।

মারমা উ, (২০১৫), মারমা, বাংলাপিডিয়া।

মজিদ, মুস্তাফা, মারমা জাতিসত্তা, মাওলা ব্রাদার্স।

দেওয়ান, বিরাজমোহন (১৯৬৯), চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি।

Dhaka University Institutional Repository

দি সিএইচটি এক্সপ্রেস (২০১৮), চাকমা উপজাতি : সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা।

দেববরিয়া, দেবব্রত (১৯৬১), ত্রিপুরা আদিবাসী : সমাজ ও সংস্কৃতি, অক্ষর পাবলিকেশন্স।

দাস, নির্মল (২০০৩), ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, অক্ষর পাবলিকেশন্স।

দ্রং, সঞ্জীব (২০০৪), বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

নোমান, মোহাম্মাদ আবু (২০১৭), পরিবার মানুষের প্রথম শিক্ষালয়, আলোকিত বাংলাদেশ।
http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/219482/2017/05/15

রায়হান, বজলুর (২০১৮), মারমা সম্প্রদায় বৈচিত্রময় সংস্কৃতি ও শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠী, দৈনিক ডেসটিনি, ঢাকা।

রকমারি (২০১২), বৈচিত্রময় চাকমা বিবাহ রীতি, রকমারি, ঢাকা।

রায়, ভুবনমোহন (১৯১৯), চাকমা রাজবংশের ইতিহাস, রাঙ্গামাটি।

লাভলু, নিজামউদ্দিন (২০১৪), আধুনিকতার স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি সংস্কৃতি, দৈনিক ইত্তেফাক।

লেউইন, টমাস হারবার্ট, (২০১৭), চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও অধিবাসী, দিব্য প্রকাশ।

সারথী, অগ্নী (২০১৪), মারমা জাতিস্বত্ত্বার জীবন কথা, সাম হোয়ারইন, ঢাকা।

Aginsky, B. W. (1935), Mechanics of Kinship (American Anthropologist, Vol. 37, pp. 450-57, 1935).

Ahsan, S. (1993). The Marmas of Bangladesh, HRDP of Winrock International, BARC.

Aziz, K. M. A. (1979) Kinship in Bangladesh, International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh.

Barnes, J. A. (1961). "Physical and Social Kinship". Philosophy of Science. 28 (3): 296–299. doi:10.1086/287811.

Barnes, J. A. (1971). Three styles in the study of kinship. London: Tavistock.

Barnes, J. A. (John Arundel) (1971). Three styles in the study of kinship. Tavistock, London.

Bessaignet, P. (1958), Tribesman of the Chittagong Hill Tracts. Asiatic Society of Pakistan, Karachi.

Dhaka University Institutional Repository

Bohannan, P, and Middleton, J. (1968). Marriage, family, and residence. Garden City, NY: Natural History.

Boon, J. A. & Schneider, D. M. (1974). Kinship vis-a-vis Myth Contrasts in Levi-Strauss' Approaches to Cross-Cultural Comparison. American Anthropologist. 76 (4):799–817. doi:10.1525/aa.1974.76.4.02a00050.

Bowlby, J. (1982). Attachment. (2nd ed.). London: Hogarth.

Carsten, J. (2000). Cultures of relatedness: New approaches to the study of kinship. Cambridge University Press.

Carsten, J.(1995). The substance of kinship and the heart of the hearth. American Ethnologist. doi:10.1525/ae.1995.22.2.02a00010.

Carter, A. (1973). A Comparative Analysis of Systems of Kinship and Marriage in South Asia. Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, (1973), 29-54. doi:10.2307/3031719.

Chaudhuri, S. & Chaudhuri, B. (1983). Glimpses of Tripura. Tripura Darpan Prakashani।

Chittagong Hill Tracts District Gazzeter 1909

Clifford, J., & Marcus, G. E.. (ed) (1986), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. University of California Press, California .

Collier, J. F, and Yanagisako, S. J., eds. (1987). Gender and kinship: Essays toward a unified analysis. Stanford, CA: Stanford Univ. Press.

Collier,J., Yanagisako S. J. (1987). Gender and kinship: Essays toward a unified analysis. Stanford University Press.

Dalton, E. T. (1872). Descriptive Ethnology of Bengal, Office of the superintendent of government printing. Netherlands.

Davis, K. & Warner, W. L. (1936), Structural Analysis of Kinship. Doctoral Dissertation, Harvard University.

Denzin, N. K., &Lincoln, Y. S. (1994), Handbook of qualitative research.Sage Publications.

Di Leonardo, M, ed. (1991). Gender at the crossroads of knowledge: Feminist anthropology in the postmodern era. Berkeley: Univ. of California Press.

E. Levine, N. (2008). Alternative Kinship, Marriage, and Reproduction. Annual Review of Anthropology. 37. 10.1146/annurev.anthro.37.081407.085120.

Dhaka University Institutional Repository

Ember, C. R. and Ember, M., (2001), Cross-Cultural Research Methods. Walnut Creek, C A: AltaMira Press.

Evans-Pritchard, E. E. (1940). The Nuer: A description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people. Oxford: At the Clarendon Press.

Evans-Pritchard, E. E. (1951). Kinship and Marriage among the Nuer. Oxford: Clarendon Press.
Farber, B. (1973). Family & Kinship in Modern Society. Scott, Foresman: Glenview, IL.

Ford, C. S., and. Beach, F. A. (1951). Patterns of sexual behavior. New York: Harper.

Fortes, M. (1940). African political systems. In Evans-Pritchard, E. E., & International Institute of African Languages and Cultures. African political systems. London: Pub. for the International Institute of African languages & cultures by the Oxford University Press, H. Milford.

Fortes, M. (1969). Kinship and the social order. Chicago: Aldine.

Fox, R. (1967). Kinship and Marriage. Harmondsworth, UK: Pelican Books.

Fox, R. (1967). Kinship and marriage: An anthropological perspective. Harmondsworth, UK: Penguin.

Fox, R. (1977). Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Harmondsworth: Penguin.

Franklin, S. & McKinnon, S. (2002). Relative values: reconfiguring kinship studies. Duke University Press, Durham, NC.

Geertz, C. (2000), Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics, Princeton University.

Geertz, C. (1986). After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist, Harvard University Press.

Geertz, C. (1973). Thick Description: Towards an Interpretive Theory of Culture. New York: Basic Books.

Geertz, C. (1973, 1975). The Interpretation of Cultures. Basic Books

Geertz, C. (1975), Kinship in Bali, University Of Chicago Press.

Geertz, C. (1983), Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, Basic Books.

Geertz, C. (1988), Works and Lives: The Anthropologist As Author Stanford University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Geller, P. L., and Stockett, M. K. eds. (2006). Feminist anthropology: Past, present, and future. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press.

Gerth, H., and Mills, C. (1967), From Max Weber: Essays in Sociology. Routledge and Kegan Paul.

Godelier, M. (2011). The metamorphoses of kinship. Translated by Nora Scott. London: Verso.

Goldenweiser, A. (1929). Sex and primitive society. In Sex in civilization. Edited by V. F. Calverton and S. D. Schmalhaunsen, 53–66. New York: Macaulay.

Gomes, S. G. (1988). The Paharias: A glimpse of Tribal Life in Northwestern Bangladesh. Caritas. Dhaka.

Goody, J, ed. (1971). Kinship. Harmondsworth, UK: Penguin.

Goody, J. (1983). Kin groups: Clans, lineages and lignages. In J. Goody & L. Roper (Eds.), The development of family and marriage in Europe (pp. 222-239). Cambridge: Cambridge University Press.

Gudeman, S. F., & Rivera, A. (1995). From Car to House (Del coche a la casa). *American Anthropologist*, *97*, 242-25.

Hamilton, F, Schendel, W. B. (1992), Francis Buchanan in Southeast Bengal, 1798: His Journey to Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Noakhali, and Comilla. University Press Limited, Dhaka.

Hendry, J. (1999), An Introduction to Social Anthropology. Red Globe Press.
Hendry, J. (2016). Family, Kinship and Marriage. In Other people's worlds: an introduction to cultural and social anthropology (1999). New York University Press, New York.

Holland, M. (2012). Social Bonding and Nurture Kinship: Compatibility Between Cultural and Biological Approaches. Createspace Press.

Holy, L. (1996). Anthropological Perspectives on Kinship. LONDON: Pluto Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/j.ctt18mvnwk.

Houseman, M., & White, D. R. (1998). Network mediation of exchange structures: Ambilateral sidedness and property flows in Pul Eliya. In Schweizer, Thomas; White, Douglas R. Kinship, Networks and Exchange. Cambridge University Press.

Houseman, M., & White, D. R. (1998). Taking Sides: Marriage Networks and Dravidian Kinship in Lowland South America. . In Godelier, Maurice; Trautmann, Thomas; F.Tjon Sie Fat. Transformations of Kinship. Smithsonian Institution Press. pp. 214–243.

Dhaka University Institutional Repository

Inden, R. B. & Nicholas, R. W. (1977). Kinship in Bengali culture. Chicago : University of Chicago Press.

Islam, A. K. M. A. (1974). A Bangladesh village: conflict and cohesion : an anthropological study of politics. Schenkman Pub. Co.; [distributed by General Learning Press, Morristown, N.J.], Cambridge, Mass

Islam, Z (1986). A Garo Village in Bangladesh: A Sociological Study. Dhaka

Johnson, A. W. & Earle, T.(1987), The evolution of human societies: from foraging group to agrarian state.

Kamal M. et.al., (2007), Cultural Survey of Bangladesh Series-5: Indigenous Communities, Asiatic Society of Bangladesh, Sirajul Islam (ed.), History of Bangladesh, vol. 1 (2007), chapter Five.

Khaleque, K. (1979). Social Change among the Garo: A Study of a Plain Village in Bangladesh, Australian National University.

Lamphere, L, Helena, R, and Patricia, Z, eds. (1997). Situated lives: Gender and culture in everyday lives. New York and London: Routledge.

Lévi-Strauss, C. (1952). Kinship Systems of Three Chittagong Hill Tribes (Pakistan). Southwestern Journal of Anthropology, 8(1), 40-51. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3628553.

Lewin, E, ed. (2006). Feminist anthropology: A reader. Blackwell anthologies in social and cultural anthropology. Malden, MA: Blackwell.

Lewin, T.H. (1869),The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein. Calcutta, India.

Mair, L. (1971). Marriage. Harmondsworth, UK: Penguin.

Malinowski, B. (1922), Argonauts of the Western Pacific. Routledge.

Malinowski, B. (1922). Argonauts of the Western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. NY: Routledge and Kegan Paul Ltd.

Malinowski, B. (1929). The Sexual Life of Savages in North Western Melanesia. London: Routledge and Kegan Paul.

Malinowski, B. (1929). The sexual life of savages in north-western Melanesia: An ethnographic account of courtship, marriage, and family life among the natives of Trobriand Islands, British New Guinea. New York: Harcourt, Brace.

Malinowski, B. (1930). Kinship. Man 30:19–29.

Dhaka University Institutional Repository

Malinowski, B. (2001). Sex and repression in savage society. London and New York: Routledge.

Maloney, C. (1986),Behavior and Poverty in Bangladesh. Dhaka: The University Press Limited (UPL).

Marcus, G. E. (1986), Contemporary Problems of Ethnography in the Modern World System. In Clifford, J., & Marcus, G. E.. (ed) (1986), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. University of California Press, California.

Mead, M. (1928). Coming of age in Samoa: A psychological study of primitive youth for Western civilisation. New York: Morrow.

Mead, M. (2001). Sex and temperament in three primitive societies. New York: HarperCollins.

Mohsin, A. (2000). Identity, Politics and Hegemony: The Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Identity, Culture and Politics, Volume 1, Number 1, January 2000.

Morgan, L. H. (1870), Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Smithsonian Institution.

Morgan, L. H. (1877). Ancient Society. Charles H Kerr And Company.

Morgan, L. H. 1870. Systems of consanguity and affinity of the human family. Vol. 17, Smithsonian Contributions to Knowledge. Washington, DC: Smithsonian Institution.

Murdock, G. P. (1956), How Culture Changes. In Man, Culture, and Society, ed. H. L. Shapiro, 247–260. New York: Oxford University Press.

Murdock, G. P., and Douglas R. W. (1969), Standard Cross-Cultural Sample. Ethnology 9: 329–369. http://repositories.cdlib.org/imbs/socdyn/wp/Standard_CrossCultural_Sample

Needham, R, ed. (1971). Rethinking kinship and marriage. London: Tavistock.

OTTENHEIMER, M. (2001). The Current Controversy in Kinship. Czech Sociological Review, 9(2), 201-210. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41133183.

Pasternak, B. & Ember, C. R & Ember, M. (1997). Sex, gender, and kinship : a cross-cultural perspective. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.

Peletz, M. (1995). Kinship studies in late twentieth century anthropology. Annual Review of Anthropology 24:343–372. DOI: 10.1146/annurev.an.24.100195.002015

Peletz, M. G. (1995). Kinship Studies in Late Twentieth-Century Anthropology, Annual Review of Anthropology doi: 10.1146/annurev.an.24.100195.002015.

Dhaka University Institutional Repository

Peter, B. (1984), Chittagong Hill Tribes of Bangladesh. Cultural Survival online.Retrieved from https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/chittagong-hill-tribes-bangladesh on 15 July 2018.

Phayre, A. P. (1883), History of Burma, London. UK.

Popper, K.(1959), The Logic of Scientific Discovery. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Prithard, E. (1940a), TheNuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press.

Rajput, A. B. (1963), The Tribes of Chittagong Hill Tracts. Karachi, Pakistan

Rappaport, R.A. (1968), Pigs for the Ancestors. New Haven: Yale University Press.

Read, D. W. (2001). Formal analysis of kinship terminologies and its relationship to what constitutes kinship. Anthropological Theory. 1 (2): 239–267. doi:10.1177/14634990122228719.

Rivers, W. H. R. (1914), Kinship and Social Organisation. London.

Robben, A. C. G. M. and Jeffrey A. S., (2007), Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Malden, Ma, Oxford, and Victoria: Blackwell.

Robertson, I. (1989), Sociology (Third Edition). Wadsworth Publishing Company.

Sahlins, M. (2013). What Kinship Is-And Is Not. The University of Chicago Press. Chicago.

Saigal, O. (1978), Tripura: Its People and History. Delhi. India

Sanday, P. R., and Goodenough, R. G., eds. (1990). Beyond the second sex: New directions in the anthropology of gender. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press.

Sarkar, P. C. (1983). Ideas and Trends in Rural Society of Bangladesh. Dhaka.

Schneider, D. (1968). American Kinship Project: A Cultural Account. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.

Schneider, D. (1968). American kinship: a cultural account, Anthropology of modern societies series. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Schneider, D. (1972). What is Kinship all About. In Kinship Studies in the Morgan Centennial Year, edited by P. Reining. Washington: Anthropological Society of Washington.

Schneider, D. (1984). A critique of the study of kinship. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Siddiqui, K. (1990). Social formation in Dhaka City: a study in Third World urban sociology. Dhaka, Bangladesh: University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Simpson, B. (1994). "Bringing the 'Unclear' Family Into Focus: Divorce and Re-Marriage in Contemporary Britain". Man. Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 29 (4): 831–851. doi:10.2307/3033971.

Stockard, J. E. (2002). Marriage in culture: Practice and meaning across diverse societies. Fort Worth, TX: Harcourt.

Stone, L, ed. (2001). New directions in anthropological kinship. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Stone, L. (1997). Kinship and gender: An introduction. Boulder, Colo: Westview Press.

Stone, L. (2014). Kinship and gender: An introduction. 5th ed. Boulder, CO: Westview.

Talukdar, S. P. (2001), TheChakmas : Life & Struggle. Dhaka

Thomas, P. (1999) No substance, no kinship? Procreation, Performativity and Temanambondro parent/child relations. In Conceiving persons: ethnographies of procreation, fertility, and growth edited by P. Loizos and P. Heady. New Brunswick, NJ: Athlone Press.

Trautmann, T. R. (2008). Lewis Henry Morgan and the Invention of Kinship, New Edition.

Tripura, B. (1978), The Tripuras of Chittagong Hill Tracts, Dhaka.

Wallace, A. F. & Atkins, J. (1960). The Meaning of Kinship Terms. American Anthropologist. 62 (1): 58–80. doi:10.1525/aa.1960.62.1.02a00040.

White, D. R. & Johansen, U. C. (2005). Network Analysis and Ethnographic Problems: Process Models of a Turkish Nomad Clan. New York: Rowman and Littlefield. ISBN 978-0-7391-1892-4.

White, L. A. (1951). Lewis H. Morgan's Western Field Trips. American Anthropologist,. 53. pp. 11–18.

White, L. A. (1957). How Morgan came to write Systems of consanguinity and affinity. Michigan Academy of Science, Arts, and Letters.

Willem van Schendel (ed.), Francis Buchanan in South-east Bengal (1798); His Journey to Chittagong, Chittagong Hill Tracts, Noakhali and Comilla.

Dhaka University Institutional Repository

Internet Links:

http://www.khagrachhari.gov.bd/site/page/862c84f4-2144-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.sahos24.com/culture/2683/world
http://www.yourarticlelibrary.com/sociology/kinship-and-family/kinship-meaning-types-and-other-details/34960
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=চাকমা
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=মারমা
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=ত্রিপুরা
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=জ্ঞাতিত্ব
http://www.ebookbou.edu.bd/Books/ pdf
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/219482/2017/05/15

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১. প্রশ্নমালা

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থার উপর একটি আন্ত:সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন

জরিপ কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা

SECTION A:**তথ্য নির্দেশনা**

খানার পরিচিতি ও অবস্থান

101উপজেলা	:
102 জেলা	: :

103.**সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পরিচিতি ও উদ্দেশ্য**

আমি শামীমা আক্তার জাহান, পিএইচডি গবেষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি। বর্তমানে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থার উপর একটি আন্ত:সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন করছি। উক্ত জরিপ কাজে আপনার অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করছি। জরিপ কাজটি শেষ করতে ০১ ঘন্টার মত সময় লাগবে। জরিপের অংশ হিসেবে আপনার খানা সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করব। আপনার এবং খানার অন্যান্যদের কাছ থেকে যে তথ্য নিব তা কঠোরভাবে গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন বা পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার নাও দিতে পারেন ।আমি কি আপনার সাক্ষাৎকার নিতে পারি?

104.**উত্তরদাতার পরিচিতি**

প্রাথমিক উত্তরদাতার নাম	:

105.**সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিবরণ**

		দিন		মাস		বছর			
সাক্ষাৎকার **গ্রহণের** তারিখ	:					1	8		সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:

SECTION B: HOUSEHOLD HEAD'S BACKGROUND

প্রশ্ন নং	প্রশ্ন	উত্তর এবং কোড	
201	উত্তরদাতার নাম		
202	উত্তরদাতার বয়স	12-18 years	1

Dhaka University Institutional Repository

		১২-১৮ বছর	
		19-25 years ১৯-২৫ বছর	2
		26-30 years ২৬-৩০ বছর	3
		31-40 years ৩১-৪০ বছর	4
		40-above ৪০ থেকে উপরে	5
203	উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা	Unmarried অবিবাহিত	01
		Married বিবাহিত	02
		Widow বিধবা	03
		Divorced/Separated/Deserted তালাকপ্রাপ্ত/বিচ্ছেদ	04
204	উত্তরদাতার লিঙ্গ	পুরুষ	1
		মহিলা	2
		অন্যান্য	3
205	আপনি এই জায়গায় কতদিন ধরে বসবাস করছেন? How long have you been living continuously in this village? (Household)	00 – 03 Year(s) ০০-০৩ বছর	01
		03 – 06 Years ০৩-০৬ বছর	02
		06 – 09 Years ০৬-০৯ বছর	03
		09 – 12 Years ০৯-১২ বছর	04
		12 or More Years ১২ থেকে অধিক বছর	05
206	উত্তরদাতার জাতিসত্ত্বা To which ethnic group do you belong?	Chakma চাকমা	1
		Marma মারমা	2
		Tripura ত্রিপুরা	3
207	উত্তরদাতার ধর্ম What is your religion?	ইসলাম	1
		হিন্দু	2

		বোদ্ধ	3
		খৃষ্টান	4
		অন্যান্য	99
208	How many times have your household shifted/ relocated/ migrated your residence since the initial establishment? আপনি এ পর্যন্ত কতবার বাড়ি পরিবর্তন করেছেন?	Once একবার	01
		Two Times দুই বার	02
		Three Times তিন বার	03
		More than three times তিনের অধিক	04
209	If they had lived elsewhere then reasons of migration? অভিগমন করার কারণ?	Employment Opportunities চাকরির কারণে	01
		Production Possibility উৎপাদনের সম্ভাবনায়	02
		Forced Migration for Credit and Debt ঋণের জন্য বাধ্যতামূলক অভিগমন	03
		Pauperization and Loss of Land Ownership জমি দখল ও জমির মালিকানা হারানো	04
		Impacts of Natural Disasters & Coping প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খাপ-খাইয়ে নেয়ার প্রভাব	05
		Political Conflict, Crisis or Terrorism রাজনৈতিক সংঘাত, সঙ্কট ও অপরাধ	06
		Family Reunification পারিবারিক পূনঃমিলন	07
		Communalism and Communal Tension সাম্প্রদায়িক কারণ	08
		Other (Please specify)	99
210	Have you ever attended school? আপনি কখনো স্কুলে গেছেন?	Yes হ্যাঁ	01
		No না	02
211	What is the highest level of school you attended? আপনি কতটুকু পড়ালেখা করেছেন?	Illiterate নিরক্ষর	01
		Can Read and Write পড়তে ও লিখতে জানেন	02
		Class 01 – 05 ১ম - ৫ম শ্রেণী	03

Dhaka University Institutional Repository

		Primary Passed (Class 05 – 07) প্রাইমারি পাস	04
		Secondary (Class 8/ 9/ 10) মাধ্যমিক পাস	05
		SSC Passed এস এস সি পাস	06
		HSC Passed এইচ এস সি পাস	07
		Graduate **স্নাতক পাস**	08
		Post Graduate স্নাতকোত্তর পাস	09
		কারিগরি শিক্ষা	10
212	What is your occupation, that is, what kind of work do you mainly do? আপনার পেশা কি?	Primary Occupation প্রধান পেশা	
		Secondary Occupation গৌণ পেশা	
		Tertiary Occupation মধ্যবর্তী পেশা	
Occupation Code	*01-Agriculture (own land); 02-(only mortgaged/borrowed or rented / bargha land); 03-Agricultural labor (day laborer/agricultural laborer/assists in household agricultural activities); 04- Non-agricultural laborer (weaver/ potter/ blacksmith/ cobbler/ tailor/ assistant to mason/ weaver/ worker in a rice mill); 05- Rickshaw/Van/ puller Pushing cart man/boatman; 06- Driver of motor vehicle; 07-Government/ Nongovernment employee; 08-Professional (Teacher/ Lawyer/ Doctor/ Engineer); 07- Big/ Middle Businessman; 08 Petty business; 09 Housewife, 10- Housekeeping in others household; 11- Garments' worker, 12- Unemployed; 13-Student; 88- Not applicable (<6 years) 77-Others (please mention the details)*		

SECTION C: LIVING CONDITION AND LOCATION

প্রশ্ন নং	প্রশ্ন	উত্তর এবং কোড	
301	উত্তরদাতার বাড়ী/ ঘরের ধরণ (Type of house made up of? Please circle the specific code after observation)	ইমারত/ পাকা বাড়ী Building/ Cement Construction	01
		টিন সেড (পাকা বা অর্ধ পাকা দেয়াল) Tin Shed (Pucca or Semi Pucca Wall)	02
		টিন সেড (টিনের দেয়াল)Tin Shed (Tin Wall)	03
		টিন/ টালি সেড (কাচা বেড়া/ মাটির দেয়াল)Tin Shed (Tin/ Thatched/ Mud Wall)	04
		কাচা ঘর (ছন/ তাল বা গোল পাতা)Thatched House (Cane/ Straw/ Leaf)	05

Dhaka University Institutional Repository

		ঝুপড়ি/ বস্তি ঘর (প্লাস্টিক শিট/ পলিথিন)Squatter House (Plastic/ Polythene)	06
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)(Others, please specify) _______	99
302	Type of ownership of the house বাড়ির মালিকানার ধরণ	Own home at own land নিজের জমিতে নিজের বাড়ি	01
		Government house সরকারি বাড়ি	02
		Rented house ভাড়া বাড়ি	03
		Own home at others' land অন্যের জমিতে নিজের বাড়ি	04
		Own home at Government land খাস জমিতে নিজের বাড়ি	05
		Others (Please specify) _________________	99
303	What is the roof of the main house made up of? (Please circle the specific code after observation) মূল ঘরের ছাদ কি দিয়ে তৈরি?	Straw/ Chan/ Bamboo leaf/ Palm leaf/ Golpata শন, কাঠি, বাঁশ, পাম পাতা, গোলপাতা	01
		Plastic sheet/ Polythene প্লাষ্টিক শীট, পলিথিন	02
		Tiled/ টাইলস	03
		Metal/ Tin/ Steel/ লোহা, টিন, স্টিল	04
		Wood/ কাঠ	05
		Cement/ সিমেন্ট	06
		Others (Please specify) _________________	99
304	What is the wall of the main house made up of? (Please circle the specific code after observation মূল ঘরের দেয়াল কি দিয়ে তৈরি?	Cane/ Straw/ Leaf/ Jute sticks/ কাঠি, পাতা, পাটের উপাদান	01
		Mud/ মাটি	02
		Bamboo/ Bamboo with mud/ বাঁশ, বাঁশের সাথে মাটি	03
		Stones with mud/ Bricks with mud/ অন্যান্য মাটির সাথে পাথর, ইটের সাথে মাটি	04
		Wood/কাঠ	05
		Tin sheet/টিন শীট	06
		Brick/ Cement/ ইট, সিমেন্ট	07
		Others (Please specify) _________________	99
305	What is the floor of the main house made up of? (Please circle the specific code after observation) মূল ঘরের মেঝে কি দিয়ে তৈরি?	Mud/মাটি	01
		Bamboo/ Betel nut leaf/বাঁশ, সুপারি পাতা	02
		Wood/ Palm tree leaf/ কাঠ, পাম পাতা	03
		Cement/ সিমেন্ট	04
		Ceramic tiles/ Mosaic/ সিরামিক টাইলস, মোসাইক	05
		Others (Please specify) _________________	99

Dhaka University Institutional Repository

306	How many houses/rooms are there in the household? মূল ঘরের কক্ষ কয়টি?	

Section D:পরিবারের ধরণ

প্রশ্ন নং	প্রশ্ন	উত্তর এবং কোড	
401	আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন?		
402	আপনার বাবার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল?		
403	বর্তমানে পরিবারে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?	স্বামী	1
		স্ত্রী	2
		স্বামী-স্ত্রী উভয়	3
		সন্তান	4
		মামা	5
		দাদা-দাদী	6
		অন্যান্য	99
404	পূর্বে পরিবারে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত?	স্বামী	1
		স্ত্রী	2
		স্বামী-স্ত্রী উভয়	3
		সন্তান	4
		মামা	5
		দাদা-দাদী	6
		অন্যান্য	99
405	কোন ধরনের পরিবার প্রথায় বাস করেন বর্তমানে?	পিতৃপ্রধান	1
		মাতৃপ্রধান	2
406	পূর্বে কোন ধরনের পরিবার প্রথায় বাস করতেন?	পিতৃপ্রধান	1
		মাতৃপ্রধান	2
407	পূর্বের ও বর্তমানের পরিবার প্রথার মধ্যে পরিবর্তন হলে কারণসমূহ কি কি?	অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক	1
		বাঙ্গালী জনগোষ্ঠির সাথে সম্পর্ক	2
		পিতৃপ্রধান পরিবারের সুবিধার জন্য	3
		পিতৃপ্রধান পরিবারের অসুবিধার জন্য	4

Dhaka University Institutional Repository

		মাতৃপ্রধান পরিবারের সুবিধার জন্য	5
		মাতৃপ্রধান পরিবারের অসুবিধার জন্য	6
		শহরায়ন/নগরায়নের কারণে	7
		আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে	8
		ধর্মান্তরের প্রভাব	9
		অন্যান্য সামজিক কারণ	78
		অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণ	88
408	আপনার পরিবারের ধরণ কেমন?	অণু পরিবার	1
		বর্ধিত পরিবার	2
		যৌথ পরিবার	3
409	আপনার/বাব মায়ের পরিবারের ধরণ পূর্বে কেমন ছিল ?	অণু পরিবার	1
		বর্ধিত পরিবার	2
		যৌথ পরিবার	3
410	পূর্বের ও বর্তমানের পরিবারের ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি?	অণু পরিবার এর সুবিধা	1
		বর্ধিত পরিবার এর সুবিধা	2
		যৌথ পরিবার এর সুবিধা	3
		অণু পরিবার এর অসুবিধা	4
		বর্ধিত পরিবার এর অসুবিধা	5
		যৌথ পরিবার এর অসুবিধা	6
		অন্যান্য	88
411	বর্তমানে বিয়ের পরে দম্পতি কোথায় বাস করে?	স্বামীর পিতার বাসস্থান	1
		স্ত্রীর মায়েরবাসস্থান	2
		নয়া আবাসিক বাসস্থান	3
		অন্যান্য	88
412	আগে বিয়ের পরে দম্পতি কোথায় বাস করত?	স্বামীর পিতার বাসস্থান	1
		স্ত্রীর মায়ের বাসস্থান	2
		নয়া আবাসিক বাসস্থান	3
		অন্যান্য	99
413	বর্তমানে বিয়ের পরে দম্পতির বাসস্থানের পরিবর্তন হলে কারণ কি?	স্বামীর পিতার বাসস্থান এর সুবিধা	1
		স্বামীর পিতার বাসস্থান এর অসুবিধা	2
		স্ত্রীর মায়েরবাসস্থান এর সুবিধা	3
		স্ত্রীর মায়ের বাসস্থান এর অসুবিধা	4
		নয়া আবাসিক বাসস্থান এর সুবিধা	5
		নয়া আবাসিক বাসস্থান এর অসুবিধা	6
		অন্যান্য	99

Dhaka University Institutional Repository

414	কে পরিবার প্রধান?	স্বামী	1
		স্ত্রী	2
		স্বামীর বাবা	3
		স্ত্রীর মা	4
		স্ত্রীর বাবা	5
415	সন্তান গ্রহণ ও গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত কে নেয়?	স্বামী	1
		স্ত্রী	2
		স্বামীর মামা	3
		স্বামীর বাবা	4
		স্ত্রীর মা	5
		স্ত্রীর বাবা	6

Section E:বিবাহের ধরণ

প্রশ্ন নং	প্রশ্ন	উত্তর এবং কোড	
501	কি ধরণের বিবাহ প্রথা আপনাদের সমাজে বর্তমানে চালু আছে?	অন্তবিবাহ	1
		বহিবিবাহ	2
		হাইপারগামাস	3
502	কি ধরণের বিবাহ প্রথা আপনাদের সমাজে পূর্বে চালু ছিল?	অন্তবিবাহ	1
		বহিবিবাহ	2
		হাইপারগামাস	3
503	বর্তমানে বিবাহের ধরণে পরিবর্তনের কারণ কি?	অন্তবিবাহ এর সুবিধা	1
		অন্তবিবাহ এর অসুবিধা	2
		বহিবিবাহ এর সুবিধা	3
		বহিবিবাহ এর অসুবিধা	4
		হাইপারগামাস এর সুবিধা	5
		হাইপারগামাস এর অসুবিধা	6
		অন্যান্য	99
504	বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে কি ধরণের বিয়ের চর্চা রয়েছে?	একগামী বিবাহ	1
		বহুপত্নী বিবাহ	2
		বহুপতি বিবাহ	3
		অন্যান্য	99
505	পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে কি	একগামী বিবাহ	1

Dhaka University Institutional Repository

	ধরণের বিয়ের চর্চা ছিল?	বহুপত্নী বিবাহ	2
		বহুপতি বিবাহ	3
		অন্যান্য	99
506	স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিয়ের ধরণে পরিবর্তনের কারন কি?	একগামী বিবাহ এর সুবিধা	1
		একগামী বিবাহ এর অসুবিধা	2
		বহুপত্নী বিবাহ এর সুবিধা	3
		বহুপত্নী বিবাহএর অসুবিধা	4
		বহুপতি বিবাহ এর সুবিধা	5
		বহুপতি বিবাহ এর অসুবিধা	6
		অন্যান্য	99
507	প্যারালাল কাজিন বিবাহ চালু আছে কি বা আপনি কি আপনার মায়ের বোনের অথবা বাবার ভাইয়ের মেয়ে/ছেলেকে বিয়ে করতে পারেন?	হ্যাঁ	1
		না	2
		জানিনা	78
508	ক্রস কাজিন বিবাহ চালু আছে কি বা আপনার বাবার বোনের অথবা মায়ের ভাইয়ের মেয়ে বা ছেলেকে বিয়ে করতে পারেন?	হ্যাঁ	1
		না	2
		জানিনা	78
509	বর্তমানে বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নিজেরা পছন্দ করতে পারে?	হ্যাঁ	1
		না	2
		জানিনা	78
510	আগে বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নিজেরা পছন্দ করতে পারত?	হ্যাঁ	1
		না	2
		জানিনা	78
511	বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নিজেরা পছন্দ করার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ কি কি?	আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব	1
		অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রভাব	2
		বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব	3
		আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সহজলভ্যতা	4
		শিক্ষার প্রভাব	5
		ধর্মান্তরের প্রভাব	6
		জানিনা	78
512	বর্তমানে পছন্দের বিয়ের সংখ্যা বেশি না পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিয়ের সংখ্যা বেশি?	পছন্দের বিবাহ	1
		পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহ	2
		জানিনা	78
513	পূর্বে পছন্দের বিয়ের সংখ্যা বেশি না	পছন্দের বিবাহ	1

Dhaka University Institutional Repository

	পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিয়ের সংখ্যা বেশি ছিল?	পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিবাহ	2
		জানিনা	78
514	পছন্দের বিয়ে বর্তমানে বেশি হওয়ার কারণ কি কি?	আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব	1
		অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রভাব	2
		বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব	3
		আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সহজলভ্যতা	4
		শিক্ষা প্রভাব	5
		ধর্মান্তরের প্রভাব	6
		জানিনা	78
515	পরিবার কর্তৃক আয়োজিত বিয়ের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ কি?	পারিবারিক বন্ধন হ্রাসমান	1
		ব্যক্তি নিজস্ব পছন্দ বিষয়ে অধিক সচেতন	2
		পরিবার কর্তৃক বিয়ের আয়োজন সমস্যাযুক্ত	3
		বিবাহ-পূর্ব ছেলে-মেয়ের যোগাযোগের সহজলভ্যতা	4
		আধুনিকায়নের প্রভাব	6
		শিক্ষার প্রভাব	7
		ধর্মান্তরের প্রভাব	8
		জানিনা	78
516	আপনাদের সমাজ বিবাহ-পূর্ব প্রেম-ভালবাসাকে কিভাবে দেখে?	ভালভাবে	1
		খারাপভাবে	2
		জানিনা	78
517	বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন পক্ষ বেশি গুরত্ব পায়?	ছেলে পক্ষ	1
		মেয়ে পক্ষ	2
		জানিনা	78
518	যৌতুক বা অন্য কোন বিনিময় প্রথা আছে কি?	হ্যাঁ	1
		না	2
		জানিনা	78

Section F:জ্ঞাতিসম্পর্ক

প্রশ্ন নং	প্রশ্ন	উত্তর এবং কোড	
601	পিতার দিকের আত্মীয়কে নাকি মায়ের দিকের আত্মীয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়?	পিতার দিকের আত্মীয়কে	1
		মায়ের দিকের আত্মীয়কে	2
		উভয়কে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়	3

Dhaka University Institutional Repository

602	ব্যক্তির (ইগো পুরুষ) সম্পদের উত্তরাধিকার হয় কারা?	ছেলে	1
		মেয়ে	2
		ছেলে ও মেয়ে উভয়	3
		স্ত্রী	4
		স্ত্রী ও ছেলে	5
		স্ত্রী ও মেয়ে	6
		স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে উভয়	7
		ভাই	8
		ভাইয়ের ছেলে	9
		বোনের ছেলে মেয়ে	10
		অন্যান্য	99
603	ব্যক্তির (ইগো মহিলা) সম্পদের উত্তরাধিকার হয় কারা?	ছেলে	1
		মেয়ে	2
		ছেলে ও মেয়ে উভয়	3
		স্বামী	4
		স্বামী ও ছেলে	5
		স্বামী ও মেয়ে	6
		স্বামী, ছেলে ও মেয়ে উভয়	7
		ভাই	8
		ভাইয়ের ছেলে	9
		বোনের ছেলে মেয়ে	10
		অন্যান্য	99
604	সমাজে কাদের সাথে সুসম্পর্ক বেশি?	নিজ সম্প্রদায়	1
		অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	2
		বাঙ্গালী	3
605	কাদের সাথে যোগাযোগ বেশি হয়?	নিজ সম্প্রধায়	1
		অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	2
		বাঙ্গালী	3
606	বিপদাপদে কারা বেশি সহযোগিতা করে?	নিজ সম্প্রদায়	1
		অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	2
		বাঙ্গালী	3
607	পিতার নাকি মায়ের দিকের আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বেশি?	পিতার দিকের	1
		মায়ের দিকের	2
		উভয় দিকের	3
608	পিতার দিকের আত্মীয়দের সাথে	দৈনিক	1

Dhaka University Institutional Repository

	যোগাযোগ কেমন হয়?	সাপ্তাহিক	2
		মাসিক	3
		ষাণ্মাসিক	4
		বাৎসরিক	5
609	মায়ের দিকের আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ কেমন হয়?	দৈনিক	1
		সাপ্তাহিক	2
		মাসিক	3
		ষাণ্মাসিক	4
		বাৎসরিক	5
		কখনো না	6
610	আপনার বিবাহিত বোনের সাথে যোগাযোগ কেমন হয়?	দিনে	1
		সপ্তাহে	2
		মাসে	3
		ষাণ্মাসিক	4
		বছরে	5
611	আপনার বিবাহিত মেয়ের সাথে যোগাযোগ কেমন হয়?	দিনে	1
		সপ্তাহে	2
		মাসে	3
		ষাণ্মাসিক	4
		বছরে	5
		কখনো না	6
612	বর্তমানে জ্ঞাতিজনদের সাথে যোগাযোগ (মোবাইল/ডাক মারফত) বেশি হয় নাকি পরিভ্রমণ বেশি হয়?	যোগাযোগ	1
		পরিভ্রমণ	2
		জানিনা	78
613	আগে জ্ঞাতিজনদের সাথে যোগাযোগ (মোবাইল/ডাক মারফত) বেশি হত নাকি পরিভ্রমণ বেশি হত?	যোগাযোগ	1
		পরিভ্রমণ	2
		জানিনা	78
614	বর্তমানে জ্ঞাতিজনদের সাথে যোগাযোগ মাধ্যম কি কি?	মোবাইল মারফত যোগাযোগ	1
		ডাক মারফত যোগাযোগ	2
		অন্যান্য	99
		জানিনা	78
615	পূর্বে জ্ঞাতিজনদের সাথে যোগাযোগ কি কি ছিল?	মোবাইল মারফত যোগাযোগ	1
		ডাক মারফত যোগাযোগ	2
		অন্যান্য	99
		জানিনা	78

Dhaka University Institutional Repository

616	পরিভ্রমণ হ্রাস পেলে কারণ কি?	পরিভ্রমণে অসুবিধা	1
		যাতায়াত ব্যবস্থার অবনতি	2
		ব্যস্ততা	3
		আগের মত আন্তরিকতা নেই	4
		জ্ঞাতজনদের মাঝে সম্পর্কের দূরত্ব	5
		জানিনা	78
		অন্যান্য	99
617	বর্তমানে জ্ঞাতিজনদের সাথে মোবাইল মারফত যোগাযোগ হলে কারণ কি?	মোবাইলে যোগাযোগের সুবিধা	1
		যাতায়াত ব্যবস্থার অবনতি	2
		পরিভ্রমণ ও মোবাইলে যোগাযোগের একই তাৎপর্য	3
		যাতায়াতের চেয়ে মোবাইলে যোগাযোগ সাশ্রয়ী	4
		অন্যান্য	99
		জানিনা	78
618	আপনি কি মনে করেন পূর্বে জ্ঞাতিজনদের মাঝে বন্ধন খুব ভাল ছিল?	হ্যাঁ	1
		না	2
		জানিনা	3
619	আপনি কি মনে করেন বর্তমানে জ্ঞাতিজনদের মাঝে আগের মত ভাল বন্ধন আছে ?	হ্যাঁ	1
		না	2
		জানিনা	3
620	জ্ঞাতিজনদের মাঝে আগের মত ভাল বন্ধন না থাকলে বা হ্রাসমান হলে তার কারণ কি হতে পারে?	প্রযোজ্য নয়	1
		আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব	2
		ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা	3
		পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব	4
		জুম চাষ হ্রাসের ফলে পারস্পরিক সহশ্রম দরকার হয়না	5
		আধুনিকায়নের প্রভাব	6
		শিক্ষার প্রভাব	7
		ধর্মান্তরের প্রভাব	8
		বরাদ্ধকৃত ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব	9
		জানিনা	78
621	বিপদাপদে কোন পক্ষ বেশি সহযোগিতা করে?	পিতার দিকের	1
		মায়ের দিকের	2
622	পারিবারিক বিবাদ নিরসনে কোন পক্ষ বেশি ভূমিকা রাখে?	পিতার দিকের	1
		মায়ের দিকের	2
623	সামাজিক বিবাদ নিরসনে কোন পক্ষ বেশি ভূমিকা রাখে?	পিতার দিকের	1
		মায়ের দিকের	2

Dhaka University Institutional Repository

624	আর্থিক সঙ্কট মোকাবেলায় কোন পক্ষ বেশি সহযোগিতা করে?	পিতার দিকের	1
		মায়ের দিকের	2
625	কোন দিকের আত্মীয়দের বাড়িতে বেশি যাওয়া হয়?	পিতার দিকের	1
		মায়ের দিকের	2
626	পিতার দিকের আত্মীয়দের বাড়িতে কেমন যাওয়া হয়?	দৈনিক	1
		সাপ্তাহিক	2
		মাসিক	3
		ষাণ্মাসিক	4
		বাৎসরিক	5
627	মায়ের দিকের আত্মীয়দের বাড়িতে কেমন যাওয়া হয়?	দৈনিক	1
		সাপ্তাহিক	2
		মাসিক	3
		ষাণ্মাসিক	4
		বাৎসরিক	5
628	সমাজ জীবনে কাদের সাথে লেনদেন বেশি হয়?	নিজ সম্প্রদায়	1
		অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	2
		বাঙ্গালী	3
629	সমাজ জীবনে কাদের থেকে উপহার পেয়ে থাকেন?	পিতার দিকের	1
		মায়ের দিকের	2
		পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতিজনদের	3
630	সমাজ জীবনে কাদেরকে বেশি উপহার দেন?	পিতার দিকের জ্ঞাতিজনদের	1
		মায়ের দিকের জ্ঞাতিজনদের	2
		পিতামাতা উভয় দিকের জ্ঞাতিজনদের	3

SECTION- G:খানার মোট বার্ষিক আয়ও ব্যয় (GROSS ANNUAL INCOME AND EXPENDITURE OF THE HOUSEHOLD)

প্রশ্ন নং	**প্রশ্ন**			
		আয়ের উৎস	Code/ Value	**বার্ষিক আয় (টাকা)**
701	গত ১২মাসে খানার আয় (আয়ের উৎস এবং পরিমাণ)	কৃষি (নিজ ও বর্গা জমি)	1	
		হাঁস-মুরগী/ গরু-ছাগল-ভেড়া পালন	2	
		মাছ চাষ	3	
		গাছ বিক্রি	4	
		চাকুরী (বোনাসসহ)	5	

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন নং	প্রশ্ন			
		ব্যবসা	6	
		মজুরী	7	
		রিক্সা বা ভ্যান চালান	8	
		বাড়ি/ দোকান ভাড়া	9	
		বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ	10	
		বৃত্তি/ উপবৃত্তি/ টিউশনী	11	
		সাহায্য/ সহযোগিতা/ ভাতা/ VGD/ VGF কার্ড	12	
		হস্তশিল্প	13	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)_____________________	73	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)_____________________	74	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)_____________________	75	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)_____________________	76	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)_____________________	77	
		খানার মোট বার্ষিক আয়		

	খানার মোট বার্ষিক ব্যয়			
702	গত বছরে আপনার খানায় কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়?	ব্যয় খাত	Code/ Value	বার্ষিক ব্যয়
		কৃষি খাত (ফসল উৎপাদন, গরু,ছাগল,হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি)	1	
		অকৃষি খাত (ব্যবসায় বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যয়)	2	
		খাদ্য	3	
		পোশাক	4	
		বাসস্থান তৈরী/ঘর মেরামত	5	
		ঘর ভাড়া/মাটি ভাড়া	6	
		শিক্ষা	7	
		স্বাস্থ্য/চিকিৎসা	8	
		বিনোদন	9	
		যাতায়াত	11	
		বিদ্যুত/ পানি/ গ্যাস বিল	12	
		কেরোসিন	13	
		অন্যান্য জ্বালানী দ্রব্য	14	

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন নং	প্রশ্ন			
		অন্যান্য নিয়মিত বিল	15	
		ঋণ পরিশোধ	16	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)____________________	74	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)____________________	75	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)____________________	76	
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)____________________	77	
	খানার মোট বার্ষিক ব্যয়			

(আপনাকে ধন্যবাদ)

২. চেকলিষ্ট

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীসমূহের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থার উপর একটি আন্ত:সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন

চেকলিস্ট

রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি এবং কারা এর অন্তর্ভুক্ত?

বিবাহ সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি এবং কারা এর অন্তর্ভুক্ত?

কাল্পনিক জ্ঞাতিজনের ধারণা কি?

জ্ঞাতিত্বের বন্ধন হ্রাসমান হওয়ার কারণ কি কি?

নিজের সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিজন ছাড়া অন্যদের কিভাবে ডাকা হয়?

নিজের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের কি পদাবলীর মাধ্যমে ডাকা হয়?

জ্ঞাতিত্বের বন্ধন কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে?

জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলী	
পিতামহ/দাদার পদাবলী	
পিতামহী/দাদীর পদাবলী	
দাদা ও দাদীর সন্তান সংখ্যা	
পিতার পদাবলী	
মাতার পদাবলী	
চাচার পদাবলী	
চাচীর পদাবলী	

Dhaka University Institutional Repository

ফুফুর পদাবলী	
ফুফার পদাবলী	
আপনার পদাবলী	
স্ত্রীর পদাবলী	
স্ত্রীর ভাই/বোনের পদাবলী	
ভাইয়ের পদাবলী	
ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	
বোনের পদাবলী	
বোনের স্বামীর পদাবলী	
চাচাত ভাইয়ের পদাবলী	
চাচাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	
চাচাত বোনের পদাবলী	
চাচাত বোনের স্বামীর পদাবলী	
ফুফাত ভাইয়ের পদাবলী	
ফুফাত ভাইয়ের স্ত্রীর পদাবলী	
ফুফাত বোনের পদাবলী	
ফুফাত বোনের স্বামীর পদাবলী	
ছেলের পদাবলী	
মেয়ের পদাবলী	

Dhaka University Institutional Repository

৩. গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের সচিত্র উপস্থাপন

ছবি ১: কাপ্তাই লেক (রাঙ্গামাটি)

ছবি ২: চাকমা ছেলে ও মেয়ে বাড়ির আঙিনায় পড়ছে। পিছনে চাকমা নারী কাপড় বোনার কাজে ব্যস্ত

ছবি ৩: চাকমা ঘর-বাড়ি

ছবি ৪: চাকমা ঘর-বাড়ি

ছবি ৫: মারমা (ছাগলখাইয়া) গ্রামের প্রবেশ পথ

ছবি ৬: লামা উপজেলার মারমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল তামাক

ছবি ৭: বটবৃক্ষ (যেখানে ছাগলখাইয়া গ্রামের মারমারা উপাসনা করে)

ছবি ৮: মারমা বিয়েতে ভোজের আয়োজন

ছবি ৯: মারমা বিয়েতে ভোজের আয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

ছবি ১০: মারমাদের নিজস্ব খাবারের আয়োজন

ছবি ১১: মারমা বিয়েতে বাঙ্গালী খাবারের আয়োজন

ছবি ১২: মারমা কনের বিয়েতে বরপক্ষের আগমন

ছবি ১৩: মারমা ঐতিহ্য অনুসারে কণেপক্ষ কর্তৃক বরপক্ষকে গ্রহণের নিমিত্তে যাত্রা

ছবি ১৪: মারমা প্রথানুযায়ী বিবাহের পূর্বে কণের বাড়ির পাশের বাড়িতে বরপক্ষের অবস্থান

ছবি ১৫: মারমা কণের বাড়িতে নৃত্য

Dhaka University Institutional Repository

ছবি ১৬: পাহাড় থেকে খাগড়াছড়ি

Dhaka University Institutional Repository

ছবি ১৭: খাগড়াছড়ার ত্রিপুরা গ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

ছবি ১৮: ত্রিপুরাদের জমিতে ফল চাষ

Dhaka University Institutional Repository

ছবি ১৯: ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তির বাড়ির প্রবেশ পথ

Dhaka University Institutional Repository